উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ]

গবেষক: সৃজিতা সান্যাল

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE0100219

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 19.08.2019

তত্ত্বাবধায়ক: ড. জয়দীপ ঘোষ

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৫

Certified that the Thesis Entitled

'উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Joydeep Ghosh,** Professor, Department of Bengali, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Joydeep Ghosh 19.3.2025 Candidate: Srijita Sanyal

Dated: Dated: 19.03.2025

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

গবেষণা পদ্ধতি

'উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা'— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুসারে উনিশ শতকের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা একাধিক গ্রন্থাগার ও আন্তর্জালিক আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা, বিষয়ানুগ ছটি অধ্যায়, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট— এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অভ্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫। উদ্ধৃতির দুটি লাইনের মধ্যে ব্যবধান রাখা হয়েছে ১.১৫।

- তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণে Chicago Manual of Style-এর সপ্তদশ সংস্করণ (17^{th} Edition) ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যসূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ফুটনোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং অন্যান্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Block Quotation ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবনা

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনিশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কার, অন্যদিকে ইউরোপীয় পরম্পরা থেকে আগত ঐশ্বর্যের আত্মীকরণ— দুই দিক থেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করেছিল বাঙালি। পাশাপাশি নানা প্রশ্ন, সংশয়, দোলাচল, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনায় সেই দ্বিধাজর্জর অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনীমূলক রচনা, রসসাহিত্য— এমন বিবিধ বিষয়ের সমন্বয়ে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যময়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উনিশ শতকীয় বাঙালির চর্চার ক্ষেত্রের অন্তর্গত। উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বাঙালির নিজস্ব সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তন কতখানি সুসংগঠিত আকার পেয়েছিল, তা জানার জন্যও সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব উনিশ শতকের বাঙালিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল— সে কথা বুঝে নেওয়া জরুরি।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্বের নানা দিক উনিশ শতকের বাঙালি মানসে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কতখানি আদৃত বা উপেক্ষিত হয়েছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব— তার উত্তর খোঁজাই এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল অন্বিষ্ট। এর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির আগ্রহ কিংবা উপেক্ষার কারণগুলি কী— তা বিশ্লেষণের লক্ষ্যেও এই অভিসন্দর্ভের নির্মাণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

খাতায় কলমে এই গবেষণাপত্র একক চেষ্টার ফসল হলেও বহু মানুষের শ্রম ও সাহায্য মিশে রইল এর উপস্থাপনে।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা রইল গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষের প্রতি, যাঁর সর্বাঙ্গীণ এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ রূপ পেত না। পাশাপাশি গবেষণা উপদেশক সমিতির সদস্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখর সমাদ্দার এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার মণ্ডলের মূল্যবান পরামর্শ ও সংযোজন গবেষণার কাজে দিশা দেখিয়েছে। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত যে-কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর জুগিয়েছেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি। M.S Word-এ Reference System ব্যবহার করে তথ্যসূত্র নির্মাণের জরুরি কাজটি শিখেছি বিভাগীয় অধ্যাপক ড. ছন্দম চক্রবর্তীর কাছ থেকে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবলীনা শেঠ এবং ড. সুমনা দাস সুরের পরামর্শও ঋদ্ধ করেছে এই গবেষণাকে।

RAC-এর পূর্বতন সদস্য প্রয়াত অধ্যাপক স্যমন্তক দাসের মূল্যবান পরামর্শ উনিশ শতকের মধ্যেই গবেষণাক্ষেত্রের পরিধি সীমায়িত করতে সাহায্য করেছে। উনিশ শতকীয় বাঙালি-নির্মিত মৌলিক কাব্যতত্ত্ব এবং উনিশ-বিশ শতকে বাঙালির ভারতীয় কাব্যতত্ত্বপাঠ বিষয়ে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক ড. ঋতঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তা কাজের সূচনাপর্বে গবেষণার লক্ষ্যবিন্দু স্থির করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

হয়ে উঠেছিল। গবেষণার প্রাথমিক রূপরেখাটুকু নির্দিষ্ট করতে শিক্ষকপ্রতিম এই দুই ব্যক্তির ঋণ অপরিশোধ্য।

বিগত কয়েক বছরব্যাপী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে এবং UGC DRS–SAP, Phase II- এর অর্থানুকূল্যে আয়োজিত গবেষকদের আলোচনাসভায় কয়েকটি গবেষণাপত্র উপস্থাপনাকালে আমন্ত্রিত সভামুখ্যদের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নির্মাল্য কুমার ঘোষের এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যাপনারত ড. শাশ্বতী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উনিশ শতকে প্রাপ্ত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পুথি এবং মুদ্রিত সংস্করণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নির্মাল্য কুমার ঘোষ। এই গবেষণা-সংক্রান্ত একাধিক বইয়ের খোঁজ দিয়ে সাহায্য করেছেন শাশ্বতী রায়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ বুঝতে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষিকা বীথি মুখোপাধ্যায়।

এরপরেই উল্লেখ করতে হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কথা, যেখানে এই গবেষণাপত্রের সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণার বিষয়-সংশ্লিষ্ট নানা বইপত্র, বিশেষত অশোকনাথ শাস্ত্রীর *রস ও ভাব* বইটির হদিশ দেওয়ার জন্য বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আইভি আদকের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা রইল। উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাগুলি পেয়েছি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। উনিশ শতকের গ্রন্থ এবং পত্রিকাগুলি সংগ্রহে প্রভূত সাহায্য করেছে Heidelberg University-এর বাংলা সাময়িকপত্রের আর্কাইভ এবং Archieve.org।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, আমার প্রেসিডেন্সি-জীবনের সহপাঠী বিবস্বান দত্তের সঙ্গে বাঙালির রসতত্ত্বনির্মাণ এবং ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সংক্রান্ত যে আলোচনা বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, তা এই গবেষণার অভিমুখ নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ধনঞ্জয়ের *দশরূপক*-এর একটি সংস্করণ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্যও বিবস্বান ধন্যবাদার্হ হয়ে আছে। প্রতিটি অধ্যায় অনুপুঙ্খভাবে পাঠ করে সুচিন্তিত মতামত দেওয়ার শ্রম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই স্বীকার করেছে সে। সেই মতবিনিময় আমাদের দীর্ঘকালের সহপাঠিত্বেরই অংশ, তাই তার কাছে কৃতজ্ঞতাস্বীকার বাহুল্যমাত্র। গবেষণাপত্রের প্রুফ রিডিং করেছে এবং সম্পাদনা-পরামর্শ দিয়েছে এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক সহপাঠী, বর্তমানে কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনারত রণিতা চট্টোপাধ্যায়। তার সঙ্গেও সম্পর্ক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের নয়।

এই কাজের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তারা সকলেই আমার সহ-গবেষক বন্ধু। ল্যাপটপের যান্ত্রিক গোলযোগ থেকে শুরু করে যে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যায় সময়ে-অসময়ে বিরক্ত করতে হয়েছে যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিশ্বজিৎ সরদারকে। স্বভাবসিদ্ধ সহনক্ষমতা নিয়েই সে সব সমস্যার সমাধান করেছে হাসিমুখে। গবেষণাপত্রের আঙ্গিকসজ্জা-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি সম্পাদনাও তারই সহায়তায় সম্পন্ন করেছি। উনিশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে গবেষণারত শিলাদিত্য সাহার কাছ থেকে পেয়েছি উনিশ শতকে প্রকাশিত বৈষ্ণবতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা এবং *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা*-য় প্রকাশিত *নব্যভারত* পত্রিকার কালানুক্রমিক সূচি। বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থ এবং চৈতন্যজীবনীগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশের পাঠ এবং তথ্যসূত্রনির্মাণে সাহায্য পেয়েছি মধ্যযুগ বিষয়ে আগ্রহী গবেষক প্রকাশ পালের। সহ-গবেষক বিজলীরাজ পাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত চতুর্দশপদী কবিতায় রসের উল্লেখের বিষয়টি নজরে এনেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত শিবধন বিদ্যার্ণবের একটি জরুরি প্রবন্ধের সন্ধান দিয়েছে সহ-গবেষক তীর্থঙ্কর মণ্ডল। এছাড়া অগ্রজ-অনুজ ও সহপাঠীস্থানীয় সহ-গবেষক মহম্মদ সামসুর রহমান, শিঞ্জিনী সরকার, মৌমিতা দাস, অলোক সরকার, সাইয়াকুল শেখ, অর্পণ নস্কর, অদ্রিজা ভট্টাচার্য্য— এদের সকলের সঙ্গ, সাহায্য ও বিদ্যায়তনিক সাহচর্য যে কেবল পিএইচডির দীর্ঘমেয়াদি কাজের একঘেয়েমি দূর করেছে তাই-ই নয়, গবেষণার শ্রমসাধ্য সময়পর্বে অপ্রত্যাশিত আনন্দের রসদও জুগিয়েছে। কাজের পরিবেশকে অনায়াস ও চিন্তামুক্ত করে তুলেছে যে-কোনও প্রয়োজনে তাদের পাশে পাওয়ার আশ্বাস।

বিদ্যায়তনিক সাহায্য ছাড়াও গবেষণা চলাকালীন ব্যক্তিগতক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে একাধিক পরিজন-শিক্ষক-সহকর্মী-বন্ধুর ওপর নির্ভর করেছি, তাঁদের সকলের প্রতিই রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বাংলার বিদ্যায়তনিক গবেষণাক্ষেত্রে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনার বিরল উপস্থিতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেই না-থাকাই এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের কাজে অতিরিক্ত প্রণোদনা জুগিয়েছে নিঃসন্দেহে।

যাদবপুর
মার্চ, ২০২৫

সৃজিতা সান্যাল
গবেষক
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ভূমিকা **১ - ২১**

প্রথম অধ্যায় **২২ - ৬৬**

উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা

১.১ টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা

১.২ চৈতন্যদেবের অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞান

১.৩ উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় রচিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক অলংকার-গ্রন্থ

১.৪ উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় রচিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক টীকা-গ্রন্থ

১.৫ বৈষ্ণব রসতত্ত্বে সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রভাব

- ১.৫.১ রসের অলৌকিকত্ব এবং একক রসকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা
- ১.৫.২ স্থায়িভাব
- ১.৫.৩ রসনিষ্পত্তি
- ১.৫.৪ শান্তরস
- ১.৫.৫ বাৎসল্যরস
- ১.৫.৬ সাত্ত্বিকভাব
- ১.৫.৭ শৃঙ্গার বিভাজন
- ১.৫.৮ পূর্বরাগ ও মান
- ১.৫.৯ নায়িকাভেদ

দ্বিতীয় অধ্যায় **৬৭ - ১০৫**

উনিশ শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ

২.১ উনিশ শতকের দৃষ্টিতে অলংকারবাদী তাত্ত্বিক: দণ্ডী এবং রুদ্রট

২.২ উনিশ শতকের সংস্কৃত-কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত গ্রন্থে অলংকারের উল্লেখ

২.৩ উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় অলংকারের প্রয়োগ

- ২.৩.১ শব্দালংকার— অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ
- ২.৩.২ অর্থালংকার— উপমা ও রূপক
- ২.৩.৩ অর্থালংকার— অতিশয়োক্তি ও স্বভাবোক্তি

২.৪ উনিশ শতকের রচনায় অলংকারবাদ সম্পর্কিত মত: সপক্ষে এবং বিপক্ষে

তৃতীয় অধ্যায় **১০৬ - ১৩৮**

উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

৩.১ নৈষধের কাহিনিতে মম্মটভট্ট

৩.২ ‘নৈষধকার’ শ্রীহর্ষের পরিচয় ও কালনির্ণয়-বিতর্কে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

৩.৩ অন্যান্য ক্ষেত্রে মম্মট ও *কাব্যপ্রকাশ*-এর উল্লেখ

৩.৪ কাব্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে মম্মট

৩.৪.১ কাব্যের সংজ্ঞা

৩.৪.২ কাব্যরচনার উদ্দেশ্য

৩.৪.৩ কাব্যের বাচ্য অর্থ ও ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় ১৩৯ - ১৮২

উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*

৪.১ উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভরতা

৪.১.১ উনিশ শতকে প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে *সাহিত্যদর্পণঃ* -এর প্রভাব

৪.১.২ উনিশ শতকীয় বাঙালি মননে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সমার্থক *সাহিত্যদর্পণঃ*

৪.১.৩ বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্

৪.২ উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ* চর্চার অন্যান্য দৃষ্টান্ত

৪.৩ *সাহিত্যদর্পণঃ* -এর জনপ্রিয়তা: পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্য

৪.৪ প্রসঙ্গ: পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ

৪.৫ *সাহিত্যদর্পণঃ* -এর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান

পঞ্চম অধ্যায় ১৮৩ - ২৭৪

উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য

৫.১ উনিশ শতকের কাব্যতত্ত্বচর্চায় এবং সমালোচনায় শৃঙ্গার ও বীররস

৫.১.১ শৃঙ্গাররসের সাধারণ উল্লেখ

৫.১.২ আদিরসের নেতিবাচক উপস্থাপনা

৫.১.৩ আদিরসের ইতিবাচক উপস্থাপনা

৫.১.৪ আদিরসমাত্রেই কি অশ্লীল?— উনিশ শতকীয় সমালোচকের দ্বিধা

৫.১.৫ শৃঙ্গাররসে বিভাজনের প্রয়াস

৫.১.৬ আদিরস বনাম শৃঙ্গাররস

৫.২ বীররস, রৌদ্ররস ও ভয়ানকরস

৫.২.১ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বীররস ও রৌদ্ররসের স্বল্পতা সংক্রান্ত অভিযোগ

৫.২.২ কৃত্রিম বীররসের ভজনার সমালোচনা

৫.৩ হাস্যরস

৫.৪ করুণরস

৫.৪.১ উনিশ শতকে করুণরস-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা

৫.৪.২ সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে করুণরস— বাংলা সাহিত্য

৫.৪.৩ সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে করুণরস— সংস্কৃত সাহিত্য

৫.৪.৩.১ *রামায়ণ*-এর করুণরস

৫.৪.৩.২ *উত্তররামচরিত* ও করুণরস: দোলাচলের পটভূমি

৫.৪.৩.৩ নৈষধ ও করুণরস

৫.৪.৪ নাট্যতত্ত্বে করুণরস: করুণের প্রাধান্য-সংক্রান্ত বিতর্ক

৫.৪.৫ করুণরসের তাত্ত্বিক অবস্থান

৫.৪.৬ উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও করুণরস

৫.৫ বীভৎস রস

৫.৬ উনিশ শতকের তত্ত্বচর্চায় এবং সমালোচনায় শান্তরস

৫.৬.১ কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে শান্তরস

৫.৬.২ সাহিত্য-সমালোচনায় শান্তরস

ষষ্ঠ অধ্যায় **২৭৫ - ৩২৫**

উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা

৬.১ উনিশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিন সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিক: ভরত, ধনঞ্জয় এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ

৬.১.১ *দশরূপ* (ধনঞ্জয়)

৬.১.২ *নাট্যশাস্ত্র* (ভরত) এবং *সাহিত্যদর্পণঃ* (বিশ্বনাথ কবিরাজ)

৬.১.২.১ প্রসঙ্গ: নাটকের শ্রেণিবিভাগ

৬.১.২.২ প্রসঙ্গ: ‘নাটক-পরিচ্ছেদ’

৬.১.২.৩ প্রসঙ্গ: নাটকের হত্যাদৃশ্য ও *সাহিত্যদর্পণঃ*

৬.১.২.৪ উৎস-নির্দেশ

৬.১.২.৫ কঞ্চুকী প্রসঙ্গ

৬.১.২.৬ নাটকের উৎপত্তি ও ভরত

৬.১.২.৭ ভরতের প্রতি উপেক্ষা এবং *সাহিত্যদর্পণঃ* -এর প্রতি বাঙালির পক্ষপাতের কারণসমূহ

৬.২ উনিশ শতক: সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণার অধ্যায়?

৬.৩ সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি আগ্রহের সূচনা

৬.৪ উনিশ শতকে বাঙালির নাট্যচর্চার বিভিন্ন ধারা

৬.৫ ‘ক্লাসিক’ সংস্কৃত রীতির প্রতি প্রকট পক্ষপাত

৬.৬ উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব: অবজ্ঞা থেকে অনুধ্যান— কারণ সন্ধান

উপসংহার **৩২৬ - ৩৫৫**

গ্রন্থপঞ্জি **৩৫৬ - ৩৭৫**

পরিশিষ্ট **৩৭৬ - ৩৮৭**

- পরিশিষ্ট: ১. উনিশ শতকীয় পত্রিকায় বাঙালির রস-সংক্রান্ত মন্তব্য
- পরিশিষ্ট: ২. উনিশ শতকীয় বাঙালির ইংরাজি রচনায় রস-প্রসঙ্গের দৃষ্টান্ত
- পরিশিষ্ট: ৩. প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ‘বিজ্ঞাপন’ (মুখবন্ধ) এবং সাময়িকপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশের চিত্র

ভূমিকা

সাদা পাতায় লিখিত বা মুদ্রিত কিছু অক্ষরের সমষ্টি অথবা উচ্চারিত কিছু শব্দের সন্নিবেশ ঠিক কী কৌশলে পাঠক-শ্রোতার মনোজগৎকে আলোড়িত করে, বিমুগ্ধ করে? কীভাবে তার মনের মধ্যে গড়ে তোলে এক আস্ত অ-লৌকিক মায়াবীপৃথিবী? এই প্রশ্নই বোধহয় সাহিত্যতত্ত্বের সবচেয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা, যা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে সাহিত্যচিন্তকদের বিচিত্রগামী ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। জন্ম নিয়েছে কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বের নানা নতুন নতুন তত্ত্বপ্রস্থান। প্রাচীন ভারতে যাঁরা কাব্য বা সাহিত্যের নির্মাণপ্রক্রিয়া-রহস্য নিয়ে আগ্রহী, তাঁদেরও মূলগত জিজ্ঞাসা ছিল এইটিই। কোন উপায়ে কিছু সাধারণ শব্দগুচ্ছ কবিপ্রতিভার স্পর্শে হয়ে ওঠে অসাধারণ, কীভাবেই বা পাঠকের মনের অন্দরে সেই শব্দগুচ্ছ হয়ে ওঠে আবেদনময়— এই সন্ধান-প্রয়াস প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের এক বড়ো অংশ জুড়ে আছে। বা বলা ভালো, এই সন্ধান-প্রয়াসই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্বের থেকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা এনে দিয়েছে। Seldon Pollock-এর ভাষায়—

> Although story telling in drama or poetry is a universal human practice, few people have meditated as deeply and systematically on the questions it raises as thinkers in India, who over a period of 1,500 years, between the third and eighteenth centuries, carried on an intense conversation about the emotional world of the story and its complex relationships to the world of the audience. [1]

সুদূর তৃতীয় শতক নাগাদ ভারতে যে সাহিত্যতত্ত্বের সূত্রপাত তা একইসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল সাহিত্যের অন্তর্গত কল্পবাস্তবকে এবং পাঠকের নিহিত

---

[1] Sheldon Pollock Ed. and Trans., *A Rasa Reader: Classical Indian Aesthetics* (Permanent Black: Bangalore, 2017), [1].

মনস্তত্ত্বকে। পাশ্চাত্যে পাঠক-প্রতিক্রিয়ানির্ভর সাহিত্যতত্ত্ব জন্ম নেওয়ার বহু বছর আগে প্রাচ্যে নির্মিত হয়েছিল এমন এক তাত্ত্বিক প্রেক্ষণবিন্দু যেখানে সাহিত্যের স্থান-কাল-পাত্র পাঠকের মনোজগৎকে প্রভাবিত করে তার আনন্দের উৎস কীভাবে হয়ে উঠতে পারে, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা আছে। এখানেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষত্ব, বৈভব এবং স্বাতন্ত্র্য। সেই কারণেই সুধীরকুমার দাশগুপ্ত *কাব্যালোক* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

> অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্র এমন একটি বিষয় যাহাতে ভারতীয়গণের গৌরব বোধ করিবার অনেক কারণই বর্তমান। কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যে যে তত্ত্বের আলোচনার প্রারম্ভিক অবস্থা, সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার পরিপক্ক সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়।[2]

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোচনাকেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বচর্চার পরিসরে প্রাপ্ত[3] সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। এরপর আচার্য দণ্ডী, ভামহ, বামন, আনন্দবর্ধন, কুন্তক, ধনঞ্জয়, অভিনবগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখদের হাতে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তার পরিসরটি ক্রমেই পরিপুষ্ট হচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর* পর্যন্ত কাব্যসংক্রান্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন বা পর্যবেক্ষণ-সমন্বিত জ্ঞানচর্চার এই সমৃদ্ধ ধারাটি মোটের ওপর অক্ষুণ্ন ছিল।

কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বনির্মাণের এই ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে বাঙালির অংশীদারিত্ব বা অবদান কতখানি ছিল সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। চৈতন্যপূর্ব যুগের ইতিহাসে বাঙালির মৌলিক কাব্যতত্ত্বচর্চার তেমন কোনও হদিশ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাংলার নবদ্বীপ নব্যন্যায়চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছিল বটে, চৈতন্য নিজেও সন্ন্যাসপূর্ব-জীবনে

---

[2] সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, *কাব্যালোক* (কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৮), [সাত]।

[3] নাট্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও তাদের লিখিত টেক্সট পাওয়া যায়নি।

তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক ছিলেন, বাঙালি নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মিথিলায় গিয়ে পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার কাহিনি সর্বজনবিদিত। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের প্রাচীন বাংলায় ন্যায়শাস্ত্রচর্চার এ হেন বাড়বাড়ন্ত দেখা দিলেও কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্ব খানিক উপেক্ষিত ছিল বলেই মনে হয়। টোল-চতুষ্পাঠীর সনাতন বাতাবরণে যে বিষয়গুলি বহুলভাবে চর্চিত হত সেগুলি হল মূলত স্মৃতি, ন্যায় এবং ব্যাকরণ। পাঠ্যতালিকায় অলংকার পৃথকভাবে খুব গুরুত্ব পেত, এমনটা মনে হয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন উনিশ শতকের প্রথমদিকে বা তারও পূর্বে চতুষ্পাঠী ও টোলের সংস্কৃত-চর্চায় কাব্যের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত না। এমনকি, ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানোর জন্য আলাদা শিক্ষক থাকতেন না, একই শিক্ষক কাব্য ও ব্যাকরণ পড়াতেন।[4]

চৈতন্যোত্তর যুগে কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের দ্বারা এযাবৎ প্রচলিত ভারতীয় রসতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র একটি তাত্ত্বিক বয়ান-নির্মাণের সচেতন প্রয়াস চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর দিব্যজীবনবিভায় প্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন তার ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক অস্তিত্বকে ছাপিয়েও যে সাহিত্যরচনা ও পাঠের একটি বিকল্প তত্ত্বগত অবস্থানে পৌঁছতে চেয়েছিল, সে কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বৃন্দাবনের ভৌগোলিক পরিসরে পল্লবিত হয়ে উঠলেও এই তাত্ত্বিক প্রস্থানের অন্তরালে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীদের মতো বাঙালিদের অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরূপ-রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ উজ্জ্বলনীলমণিঃ*, কবিকর্ণপূর রচিত *নাটক-চন্দ্রিকা, অলঙ্কারকৌস্তুভঃ* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব থেকে পরিগ্রহণের পরেও অন্যতর রসভাবনা তৈরির চেষ্টা চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্ব যেখানে রতিকে স্থায়িভাব এবং শৃঙ্গারকে আদিরসের

[4] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "সংস্কৃত শিক্ষা," *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ বঙ্গাব্দ): ৭৭।

মর্যাদা দিয়েছিল, সেখানে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা আনলেন কৃষ্ণরতি বা ভক্তির বিকল্প ধারণা। তাঁরা কৃষ্ণরতিকে মুখ্যস্থায়িভাবের মর্যাদা দিয়ে অন্যান্য স্থায়িভাবগুলিকে গৌণ স্থায়িভাব হিসেবে চিহ্নিত করলেন। কৃষ্ণরতিকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসলতা, মধুর এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে ভক্তিরসকে আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় রূপ দেওয়াই ছিল বৈষ্ণব রসশাস্ত্রপ্রণেতাদের অন্বিষ্ট। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নির্মিতির সময়কালেই বাঙালির পক্ষ থেকে নতুন এবং বিকল্প এক সাহিত্যতাত্ত্বিক বয়ান তৈরি হল।

চৈতন্যোত্তর যুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালি সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুব মৌলিক কোনও অবদান রেখে যেতে পারেনি— এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি অলংকারচর্চা যে একেবারে উপেক্ষিত ছিল না, সে কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এরপর অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মনন ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রেই নানা নতুন ভাবনা, ধারণা ও তত্ত্বের সংস্পর্শে এল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স, জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার প্রমুখ অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই ওরিয়েন্টালিজমের আলোয় ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরবময় অবস্থানে রাখতে চাইলেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও সেই পথ অনুসরণে নিজেদের অতীতের প্রতি মমত্বশীল হয়ে উঠেছিলেন। বহুমুখী চিন্তার অনুপ্রবেশে বাঙালির মনোজগৎ সেই সময়ে নতুন করে তৈরি হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনিশ শতক তাই এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কার, অন্যদিকে ইউরোপীয় পরম্পরা থেকে আগত ঐশ্বর্যের আত্মীকরণ— দুই দিক থেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করেছিল বাঙালি। এ সময়ে বাঙালির মনোজগৎ যেভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং যে

সর্বাঙ্গীণ পালাবদল দেখা দিয়েছিল, তাকে কোনও একটিমাত্র চিহ্নায়কে চিহ্নিত করা বস্তুত অসম্ভব। এই সময়ে বাঙালির মনোভূমিকে উর্বর করেছিল যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-দার্শনিক উপাদান তাদের চারিত্র্য ছিল নানামাত্রিক। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলস্বরূপ তার মনন ও চিন্তন প্রভাবিত হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস্পৃষ্ট ভাবধারার দ্বারা। ১৮৩৫-এ মেকলে মিনিটের ফলশ্রুতিতে বাংলার বিদ্যায়তনিক চর্চার অভিমুখ প্রায় পুরোটাই পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল। আবার জাতীয়তাবাদের ধারণায় প্লাবিত, ওরিয়েন্টালিজমের স্পর্শে দীক্ষিত বাঙালির মধ্যে দেখা গিয়েছিল ভারতের ঐশ্বর্যময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকানোর প্রণোদনা। তার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলছিল কান্ট-লক-হিউম-মিল-বেন্থাম-কার্লাইল প্রমুখের দর্শন। দান্তে-ভার্জিল-টাসো-মিলটন-শেক্সপিয়ার-স্কট-শেলি-কিটস-বায়রন-ওয়ার্ডসওয়র্থ-গ্যেটে-শিলার প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা, এমনকি ক্রোচে প্রমুখ পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকদের তত্ত্বচিন্তাও নতুন করে গড়ে দিচ্ছিল তাঁদের সাহিত্য সমালোচনার দিগন্তকে। সঙ্গে ছিল কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ভর্তৃহরি, নৈষধ প্রমুখের সাহিত্যিক সুষমা পুনরাবিষ্কারের ঐকান্তিক প্রয়াস। এই একই তাগিদ থেকে বাঙালি নতুন করে খুঁজে নিতে চাইছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের একাধিক জরুরি প্রস্থানবিন্দুকে। ভারতীয় আলংকারিকদের কাব্যসাহিত্য-সংক্রান্ত বহুমুখী ভাবনার রেখা তার মনোভূমি স্পর্শ করেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার একটা ব্যাপ্ত পরিসর তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। এভাবে নানা প্রশ্ন, সংশয়, দোলাচল, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনায় সেই দ্বিধাজর্জর অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুকূল মনোভাবের নজির দেখা যায়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত মনোভাব। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক—

১৮৫৬ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিদের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*। মূলত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত নানা দিক, সংস্কৃত রচনাকৌশল, এই ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এর লক্ষ্য হলেও প্রসঙ্গেক্রমে ভারতীয় রসতত্ত্বের উল্লেখ এসেছে। বিদ্যাসাগরের মত অনুযায়ী, "সংস্কৃতভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরসপ্রধান নাটক অনেক।"[5] "মহাকাব্যসকল আদিরস অথবা বীররসপ্রধান।"[6] ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর নীরব ছিলেন না—

> ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদেষ্টা। ... এরূপ নাট্যাচার্য যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃতভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থে, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[7]

---

[5] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৫।

[6] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ৯৫।

[7] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১১৫।

দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*-এর উল্লেখও এই প্রস্তাবে আছে।[8] শ্রীহর্ষরচিত *নৈষধচরিত*-এর আলোচনাসূত্রে এই রচনা সম্পর্কে মম্মটভট্টের মন্তব্য নিয়ে anecdote-এর উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর।[9] *অমরুশতক*-এর আদিরসাশ্রিত শ্লোকগুলির শান্তিরসাত্মক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে টীকাকার কীভাবে উপহাস্যাস্পদ হয়েছেন সে বৃত্তান্তও শুনিয়েছেন তিনি।[10] *দশরূপক* ও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত সংস্কৃত নাটকগুলির কথা বিদ্যাসাগর যেভাবে উল্লেখ করেছেন[11] তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের টেক্সট নয়, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের আকরগ্রন্থগুলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর *বিবিধ প্রবন্ধ*-এ *রত্নাবলী* নাটিকার আলোচনাসূত্রে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এবং রসতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন[12]। বৈশাখ ১২৮১-

---

[8] 'কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম।' [উৎস: বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১১৩।]

[9] নৈষধচরিতের বিষয়ে এক কৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা করিয়া স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মটভট্ট আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেইসময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতেই সমুদায় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।' [উৎস: বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*, ১০৩-১০৪।]

[10] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১০৯।

[11] '... সমুদয়ে বিরাশিখানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশখানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে এবং উদাহরণপ্রদর্শনার্থে অনেকেই কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।' [উৎস: *বিদ্যাসাগর, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১২১।]

[12] 'সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দোষ-প্রকরণ ভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রায় সকল প্রকরণেই রত্নাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে আলঙ্কারিকদের নির্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাঁহাদিগের বিধিসম্মত উৎকর্ষ বহুলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। ...উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা অপেক্ষা রত্নাবলীর গঠন প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম দুইটি নাটকে রসের প্রারম্ভ অবধি তাহার বিবিধ পরিণতি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, রত্নাবলীতে সেরূপ ক্রমান্বয় নাই। রসের বৃদ্ধিশীলতা এবং তাহার একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি, প্রথমোক্ত দুইটীর সারভূত। তৃতীয়টিতে,

এর *বঙ্গদর্শন*-এ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রামদাস সেন শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত* ও অন্যান্য রচনা নিয়ে যখন পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন, তখন উভয়েই ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*, ধনঞ্জয়ের *দশরূপক* এবং মম্মটের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন।[13]

মম্মটভট্টের সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তনের সঙ্গে ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে রচিত রবীন্দ্রকবিতা 'পুরস্কার'-এর এক অংশের মিল খুঁজে পেয়েছেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। মহাকাব্যের অঙ্গীরসের উদাহরণ দিতে গিয়ে রামায়ণের ক্ষেত্রে করুণরস এবং মহাভারতের ক্ষেত্রে শান্তরসের উপস্থিতির দিকে আলোকপাত করেছিলেন মম্মট।[14] অনুরূপভাবে 'পুরস্কার' কবিতার কবিকে 'করুণ' কথায় 'রাঘবের ইতিহাস' বর্ণনা করতে এবং মহাভারতে প্রকাশিত 'উদার শান্তি' নিয়ে কাব্যরচনা করতে দেখা যায়।[15] উভয়ের ভাবনাগত সাদৃশ্যটুকু এখানে চোখে পড়ার মতো। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে *ভারতী*-তে প্রকাশিত

রসের ভাব এমত স্থির যে, যেন পাত্রনিহিতের ন্যায় দৃশ্যমান। সুতরাং প্রথম দুইটিকে দেব-নদী ও তৃতীয়টিকে দেব-সরোবর বলা যাইতে পারে।' [উৎস: ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "রত্নাবলী," *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ* (হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ), ৬৪-৬৮।]

উদ্ধৃত অংশে 'রস' এবং 'ভাব' শব্দদুটির পারিভাষিক প্রয়োগ কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর হলেও, প্রাচ্য রসতত্ত্ব সম্পর্কে ভূদেবের যে কোনোরকম বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য এই অংশটি যথেষ্ট।

13 'ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপক নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন।'...'ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে।' [উৎস: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ১৮।]

'আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকাসহ সরস্বতী কণ্ঠাভরণ আছে, তাহার মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাইলাম না এবং বুলার সাহেব লিখিয়াছেন তিনিও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কারগ্রন্থে দেখেন নাই।... আবার যদি কোন একখানি সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক থাকে, তবে তাহা অধুনিক কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিব – এজন্য তাহা কৃত্রিম।' [উৎস: শ্রীরামদাস সেন, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ১৮।]

14 বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১১৬।

15 ভট্টাচার্য, "আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়," ১১৬।

‘বঙ্গসাহিত্য’ এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত ‘অলঙ্কারশাস্ত্র’ নামক প্রবন্ধদুটির নির্বাচিত অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এখানে ভারতীয় রসতাত্ত্বিকদের মনস্বিতা ও বৌদ্ধিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে প্রবন্ধকারদের গভীর শ্রদ্ধার ভাবটি প্রকট। ইংরেজ আলংকারিকদের তুলনায় সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রতি লেখকদের পক্ষপাত বুঝে নিতেও অসুবিধে হয় না।

> ❖ ... অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ, শুদ্ধ যে রুচিপরিবর্ত্তনই অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ নহে। উহা পদার্থবিদ্যার ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।
>
> ... অলঙ্কারশাস্ত্রের এমত উদ্দেশ্য নহে যে, উহাতে লোককে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, উহাকে কেবল বক্তাকে বিশুদ্ধ প্রণালী দেখাইয়া দেয় মাত্র। ... কবি যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, ও বক্তা যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হতে পারে।
>
> ... আলঙ্কারিক সামাজিক হইতেও উচ্চতর, তিনি সামাজিকদের উচ্চতর রুচির পথ দেখাইয়া দেন।[16]

> ❖ এবার সাহিত্যদর্পণকারের মতটি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে “রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য” – এই ‘রস’ শব্দ ব্যাবহারে তিনি ইংরেজ আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা কবিতার প্রকৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল বলেন যে, “আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি যে সকল চিন্তা ও বাক্যের আকারে আপনা আপনি প্রকাশ হয় তাহার নামই কবিতা”, এবং রবার্টসন বলেন যে, “উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাবের ভাষার নামই কবিতা” – এইরূপ আরও অনেক আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কিনা সে বিষয়ে তাঁহাদের

---

[16] অজ্ঞাত, “অলঙ্কারশাস্ত্র,” *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮-২২।

> ভ্রুক্ষেপ নাই। ... এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র যদি কবির হৃদয়ের তালে তালে নিনাদিত না হয় তাহা হইলে কবির কবিত্বই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। এই যে লেখকের ও পাঠকের মধ্যে মমতা-ভাবটি, ইহা সাহিত্য-দর্পণকারের 'রস' শব্দেই নিহিত আছে।... [17]

বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সঙ্গে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রায় সকলেরই মনে হয় অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। তরুণ রবীন্দ্রনাথও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে *ভারতী* পত্রিকায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সমালোচনাকালে 'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা/ ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ/ মজাইছে লঙ্কা মোর'— এই উপমা সম্পর্কে বললেন—

> এই উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্য্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।[18]

সাহিত্যদর্পণকার কোন স্থানে কোন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন তা যে ব্যক্তির নখদর্পণে, তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ১৮৭৭ সাল ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রচর্চার ইতিহাসে আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই Buhler-এর গবেষণার ফলস্বরূপ কাশ্মীরে বিকশিত ভারতীয় রসতত্ত্বের সমৃদ্ধ ধারাটি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় Regnaud রচিত *Rhetorique Sanskrite*। এর প্রায় দু-দশক আগে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়*। বইটির সপ্তম সংস্করণে

[17] অজ্ঞাত, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৯২।

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদ বধ কাব্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ১০-১১।

শিরোনামের তলায় লেখা 'A Treatise on Rhetorical Composition'. বইটির ভূমিকা অংশে লালমোহন লিখেছেন "বঙ্গভাষায় একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া"[19] তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে এ বই লিখতে অনুরোধ করেন। এ বইয়ের প্রকাশে তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ E B Cowell-এর সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কথাও বিজ্ঞাপন অংশ থেকে জানা যায়।[20] বইয়ের সূচনায় অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের তরফ থেকে এই বইয়ের উপযোগিতা বর্ণনা করে Government of Bengal-এর জুনিয়র সেক্রেটারিকে লেখা একটি চিঠিও ছাপা হয়েছে। সেখান থেকে ১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ সালে বইটির বিদ্যালয় ও স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমভুক্ত হওয়ার কথা জানা যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, "…the book has already achieved for itself a high reputation"[21]। ই বি কাউয়েল বইটির বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, "…it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time."[22]

কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত বিদ্যায়তনিক চর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কিছু মানুষ যে সময়কালকে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের বৌদ্ধিক ঐশ্বর্যের দিকে মুখ ফেরানোর 'high time' বলে মনে করছেন, সেই একই সময়পর্বে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অন্যান্য বাঙালির

---

[19] লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

[20] 'যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ সমুদয় প্রস্তাবের এক একটী ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউয়েল এম,এ মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম; ঐ মহাত্মা অনুরাগপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঐ প্রতিশব্দগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।'

[21] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়,* Letter from The Officiating Director of Public Instruction, Bengal, to the Junior Secretary to the Government of Bengal.

[22] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়,* ADVERTISEMENT.

ধারণা কেমন? ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' নামক প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হচ্ছে "অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম শুনলেই ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে, অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে।"[23] এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যেতে পারে সংস্কৃত-জানা এমনই এক 'ইংরেজওয়ালা' মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা। যিনি বন্ধুকে লেখা চিঠিতে *মেঘদূত* পড়ার মতো যথেষ্ট সংস্কৃত জানেন বলে দাবি জানিয়েও সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের শাসনে স্বরচিত কাব্যকে বেঁধে না রাখার কথা ঘোষণা করেন।[24] তবে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মাইকেল এবং তাঁর সমকালীন পণ্ডিতসমাজ সম্ভবত সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র তথা সাহিত্যতত্ত্বের সুদীর্ঘ এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে সেভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল একমাত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর মাধ্যমে, যা প্রাচ্যতত্ত্বের ঐশ্বর্যময় ধারাটির সামগ্রিকতা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা বা উদাসীনতা বা অবজ্ঞাকেই স্পষ্ট করে তোলে।[25] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধতেও প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধার ভাব সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

[23] অজ্ঞাত, "অলঙ্কারশাস্ত্র," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮।

[24] 'If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models.' [উৎস: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, "Letters," *মধুসূদন রচনাবলী*, সম্পা. সুরেশচন্দ্র মৈত্র (কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৩৯০বঙ্গাব্দ।), ৩২৭]

[25] কিন্তু এখন অন্তত নিঃসঙ্কোচে একথা বলতে কোনো বাধা থাকতে পারে না যে, মাইকেল এবং তাঁর সমকালীন পণ্ডিত সমাজ উভয়েই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস, তাতে বর্ণিত সাহিত্যসমালোচনাপদ্ধতির বিচিত্র ধারা, তার গভীর দার্শনিকতা, তার উদার সর্বজনীনতা– এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের সম্বল ছিল বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' বা তারই একটি বিচ্ছিন্ন

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অনুপযোগিতাই ঘোষণা করেছেন। 'স্থায়িভাব' বা 'রস' তাঁর কাছে কাব্যবিষয়মাত্র। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বকে একটি বিশেষ সময়ের ফসল হিসেবে চিহ্নিত করে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতাকে নাকচ করার চেষ্টাও তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। এমনকি "আলঙ্কারিকদের প্রণাম করি"-র[26] মতো চাপা বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করতেও ছাড়েননি বঙ্কিম।

প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে আরও এক পণ্ডিতের উক্তি প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সুশীল কুমার দে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Studies in the History of Sanskrit Poetics*-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন,

> I have ventured to set forth, in the following pages, the results of some of my researches, in the subject, with the hope of drawing the attention of scholars to a discipline which has not yet been systematically investigated, but which, forming as it does the foundations of a study of Classical Sanskrit Poetry, is not without its importance in the general history of Sanskrit literature.[27]

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যখন সুশীল কুমার দে-কে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে 'a discipline which has not yet been systematically investigated'— এই বাক্যাংশ ব্যবহার করতে হয়, তখন এ কথা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গোটা উনিশ শতক জুড়ে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে নিবিড় নিষ্ঠাপূর্ণ ও গবেষকসুলভ অনুসন্ধিৎসা তেমন

অংশমাত্র। [উৎস: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "অলঙ্কার-শাস্ত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১২৫।]

[26] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), ১৮৫।

[27] Sushil Kumar De, "Preface," *Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol I* (London: Luzac & Co., 1923), IX.

কেউই প্রকাশ করেননি। যারা করেছেন তাঁরাও সচরাচর Regnaud বা Buhler এর মতো পাশ্চাত্যদেশীয় গবেষক, বাঙালি নন।

সুতরাং ইতিবাচক ও নেতিবাচক এবং এই বাইনারির বাইরে-থাকা নানাপ্রকার জটিল, বহুত্বময়, পরস্পরবিরোধী চিন্তনস্রোতের অভিঘাতে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সামগ্রিক মনোভাব কেমন ছিল? ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিল, কীভাবে গ্রহণ করেছিল উনিশ শতকের বাঙালি? এই প্রশ্নকেই কেন্দ্রে রেখে এগিয়েছে এই গবেষণার মূলগত অনুসন্ধান।

পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রদর্শিত পথরেখা ধরেই তৈরি হয় গবেষণার নতুনতর ক্ষেত্র। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুশীলকুমার দে রচিত *History of Sanskrit Poetics*, পি ভি কানে রচিত *History of Sanskrit Poetics* প্রভৃতি প্রখ্যাত গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কাজগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ও তার বিবর্তনের অনেকান্ত প্রবণতাকে ধরার ক্ষেত্রে G. N Devy রচিত *After Amnesia: Tradition and Change in Indian Literary Criticism (1992)*, *Of Many Heroes: An Indian Essay in Literary Historiography (1998), Indian Literary Criticism: Theory of Interpretation (2010)*– গ্রন্থগুলি সুবিদিত। কিন্তু এই গবেষণাগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চার ওপর আলাদা কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সংস্কৃত রসতত্ত্বের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ক কিছু গবেষণা লক্ষ করা যায়, যার দৃষ্টান্ত ড. সৌমিত্র বসুর তত্ত্বাবধানে রচিত সংগীতা গুপ্তের গবেষণাপত্র *উদ্ভটরস ও বাংলা সাহিত্য*। কিন্তু এইধরনের কাজেও বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার ওপর পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়নি।

অন্যদিকে, উনিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি-সংক্রান্ত বহু গবেষণাগ্রন্থের হদিশ বাংলা বিদ্যাচর্চার পরিসরে পাওয়া যায়। ১৯৯৮-তে প্রদীপ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন' *সাময়িকী*-তে 'উনিশ শতকের বাংলা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান ও সমাজ'-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা বা উনিশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বচর্চা-বিষয়ক প্রবন্ধের এ জাতীয় কোনও সংকলন এই অভিসন্দর্ভকারের নজরে আসেনি।

অলোক রায় রচিত *বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা: উনিশ শতক* গ্রন্থে উনিশ শতকে বাঙালি কবিদের কাব্য-সংক্রান্ত মনোভাব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। নন্দিতা বসু রচিত *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক* গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় 'বাংলাভাষা চিন্তা: ছন্দ-অলংকার-রীতি'-তে বাঙালির অলংকার-শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত-কাব্যতত্ত্বচর্চা-বিষয়ক বিস্তারিত কোনও গবেষণা এযাবৎ দৃষ্টিতে পড়েনি।

এখানে পরিভাষা সংক্রান্ত কিছু দ্বন্দ্বেরও নিরসন আবশ্যক। এই অভিসন্দর্ভে 'ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব' এই শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব অর্থে। নন্দিকেশ্বর-ভরত প্রমুখের সময় থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে সংস্কৃত ভাষায় যে কাব্যতত্ত্বের চর্চা হয়েছে, তাই-ই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। দক্ষিণ ভারতেও প্রাচীনযুগ থেকেই দেখা গিয়েছিল সাহিত্যতত্ত্ব-নির্মাণপ্রয়াস। যেমন, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ প্রাপ্ত তামিল ব্যাকরণ *তোলকাপ্পিয়াম*-এ কাব্যতত্ত্বচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু উনিশ শতকের আগে এবং পরেও বাঙালির সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা

মূলত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নির্মিত সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অন্য কোনও কাব্যতত্ত্ব উনিশ শতকের বাঙালির চর্চার পরিধির অন্তর্গত ছিল না বলেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব এই অভিসন্দর্ভে ভরত-বামন-দণ্ডী-ভামহ-কুন্তক-মম্মট-আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত প্রমুখ-প্রবর্তিত কাব্যতত্ত্বের সমার্থক।

প্রাচীন যুগের সংস্কৃত সাহিত্য ছিল মূলত কাব্য ও নাট্যে বিভক্ত। তাই কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব— এই দুইয়ের সম্পর্কেই 'সাহিত্যতত্ত্ব' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

'অলংকার-শাস্ত্র', 'রস-শাস্ত্র বা রসতত্ত্ব' এবং 'কাব্যতত্ত্ব'— এই তিন পরিভাষার পার্থক্যগুলিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কাব্যরচনা, পাঠ এবং সমালোচনার কিছু মূলগত তাত্ত্বিক প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয় কাব্যতত্ত্ব। আর অলংকার মূলত ফলিতবিদ্যাকেন্দ্রিক আলোচনা। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার সূচনাপর্বে অলংকারকেই কাব্যসৌন্দর্যের উৎস হিসেবে ধরা হত বলে কাব্যতত্ত্বের অপর নাম ছিল 'অলংকার-শাস্ত্র'। সপ্তম শতক নাগাদ ভামহের *কাব্যালঙ্কার* রচনার সময়ে অলংকার-সংক্রান্ত আলোচনা কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। এই সময়ে অলংকারশাস্ত্র এবং কাব্যতত্ত্বের সীমারেখাটি অস্পষ্ট ছিল। আবার সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার পরবর্তী পর্যায়ে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখের সময়ে অলংকারের বদলে রস কাব্যসৌন্দর্যের সারাৎসার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফলে সেই সময় থেকে কাব্যতত্ত্বের বিকল্প হিসেবে 'রসতত্ত্ব' বা 'রসশাস্ত্র' শব্দগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অভিসন্দর্ভে 'কাব্যতত্ত্ব', 'রসশাস্ত্র', 'রসতত্ত্ব', 'অলংকার-শাস্ত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

সময় এবং অভিসন্দর্ভের আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে উনিশ শতকের কিছু নির্বাচিত গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকার মধ্যে গবেষণাক্ষেত্রকে সীমায়িত করা হয়েছে। যে যে গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল—

- *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৬)- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- *সাহিত্যমুক্তাবলী* (১৮৬২)- জয়গোপাল গোস্বামী
- *কাব্য-দর্পণ* (১৮৭৪)- জয়গোপাল গোস্বামী
- *কাব্য-সুন্দরী* (১৮৮০)- পূর্ণচন্দ্র বসু
- *শকুন্তলা-তত্ত্ব* (১৮৮১)- চন্দ্রনাথ বসু
- *প্রসাদ-প্রসঙ্গ* (১৮৮৬)- দয়ালচন্দ্র ঘোষ
- *সমালোচনা* (১৮৮৭)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (১৮৯৩)- যোগীন্দ্রনাথ বসু
- *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ* (১৮৯৫)- ভূদেব মুখোপাধ্যায় (*উত্তরচরিত*, *রত্নাবলী* এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর সমালোচন)
- *সাহিত্য-চিন্তা* (১৮৯৬)- পূর্ণচন্দ্র বসু
- *পঞ্চভূত* (১৮৯৭)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে *সাধনা*-য় প্রকাশিত (মাঘ ১২৯৯-কার্তিক ১৩০২), ১৩০৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]
- *কাব্যনির্ণয়* (১৮৯৮)- লালমোহন বিদ্যানিধি
- *কাব্য-চিন্তা* (১৮৯৯)- পূর্ণচন্দ্র বসু
- *শকুন্তলা-রহস্য*- বিহারীলাল সরকার
- *হরপ্রসাদ-রচনাবলী* (১৯৮১)- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি', 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ)
- *মধুসূদন-রচনাবলী* (১৯৯৫)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যে যে সাময়িকপত্র আকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশসাল (বঙ্গাব্দ)	উনিশ শতকের সময়সীমায় প্রাপ্ত খণ্ডের সংখ্যা
সংবাদ প্রভাকর	১২৪৭	১০ (১২৬৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
বঙ্গদর্শন	১২৭৯	৯ (১৮৭২-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)
আর্য্যদর্শন	১২৮১	১১ (১২৯২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
ভ্রমর	১২৮১	১ (১২৮২ বঙ্গাব্দ)
ভারতী	১২৮৪	২১ (১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
নব্যভারত	১২৯০	১৮ (১৩০৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
প্রচার	১২৯১	২ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
বিভা	১২৯৪	১
সাহিত্য	১২৯৭	৯ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
সাধনা	১২৯৯	৩ (১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
সাহিত্য-কল্পদ্রুম	১২৯৯	১
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩০২	৫ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্ব যে উনিশ শতকেই বাঙালি লেখকদের আলোচনার পরিধিতে প্রবেশ করেছিল, এমন নয়। তার আগে থেকেই বাংলায় সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। সেই ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের **'উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা'** শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের মূল অভীষ্ট ছিল।

পূর্বসূরিকে অগ্রাহ্য করে উত্তরসূরির ভিত্তিস্থল যেমন পোক্ত হয় না, তেমনি অলংকারবাদকে বাদ দিলে অস্তিত্বসম্ভব হয় না রীতি, ধ্বনি বা রসবাদ। উনিশ শতকের বাঙালি কীভাবে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই প্রথমেই অলংকারবাদের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সেদিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তাই এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'উনিশ**

শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ’। দণ্ডী, রুদ্রট প্রমুখ অলংকারবাদী তাত্ত্বিকদের সম্পর্কে বাঙালির চর্চার পরিসরটি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের উল্লেখ কীভাবে এসেছে, তাও এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের চর্চাকে যদি আদি পর্যায় (অলংকারবাদ, রীতিবাদের যুগ) এবং নবপর্যায় (ধ্বনিবাদ, রসবাদের যুগ)— এমন দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে আচার্য মম্মটের কাব্যতত্ত্বনিরীক্ষাকে রাখতে হয় এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে। অলংকার ও রীতিবাদের পুরোনো ধারা ছেড়ে ধ্বনিবাদ ও রসবাদের পথে যে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, তার নান্দী যেন ঘোষণা করেছিল মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*। সেই *কাব্যপ্রকাশ* সম্পর্কে উনিশ শতকের বাঙালিদের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে **‘উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*** শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সময়-পরম্পরা অনুসারে যে সব প্রস্থানভেদকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার পথচলায়, তার মধ্যে আধুনিকতম তত্ত্ব নিঃসন্দেহে রস-প্রস্থান। চতুর্দশ মতান্তরে পঞ্চদশ শতকের তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণঃ* লেখার সময় রসতত্ত্বকেই তাঁর তত্ত্বভাবনার কেন্দ্রস্থলে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসকেই কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেন। উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রায় অবিসংবাদিত প্রাধান্য পেয়েছিল। **‘উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*’** শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে উনিশ শতকের বাংলায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* সংক্রান্ত চিন্তন।

উনিশ শতকের অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা এবং সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল রস প্রসঙ্গের আনাগোনা। উনিশ শতকের বাংলায় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় এবং সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনায় শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত— প্রভৃতি রসের আলোচনা কীভাবে ধরা দিয়েছে তা দেখে নেওয়া এবং এর সাপেক্ষে রসবাদের প্রতি বাঙালির মনোভাব বুঝে নেওয়া **'উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য'** নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যতম অভীষ্ট। কেন কয়েকটি বিশেষ রস উনিশ শতকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সেই কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে। উনিশ শতকে বাঙালি কোন কোন রসের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছে এবং সেই পক্ষপাতের আড়ালে ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক সময়ের অভিক্ষেপ কতখানি ক্রিয়াশীল— তা খুঁজে নেওয়া এই অধ্যায়ের আরেকটি লক্ষ্য।

নাটক প্রধানত অভিনয়-নির্ভর Performing Art. কিন্তু নাটকের লিখিত টেক্সট সাহিত্যতত্ত্বের আওতার বাইরে নয়। তাই এই অভিসন্দর্ভে উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত ভাবনার পাশাপাশি যা পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির মনোভঙ্গি। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হলে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের সমালোচক ও লেখকরা? সেই সম্পর্কিত আলোচনা এবং অন্বেষণ **'উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা'** শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয়।

এইভাবেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের নানা তত্ত্বপ্রস্থান কীভাবে উনিশ শতকের লেখক, সমালোচক, পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের মননে ধরা দিয়েছিল, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের কোন দিকগুলি তাঁদের অভিনিবেশের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল আর কোন ক্ষেত্রে বর্ষিত হয়েছিল তাঁদের তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা বা সমালোচনা— তা চিহ্নিত করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। সেইসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার কারণগুলিও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সময়পর্বে প্রাচীনতর আরেক সময়পর্বের সাহিত্যতাত্ত্বিক মনীষার দিকে কীভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিল বাঙালি, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানপ্রয়াস উনিশ শতকীয় বাংলার চারিত্র্য-নিরীক্ষণে জরুরি হয়ে উঠবে বলেই আশা করা যায়। বাঙালির কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বকেন্দ্রিক চিন্তার কালানুক্রমিক বিবর্তনের এক খণ্ডচিত্রেরও হদিশ দেবে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ।

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা

উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য। তবে, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্ব যে উনিশ শতকেই বাঙালি লেখকদের আলোচনার পরিধিতে প্রবেশ করেছিল, এমন নয়। তার আগে থেকেই বাংলায় সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস ছিল।

মূলত সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতদের উদ্যোগে এবং অভিনিবেশেই উনিশ শতক-পূর্ববর্তী সময়ে চর্চিত হয়েছিল সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের নানা দিক। রচিত হচ্ছিল অলংকার-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মৌলিক গ্রন্থ[1]। সঙ্গে লেখা হচ্ছিল প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের টীকা-গ্রন্থও। টোল এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতচর্চার যে ধারা ছিল, তার অংশ হিসেবেও অলংকার-শাস্ত্র পঠিত হত বলে অনুমান করা যায়।

এছাড়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগে ষোড়শ শতক নাগাদ বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা যে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রণয়ন করেন, তা রসভাবনার দিক থেকে নিঃসন্দেহে মৌলিকতার সাক্ষ্য বহন করে। প্রমথনাথ তর্কভূষণের ভাষায়—

> নাট্যশাস্ত্রকার মহামুনি ভরতের সময় হইতে পণ্ডিতরাজ রসগঙ্গাধর-রচয়িতা জগন্নাথ কবির সময় পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না...। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বড়ই শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় যে, ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন কন্থা-কৌপীন-সম্বল বৈরাগী... বিভিন্ন পথে ধাবমান আলঙ্কারিকতা ও

---

[1] তবে, এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, সপ্তদশ শতকে আচার্য জগন্নাথ রচিত *রসগঙ্গাধর*-এর পরে ভারতে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ধারায় তেমন কোনও মৌলিক চিন্তা চোখে পড়ে না। বাঙালি কোনও তাত্ত্বিক বা আলংকারিক সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ধারায় তেমন কোনও স্বতন্ত্র অবদান রাখেননি বললেই চলে।

> দার্শনিকতাকে একই উদ্দেশ্যের দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[2]

প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কথিত এই 'কন্থা-কৌপীন-সম্বল' বাঙালি বৈরাগী হলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রমুখ যে সব ব্যক্তির মনীষা নির্মাণ করেছিল চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দর্শনের মূল কাঠামো, তাঁরা বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে ছিলেন বঙ্গদেশেরই আদি অধিবাসী। অজস্র স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রসতত্ত্ব সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের কাঠামোকেই অনুসরণ করেছিল। ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তৃতি দিয়েছিল। তবে, সম্পূর্ণ নতুন এক তত্ত্বপ্রস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন যে কাব্যতত্ত্বের কাছে তাঁরা ঋণী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব। তাই তাঁদের নির্মিত রসতাত্ত্বিক কাঠামোকে বাঙালির সংস্কৃত রসতত্ত্বচর্চার পরিধিতে ফেলে বিশ্লেষণ করাই যায়।

উনিশ শতক-সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব কীভাবে বাঙালিকে প্রভাবিত করেছে, তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। উনিশ শতকে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রতি বাঙালির আগ্রহ বা অনীহা কোনও বিচ্ছিন্ন তত্ত্বগত অবস্থানবিন্দু নয়। বরং তা এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরার ফলশ্রুতি। সেই ঐতিহাসিক পরম্পরার সন্ধানই এই অধ্যায়ের অন্বিষ্ট।

১.১ টোল ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা

উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলার সংস্কৃতচর্চায় নবদ্বীপের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যপূর্ব সময় থেকেই নবদ্বীপে বহু নতুন গ্রন্থ রচিত এবং সংকলিত হচ্ছিল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছিল। নানা অঞ্চল থেকে বিদ্যার্থী সমাগম শুরু হয়। এই সব শিক্ষার্থীদের

---

[2] প্রমথনাথ তর্কভূষণ, *বাংলার বৈষ্ণব দর্শন* (কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), ৩৮-৪০।

মধ্যে কেউ কেউ পড়া শেষ করে নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করতে শুরু করেন। নবদ্বীপের বিদ্যোৎসাহী রাজারা অধ্যাপকদের জীবিকানির্বাহের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করতে লাগলেন। যাতে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি হয় সে জন্য রাজারা ছাত্রদেরকেও উৎসাহ দিতেন। এইসব কারণে সংস্কৃত শিক্ষার অদ্বিতীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল নবদ্বীপ। এইসময়ে নবদ্বীপের রাজারা নিজেদের সন্তানদেরও সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চা' প্রবন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য বলেছেন—

> তাঁহারা সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিতেন যে, অনায়াসে সুন্দর সুন্দর শ্লোক সংস্কৃতে রচনা করিতে পারিতেন। রাজবাটীতে সংস্কৃত ভাষা সর্বদা এতদূর ব্যবহৃত হইত যে, রাজপরিচারকের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কথোপকথন বেশ বুঝিতে পারিত।[3]

লক্ষণীয়, এখানে সংস্কৃত রসসাহিত্য রচনার উল্লেখ থাকলেও, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রচর্চার তেমন কোনও উল্লেখ নেই। তাহলে উনিশ শতকের পূর্ববর্তী সময়কালে কি বাঙালি সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় সেভাবে মনোনিবেশ করেনি?

আসলে, উনিশ শতকের আগে বাঙালির সংস্কৃতচর্চা প্রায় সর্বতোভাবেই ছিল টোল ও চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক। টোল ও চতুষ্পাঠীতে মূল যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত সেগুলি হল—

- ব্যাকরণ
- স্মৃতিশাস্ত্র ও ন্যায়
- কাব্য ও অলংকার

---

[3] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ১৫৮।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, টোলগুলিতে এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কাব্য ও অলংকারপাঠের প্রবণতা উনিশ শতকে হঠাৎ করেই বেড়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখেছেন—

> কাব্যটোলে ছাত্র আর ধরে না। ৫/৭ খানা কাব্য ভাল করিয়া না পড়া থাকিলে পণ্ডিত সমাজে মুখ দেখান ভার হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যের পণ্ডিত ব্যাকরণের পণ্ডিত হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। ও তাহার মান্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক কাব্যের টোলে অলঙ্কার যাহা ১৫/১৬ বৎসর পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, পঠিত হইতেছে...[4]

এর সঙ্গে তুলনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ কথাও জানিয়েছেন, আগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমদিকে বা তারও পূর্বে চতুষ্পাঠী ও টোলের সংস্কৃত-চর্চায় কাব্যের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত না। এমনকি, ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানোর জন্য আলাদা শিক্ষক থাকতেন না, একই শিক্ষক কাব্য ও ব্যাকরণ পড়াতেন।[5] সুতরাং কাব্যতত্ত্ব বা অলংকার-শাস্ত্রও যে খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি, তা অনুমান করে নেওয়া কঠিন হয় না।

তবে অলংকার-শাস্ত্র যে পরিসরেই শেখানো হোক না কেন, উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃত-শিক্ষায় গভীরতার অভাব ছিল না বলেই মনে হয়। উনিশ শতকে “ইংরাজীবিদ্যার বহুল প্রচার”-এর ফলে দীর্ঘসময় ধরে “সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গ্রন্থগুলি পাঠ করার প্রবৃত্তি”[6] অন্তর্হিত হয়েছে, এবং নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতিও ছাত্রদের ফাঁকি দেওয়া

---

[4] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “সংস্কৃত শিক্ষা,” *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ বঙ্গাব্দ): ৭৮-৭৯।

[5] শাস্ত্রী, “সংস্কৃত শিক্ষা,” ৭৭।

[6] এখন আর তত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গ্রন্থগুলি পাঠ করার প্রবৃত্তি নাই। অল্প সময়ে অনেক বিষয় পাঠ করার প্রবৃত্তি অধিক হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ ইংরাজীবিদ্যার বহুল প্রচার। টোলে ১৭ বৎসর পর্যন্ত ব্যাকরণ শেষ হইল না, অথচ স্কুলে লোকে ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁথি পড়িয়া ফেলিল। দেখিয়া শুনিয়া সহ্য করা যায় না। [উৎস: শাস্ত্রী, “সংস্কৃত শিক্ষা,” ৭৮-৭৯।]

সুযোগ করে দিয়েছে[7] বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্য সংস্কৃত-চর্চার সমস্ত শাখা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাই উনিশ শতকের পূর্বে অলংকার-শাস্ত্র ব্যাপ্ত আকারে না হলেও, অনুপুঙ্খভাবে চর্চিত হত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

১.২ চৈতন্যদেবের অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞান

অলংকার-শাস্ত্র উনিশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলায় যে নিতান্ত অবহেলিত ছিল না, তার আরেকটি প্রমাণ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া চৈতন্যদেবের অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টক'-এর কথা সর্বজনবিদিত। সেখানে বৈষ্ণব ধর্মজ্ঞান যত প্রকট, রসশাস্ত্রজ্ঞান সেভাবে প্রতিফলিত নয়। সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে শ্রীচৈতন্য যে বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা মূলত ব্যাকরণ। *চৈতন্যভাগবত*-এ বলা হয়েছে, চৈতন্য গঙ্গাদাস নামে এক ব্যক্তির টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই গঙ্গাদাস ছিলেন "ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিদ্"[8]। *চৈতন্যচরিতামৃত*-এও চৈতন্যদেব কর্তৃক কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যাপনার কথা আছে। এই ব্যাকরণ পড়ানো নিয়ে তাঁর মনে যে গর্বের অনুভূতি ছিল সে কথাও জানা যায় *চরিতামৃত* থেকেই— "ব্যাকরণ পঢ়াই অভিমান করি।"[9]

---

[7] এক্ষণে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষার সহজ ও কঠিন দুই প্রকারের প্রশ্নই থাকে, সহজ প্রশ্ন কয়টা লিখিতে পারিলেই পাশ হইল। ... এখন একটুকু চালাকী থাকিলে ২/৩ মাস পড়িয়া সকল পরীক্ষাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। [উৎস: শাস্ত্রী, "সংস্কৃত শিক্ষা," ৭৮-৭৯।]

[8] বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "শ্রীচৈতন্যদেব: গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সংস্কৃত সাহিত্য," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ৪৫।

[9] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, "আদিলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ," *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সম্পা. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭), ১১৬। (১৬.৩২.৩৫)

কিন্তু অলংকার-শাস্ত্রে যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না, এ কথা *চরিতামৃত-এর* চৈতন্য নিজমুখেই স্বীকার করেছেন, "নাহি পড়ি অলঙ্কার– করিয়াছি শ্রবণ।"[10] আবার, অদ্বৈতাচার্যের অনুপন্থী মুকুন্দ দত্ত নামে নবদ্বীপের এক টোলের অধ্যাপককে শ্রীচৈতন্য মুখোমুখি তর্কবিচারে আহ্বান করলে মুকুন্দও ভেবেছিলেন— "এ ব্যক্তি ব্যাকরণের অধ্যাপক; অলঙ্কার জানে না; অতএব ইহাকে অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজয় করিব।"[11]

অলংকার-শাস্ত্রের প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও অলংকারের সেই কঠিন প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হতে চৈতন্যদেবের অসুবিধে হয়নি। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতে, কেশবকাশ্মীরীর সঙ্গে বিচারে একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ', 'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম' এবং 'পুনরাত্ত'— এই চারটি দোষ বিচার করে দেখান। অনুপ্রাস এবং পুনরুক্তবদাভাস- এই দুটি শব্দালংকার; অন্যদিকে উপমা, বিরোধাভাস, অনুমান— এই তিনটি অর্থালংকারেরও প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন।[12]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দীতে যে পণ্ডিতের অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞান তত সুবিদিত নয়, তিনিও অলংকার সম্পর্কে একেবারে অনবহিত নন। এখান থেকে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্যুতি ছাড়াও উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে অলংকার-শাস্ত্রচর্চার একটি রূপরেখা অনুমান করে নেওয়া যায়। কারণ, অলংকার-শাস্ত্রের অন্তত

---

[10] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, "আদিলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ," *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,* সম্পা. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭), ১১৭। (১৬.৫২)

[11] জগদীশ্বর গুপ্ত, "চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৪৮৪-৮৫।

[12] ভট্টাচার্য, "শ্রীচৈতন্যদেব," ৪৬।

প্রাথমিক চর্চাটুকু টোল-চতুষ্পাঠীতে হত বলেই চৈতন্যদেবের পক্ষে তাতে দক্ষতা অর্জন সম্ভবপর হয়েছিল।

১.৩ উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় রচিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক অলংকার-গ্রন্থ

রসগঙ্গাধর-এর পর থেকে ভারতে রসশাস্ত্র-সংক্রান্ত মৌলিক রচনা বিরল হয়ে পড়ে। বাংলাতেও তেমন মৌলিক কোনও তত্ত্বসমন্বিত গ্রন্থ মেলে না বললেই চলে। তবে উনিশ শতকের পূর্বে অল্পসংখ্যক হলেও এমন কিছু অলংকার-গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, যেগুলি টীকা হিসেবে নয়, স্বতন্ত্র বই হিসেবেই রচিত।

এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং আলোচিত বইটি হল ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী*। এই বইটি উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালি কাব্যতাত্ত্বিকদের চর্চার পরিধির অন্তর্গত ছিল। ভানুদত্ত মিশ্র *রস-মঞ্জরী* নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন সেটি ছিল “বিবিধ অলংকার গ্রন্থের ছায়ায় বিরচিত নায়ক-নায়িকার লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ অবস্থার বর্ণনাত্মক প্রবেশিকা গ্রন্থ।”[13] কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এই *রস-মঞ্জরী*-র অনুসরণে বাংলা *রসমঞ্জরী* রচনা করেন।

সতীশচন্দ্র রায় ভারতচন্দ্রের সময় পর্যন্ত রচিত রসশাস্ত্র-সংক্রান্ত দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত *রস-মঞ্জরী* এবং বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণদাস প্রণীত *ভক্তমাল* গ্রন্থের অন্তর্গত রস পরিচ্ছেদ। সতীশচন্দ্রের মত অনুসারে, “বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণ দাস প্রণীত ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থের অন্তর্গত রস পরিচ্ছেদ ও ভারতচন্দ্র

[13] সতীশচন্দ্র রায়, “ভূমিকা,” *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ।০।

রায় প্রণীত ''রস-মঞ্জরী' প্রভৃতি ২। ৩ খানা গ্রন্থ ব্যতীত''[14] রসশাস্ত্র-সংক্রান্ত তেমন কোনও গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়নি। তার মধ্যে—

> ভক্ত-মালের বর্ণিত রস-পরিচ্ছেদ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত;— তাহাতে বিস্তৃত লক্ষণ কিম্বা উদাহরণ প্রদত্ত না হওয়ায় তাহা হইতে রস শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না।[15]

উজ্জ্বলনীলমণিঃ রসশাস্ত্র হিসেবে উৎকৃষ্ট হলেও "দুরূহ ও দুষ্প্রাপ্য"[16] বলে সাধারণের বোধগম্য বইয়ের তালিকা থেকে সতীশচন্দ্র তাকে বাদ রেখেছেন। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সরাসরি সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের আওতায় পড়ে না বলে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*-কে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করা হল না।

তবে ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী* এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমে বলে নেওয়া প্রয়োজন এটি কিন্তু মৌলিক গ্রন্থ নয়। বরং একে ভানুদত্তের সংস্কৃত *রস-মঞ্জরী*-র সংক্ষিপ্তসার বলা যায়। ভারতচন্দ্র স্বয়ং জানিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে *রস-মঞ্জরী*-কে সাধারণের বোধগম্য করে তোলার প্রণোদনার কথা: "রসমঞ্জরীর রস/ভাষায় করিতে বশ/আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া।"[17] *রস-মঞ্জরী*-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের ভাষায়—

> ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শও যে, ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' তাহা তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন। ... ভারতচন্দ্রের উপর ভানুদত্তের কাব্যের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল, তাহা

---

[14] সতীশচন্দ্র রায়, "ভূমিকা," *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ৵০।

[15] রায়, "ভূমিকা," ৵০।

[16] রায়, "ভূমিকা," ৵০।

[17] রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ), সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ), ২৫৮।

> একান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। ভারতচন্দ্র বোধ হয় লেখার ভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সংস্কৃত রসমঞ্জরীর প্রগাঢ় রস সহজে বাঙ্গালা কবিতার আয়ত্ত করার যোগ্য নহে; যেন সেজন্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উহার সহিত নিজের রস বা কবিত্ব মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করেন।[18]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট, ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী* মূল *রস-মঞ্জরী*-র তুলনায় কিছুটা তরল এবং অতিসরলীকৃতও বটে। ভানুদত্তের "ব্যঞ্জনা-পূর্ণ রস-বৈচিত্র্য"-এর তুলনায় ভারতচন্দ্রের "রস গাম্ভীর্য্য-হীন লালিত্য"[19]-এর নান্দনিক অভিঘাত কম। সতীশচন্দ্র উভয়ের তুলনা করতে গিয়ে দেখেছেন, ভারতচন্দ্র "সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিচারাত্মক অধিকাংশ স্থলই বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"[20] ভানুদত্ত-নির্দেশিত নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন ও প্রতিটি বিভাজনের সপক্ষে উদাহরণ সংকলনের প্রবণতাও ভারতচন্দ্রে অনুপস্থিত।

ভারতচন্দ্র কোথায় কোথায় প্রচলিত রসশাস্ত্রকে অনুসরণ করেছেন, আর কোথায় বিশেষভাবে ভানুদত্তকেই অনুসরণ করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়।।[21]

রসের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই ভরতের রসসূত্র-পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত বহুলপ্রচলিত নবরসের তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে শৃঙ্গারকে প্রাধান্য দেওয়ার

[18] রায়, "ভূমিকা," ।০।

[19] রায়, "ভূমিকা," ।৵০।

[20] রায়, "ভূমিকা," ।৵০।

[21] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৫৮।

প্রবণতাও চোখে পড়ে।[22] *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুসারে “নায়িকা ত্রিবিধ; স্বা, অন্যা ও সাধারণী স্ত্রী।”[23] ভানুদত্তের *রস-মঞ্জরী* অনুসারে নায়িকার শ্রেণিবিভাগ– স্বীয়া, পরকীয়া ও গণিকা[24]। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী* অনুসারে এই ভাগ হল– স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্য বনিতা[25]। ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী*-তে প্রত্যেক প্রকার নায়িকাকে প্রথাগত অলংকার-শাস্ত্রের মতোই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা[26]। আবার মানকালে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকাদের ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা ভেদও[27] প্রথাগত সংস্কৃত রসতত্ত্বেরই অনুরূপ। নায়িকার অবস্থাভেদের ক্ষেত্রে *সাহিত্যদর্পণঃ* ও অন্যান্য সংস্কৃত অলংকার-গ্রন্থকে অনুসরণ করেই বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, অভিসারিকা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার উল্লেখ করেন[28] *রস-মঞ্জরী*-কার। *সাহিত্যদর্পণঃ*-সহ অন্যান্য বহু অলংকার-গ্রন্থে নায়কের ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরাললিত ও ধীরপ্রশান্ত– এই চারটি ভেদ পাওয়া যায়। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ এই চার প্রকার নায়ককে আবার “দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল, শঠ” [29]– এই চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ধীরোদাত্ত প্রভৃতি

---

[22] আদ্য রস সকল রসের মধ্যে সার। [উৎস: ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৫৮।]

[23] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ৮৭।

[24] সতীশচন্দ্র রায় সম্পা., *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ৩।

[25] স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পাণ্ডববর্ণিতা।। [উৎস: ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৫৮।]

[26] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৫৯।

[27] মানকালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ।। [উৎস: ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৬৩।]

[28] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৭৫-৮০।

[29] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ৭৭।

ভাগ *রস-মঞ্জরী*-তে পাওয়া না গেলেও “অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট, শঠ”[30]— এই চারটি ভাগ পতিভেদরূপে ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন। নায়কসহায়ভেদেও তিনি “পীঠমর্দ্দ, বিট, চেটক ও বিদূষক”[31] এই চাররকম পরিভাষার উল্লেখ করেন যা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুরূপ।

সাহিত্যদর্পণঃ-মতে “বিপ্রলম্ভঽথ সংভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধ মতঃ”[32]। একইরকমভাবে ভারতচন্দ্রও ‘শৃঙ্গাররসনিরূপণ’ অংশে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের উল্লেখ করেছেন। বিপ্রলম্ভের চার পর্যায়ের মধ্যে অন্যতম পূর্বরাগ। পূর্বরাগের দশ দশা[33] এবং মানভঙ্গের উপায়[34] চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের আংশিক মিল[35] পাওয়া যায়। শিঙ্গভূপাল সম্ভোগের চারটি পর্যায় চিহ্নিত করেছিলেন— সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্নতর ও সমৃদ্ধিমান্[36]। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা সম্ভোগের ভেদ চিহ্নিত করার সময়ে শিঙ্গভূপালেরই অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সম্ভোগের এ জাতীয় ভেদের উল্লেখ করেননি। তিনি ‘দর্শন’, ‘স্পর্শন’, ‘কথা’— প্রভৃতি কয়েকটি ভেদের উল্লেখ করে লিখলেন “অনন্ত অনন্ত ভাব বিরচিব কত।”[37] এক্ষেত্রে তিনি *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিলেন বলে অনুমান করে নেওয়া যায়। কারণ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও সম্ভোগের বহু

[30] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৮৩।

[31] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৯০-৯২।

[32] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৪৯।

[33] লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ প্রভৃতি।

[34] সাম, ভেদ, দান, নতি প্রভৃতি।

[35] ভারতচন্দ্র সহেতু মান দূর করার সাতটি পথ বলেছেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন ছয়টি উপায়ের কথা।

[36] অশোকনাথ শাস্ত্রী, “ভূমিকা,” *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), দশ।

[37] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৯৫।

ভেদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে— "চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি বহু ভেদ বশতঃ সংখ্যা নির্ণয়ে অসামর্থ্যহেতু পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে— এই সম্ভোগ শৃঙ্গাররস একটিই।"[38]

ভারতচন্দ্র যে সর্বদাই *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং প্রচলিত অলংকার-গ্রন্থকে অনুসরণ করেছেন, এমন নয়। তবে তাঁর *রসমঞ্জরী*-র প্রায় সবটাই ছিল ভানুদত্তের *রস-মঞ্জরী*-র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস থেকে তাই প্রায়শই পৃথক হয়ে গেছে রস-মঞ্জরীর শ্রেণিবিন্যাস। যেমন 'স্ত্রী-জাতি কথন' অংশে ভারতচন্দ্র 'পদ্মিনী', 'চিত্রিণী', 'শঙ্খিনী' এবং 'হস্তিনী'— এই চারধরনের নারীর কথা বলেছেন[39]। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ এই ধরনের বিভাজন অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে ভানুদত্ত মিশ্র অনুসরণ করেছিলেন জয়দেবের *রতিমঞ্জরী* গ্রন্থকে এবং ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের অনুসরণ করেছিলেন। 'স্ত্রী-জাতি কথন'-এর পাশাপাশি 'পুরুষ-জাতি কথন'-এ পদ্মিনী নারীর নায়ক হিসেবে 'শশ', চিত্রিণী নারীর নায়ক হিসেবে 'মৃগ', শঙ্খিনী নারীর নায়করূপে 'বৃষ' এবং হস্তিনী নারীর নায়ক হিসেবে 'অশ্ব'– এই চার প্রকার পুরুষের কথাও বলা হয়েছে[40]। এখানেও সেই *রতিমঞ্জরী*-রই অনুরণন পাওয়া যায়। আবার, নায়িকার অবস্থাভেদের সমান্তরালে নায়কেরও অবস্থাভেদ (বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিত, অভিসারিক, বিপ্রলব্ধ, স্বাধীনভার্য্য, খণ্ডিত প্রভৃতি) প্রদর্শন ছিল *রস-মঞ্জরী*-র বিশেষত্ব। ভানুদত্তকে অনুসরণ করে নায়িকার অবস্থাভেদ চিহ্নিত করার সময় প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার দুটি উপবিভাগ করেছিলেন ভারতচন্দ্র। 'প্রোষিতভর্তৃকা' এবং 'প্রোষ্যৎপতিকা'। একইভাবে 'প্রোষিতভার্য্য'

---

[38] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৬২।

[39] অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী।। [উৎস: ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ৩০১।]

[40] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ৩০৩।

এবং 'প্রোষ্যৎপত্নীক'— নায়কেরও এই দুটি উপবিভাগের উল্লেখ করা হয়েছিল[41]। নায়িকা-প্রকরণের ঠিক সমতুল্য নায়ক-প্রকরণ নির্মাণ, অর্থাৎ প্রতি প্রকার নায়িকার বিপরীতে নায়কের একেকটি প্রকারভেদ ধার্য করা ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী*-র অন্যতম স্বাতন্ত্র্য। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারেই স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্য বনিতা— এই তিন ধরনের নায়িকার যথাক্রমে তিনধরনের নায়ক নির্দেশ করেছিলেন ভারতচন্দ্র— পতি, উপপতি এবং বৈশিক[42]। এই ভেদটিও, বিশেষত বৈশিক নায়কের উল্লেখ প্রথাগত সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে খুব সুলভ নয়। সুতরাং এটিকেও ভারতচন্দ্রের মৌলিকত্বের সূচক হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

নায়িকাভেদ অংশে *রস-মঞ্জরী*-তে 'নবোঢ়া'[43] বলে একটি অতিরিক্ত ভেদ পাওয়া যায়, যা আবার স্বকীয়া, পরকীয়া, সামান্য ও বিশ্রব্ধভেদে চার প্রকার। পরকীয়া নায়িকার 'ঊঢ়া' এবং 'অনূঢ়া' ভেদটি *রস-মঞ্জরী*-র স্বাতন্ত্র্য[44]। পরকীয়া নায়িকার অন্য ভেদও (বিদগ্ধা, লক্ষিতা, গুপ্তা, কুলটা, মুদিতা) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য[45]। ভানুদত্ত কর্তৃক বিবৃত মুগ্ধা নায়িকার 'অজ্ঞাতযৌবনা' এবং 'বিজ্ঞাতযৌবনা'[46] ভাগদুটিও ভারতচন্দ্র তাঁর *রসমঞ্জরী*-তে রেখেছিলেন, যা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ পাওয়া যায় না। ভানুদত্তের *রস-মঞ্জরী*-তে স্বীয়া প্রভৃতি তিন প্রকার নায়িকার ত্রিবিধ শ্রেণিভেদ পাওয়া যায়— 'অন্য-সম্ভোগ

---

[41] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৯০।

[42] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৮৩।

[43] রমণে লাজে ভয়ে স্তব্ধ হয় যে নারী।

[44] ভানুদত্ত পরকীয়া নায়িকার দুটি ভাগ করেছিলেন— পরস্ত্রী এবং কন্যা [উৎস: সতীশচন্দ্র রায়, "ভূমিকা," *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ২৶০।]

[45] ভানুদত্ত পরস্ত্রী নায়িকার যে শ্রেণিভেদ করেন, সেখানে গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা, কুলটা, অনুশয়ানা, মুদিতা – এই পরিভাষাগুলির উল্লেখ ছিল। (২৶০)

[46] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, ২৬১-৬২।

দুঃখিতা', 'বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা' এবং 'মানিনী'[47]। একেই অনুসরণ করে ভারতচন্দ্র সামান্য বনিতার তিনটি ভেদ দেখিয়েছিলেন— 'অন্য ভোগ দুঃখিতা', 'বক্রোক্তিগর্ব্বিতা' এবং 'মানবতী'[48]। ভারতচন্দ্রের অলংকার-ভাবনার আরেকটি বিশেষত্ব ছিল তাঁর যৌবনের শ্রেণিবিভাগে। যৌবনকে 'বয়ঃসন্ধি', 'নবীন যৌবন', 'সুব্যক্ত যৌবন' এবং 'সম্পূর্ণ যৌবন'[49]— এই চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন তিনি।

বিপ্রলম্ভের শ্রেণিভেদ করার সময়ে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত রসভাবনার চেয়ে বৈষ্ণব অলংকার-শাস্ত্র দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ বিপ্রলম্ভের চারটি ভেদ নির্দেশ করা হয়েছে— পূর্বরাগাত্মক, মানাত্মক, প্রবাসাত্মক এবং করুণাত্মক[50]। কিন্তু ভারতচন্দ্র বিপ্রলম্ভের ভেদ হিসেবে পূর্বরাগ, মান এবং প্রবাসের সঙ্গে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের অনুসরণে প্রেমবৈচিত্ত্যের উল্লেখ[51] করলেন। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের অলংকার-বিষয়ক আলোচনার অন্তত দুই শতক আগে থেকে বৈষ্ণব রসপ্রস্থান বাংলার রসতাত্ত্বিক ভাবনার এক বড়ো অংশ জুড়ে ছিল। ভারতচন্দ্র নিজে যুগের দাবিতে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে শাক্তদেবীর মহিমাকীর্তন করেছেন বটে, কিন্তু তার আগে থেকেই বাংলার সংস্কৃতি-পরিসরে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা বৈষ্ণব দর্শন ও রসচিন্তনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র-প্রণীত

---

[47] সতীশচন্দ্র রায় সম্পা., *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ২।০।

[48] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী,* ২৭৫।

[49] ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী,* ২৯৯।

[50] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ,* ১৪৯।

[51] এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে করুণের বদলে প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

রসমঞ্জরী-র তাত্ত্বিক প্রবণতা বৈষ্ণব কাব্যতত্ত্ব এবং প্রথাগত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব— উভয়ের সঙ্গেই সংলগ্ন হয়ে রইল।

তবে অষ্টাদশ শতকে রচিত এই গ্রন্থের জন্য ভারতচন্দ্রকে সমালোচকদের আক্রমণেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। উনিশ শতকে *রসমঞ্জরী*-কে চিহ্নিত করা হয়েছে 'অশ্লীল' গ্রন্থ হিসেবে। রজনীকান্ত রায় লিখেছেন—

> এ গ্রন্থ অবশ্য খুব অশ্লীল। ভারতচন্দ্র ইহা অনুবাদিত না করিয়া যদি সংস্কৃত অন্য কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে অতি উত্তম হইত। ইহা তৎকালের রুচির অবশ্যম্ভাবী ফল।[52]

উনিশ শতকে সমালোচিত হলেও ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী* উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার এক উল্লেখযোগ্য দলিল।

- ***রসমঞ্জরী* ব্যতীত সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রবিষয়ক অন্যান্য তত্ত্বগ্রন্থ**

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার "সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি বিষয়ে 'সাহিত্যবিচার' নামে বাদার্থ গ্রন্থ রচনা করেন।"[53] এই একই প্রবন্ধ থেকে 'ন্যায়বাগীশ' উপাধিযুক্ত এক পণ্ডিতের লেখা *কাব্যচন্দ্রিকা* নামে একটি অলংকার-গ্রন্থের কথাও জানা যায়[54]। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত নানা অলংকারের

---

[52] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।

[53] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: দ্বাদশ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১৭১।

[54] ন্যায়বাগীশ – "কাব্যচন্দ্রিকা" নামে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার পিতার উপাধি বিদ্যানিধি। পিতা পুত্র উভয়ের কি কি নাম ছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিদ্যানিধিতনুজেন ন্যায়বাগীশধীমতা।
গুণালঙ্কারদোষাখ্যা ক্রিয়তে কাব্যচন্দ্রিকা।।

[উৎস: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: একাদশ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৩২০।]

বিশদ প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল সুন্দর দেব বৈদ্য রচিত একবিংশতি সর্গের মহাকাব্য *রামসুন্দর*-এ। সেটি আলাদাভাবে কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত বই না হলেও অলংকারের প্রয়োগ দেখানোর জন্যই বিশেষভাবে স্মরণীয়। বইটি সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন—

> একবিংশতি সর্গে "রামসুন্দর" মহাকাব্য রচনা করেন। ... রাধা কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন ছলে সুকবি গ্রন্থকার সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত অলঙ্কারগুলির প্রয়োগ বিশদরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যেমন ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী পদ প্রয়োগ সম্বন্ধে ভট্টিকাব্য, সেইরূপ অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রদর্শন এই কাব্য সবিশেষ উপযোগী। ১৭৬২ সংবতের লিখিত একখানি পুস্তক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে।[55]

উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে আরেকটি অলংকার-গ্রন্থের হদিশ পাওয়া যায়। সেটি হল জয়দেব-প্রণীত *চন্দ্রালোক*। এই জয়দেব অবশ্য *গীতগোবিন্দ*-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব নন[56]। *চন্দ্রালোক*-এ দশটি ময়ূখ বা অধ্যায় ছিল। এই জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব। মায়ের নাম সুমিত্রা[57]। 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধে *চন্দ্রালোক*-এর রচয়িতার পরিচয় নিয়ে বিতর্কের আভাস পাওয়া যায়।

এছাড়া বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের রচনাগুলি, যেমন রূপগোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, উজ্জ্বলনীলমণিঃ,* কবিকর্ণপূর পরমানন্দ দাস সেনের *অলঙ্কারকৌস্তুভঃ*— এগুলিও মৌলিক তত্ত্বগ্রন্থ, কিন্তু সরাসরি সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বসংশ্লিষ্ট না হওয়ায় এই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই অধ্যায়ে নেই।

---

[55] ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: দ্বাদশ প্রস্তাব," ৩২৯।

[56] রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুই জয়দেবকে এক বলে মনে করেছিলেন।

[57] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৪৬৩।

১.৪ উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় রচিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক টীকা-গ্রন্থ

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকেন্দ্রিক মৌলিক গ্রন্থের পাশাপাশি বেশ কিছু টীকাগ্রন্থও এইসময়ে রচনা করেছিলেন বাঙালি পণ্ডিতরা। বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলায় সবচেয়ে বেশি টীকা রচিত হয়েছে যে গ্রন্থটির সেটি হল মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*।

- ✓ মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর টীকা ও বাঙালি টীকাকার

উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় অলংকারশাস্ত্রের সর্বাধিক চর্চিত গ্রন্থটি সম্ভবত মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*। সুশীল কুমার দে বাংলায় মম্মটের দুজন টীকাকারের কথা বলেছেন যাঁরা *কাব্যপ্রকাশ*-এর কারিকাকে ভরতের রচনা এবং বৃত্তি অংশকে মম্মটের রচনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই দুজন টীকাকার হলেন, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার[58]—

> A tradition chiefly obtaining in Bengal, as we find it in Baladeva Vidyabhusana and Mahesvara Nyayalamkara, two very late Bengal commentators on the Kavya-prakasa, imputes the authorship of the Karikas (here called sutras) to Bharata and the prose-Vritti to Mammata, while Bharata himself is said to have drawn upon the Agni-purana.[59]

বলদেব বিদ্যাভূষণ— *সাহিত্য-কৌমুদী*

বলদেব বিদ্যাভূষণ ভরতের সূত্রের বৃত্তি হিসেবে *সাহিত্য-কৌমুদী* নামে যে গ্রন্থটির কথা বলেন সেটি বিষয়বস্তু এবং সজ্জার দিক দিয়ে *কাব্যপ্রকাশ*-এরই অনুরূপ। তবে, অতিরিক্ত

---

[58] কাব্যপ্রকাশাদর্শ/ভাবার্থচিন্তামণি

[59] S.K De, *History of Sanskrit Poetics* (Kolkata: Firma KLM, 1960), 152.

একাদশ অধ্যায় এবং কিছু শব্দালংকার ও অর্থালংকার এখানে যুক্ত ছিল, যা মূল *কাব্যপ্রকাশ*-এ অনুপস্থিত। তিনি স্বয়ং *সাহিত্য-কৌমুদী*-র একটি টিপ্পনী রচনা করেন[60]।

মহেশ্বর ন্যায়ালংকার— *কাব্যপ্রকাশ-আদর্শ*

দায়ভাগ গ্রন্থের রচয়িতা মহেশ্বর ন্যায়ালংকারের টীকার নাম *কাব্যপ্রকাশ-আদর্শ* বা *ভাবার্থ চিন্তামণি*। টীকার অন্তর্গত সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা হয় তাঁর আবির্ভাব সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে। কলকাতা থেকে ১৮৭৬ সালে তাঁর টীকাটি প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়[61]।

জগদীশ তর্কপঞ্চানন এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি— *কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ*

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' নামক প্রবন্ধ থেকে উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাংলায় *কাব্যপ্রকাশ*-এর যে টীকাগুলি রচিত হয়েছিল, তাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল *কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ*। রচয়িতা জগদীশ তর্কপঞ্চানন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে তর্কপঞ্চাননের এক শিষ্যের দ্বারা এটি অনুলিপিকৃত বলে মনে করা হয়[62]। ওই একই নামে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর আরেকটি টীকা রচনা করেন রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি।

কাব্যপ্রকাশ-এর অন্য যে টীকাগুলি সেই সময়ে বঙ্গদেশে রচিত হচ্ছিল, সেই টীকাগুলির রচয়িতাদের পরিচয় দেওয়া হল।

---

[60] কৃষ্ণানন্দিনী টীকা

[61] সম্পাদনা— জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

[62] এই পুস্তক ১৫৭৯ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে রবিবারে তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ন্যায়ালঙ্কার অধ্যাপনার্থে লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্ত করেন। [উৎস: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৫৭৬-৭৭।]

পরমানন্দ চক্রবর্তী— *কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা*

সুশীল কুমার দে-র মতে পরমানন্দ চক্রবর্তীর আবির্ভাব চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও সময়ে। বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং বিদ্যানাথের পরবর্তী সময়ে তাঁর আবির্ভাব। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রভাকর ভট্ট রচিত *রসপ্রদীপে* তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া কমলাকর, নরসিংহ ঠক্কুর, বৈদ্যনাথ, নাগোজি ভট্ট, আনন্দ ও রত্নকণ্ঠের রচনায় তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে[63]।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন— *কাব্যপ্রকাশতিলক/জয়রামী*

জয়রাম কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রামচন্দ্র মতান্তরে রামভদ্র ভট্টাচার্য সার্বভৌমের শিষ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র জনার্দন ব্যাস। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন রঘুনাথ শিরোমণির *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি*-র টীকা রচনা করেছিলেন। রঘুনাথের বইটি রচিত হয়েছিল ষোড়শ শতকের সূচনায়। সুতরাং ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধই জয়রামের সময়কাল বলে অনুমান করা যায়।

চণ্ডীদাস— *কাব্যপ্রকাশদীপিকা*

পদাবলির চণ্ডীদাস ও এই চণ্ডীদাস পৃথক ব্যক্তি। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর টীকার নাম *কাব্যপ্রকাশদীপিকা*। বন্ধু লক্ষ্মণ ভট্টের অনুরোধে তিনি এই টীকাটি রচনা করেছিলেন। ওড়িয়া, মৈথিলি ও কাশীর পণ্ডিতরাই তাঁর লেখার উল্লেখ বেশি করেছেন। তবে India Office-এ রক্ষিত তাঁর পাণ্ডুলিপিটি বাংলা হরফে লেখা। তাঁর টীকায় ভট্টনায়কের *হৃদয়দর্পণ*-এর উল্লেখ আছে।

---

[63] S.K De, *History of Sanskrit Poetics* (Kolkata: Firma KLM, 1960), 162.

অন্যান্য টীকা—

- *সারবোধিনী* (শ্রীবৎসশর্ম্মা)
- *কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ* (রামকৃষ্ণ)
- *কাব্যপ্রকাশটীকা* (গদাধর চক্রবর্তী)
- *কাব্যপ্রকাশপ্রভা* (বৈদ্যনাথ)
- *কাব্যপ্রদীপ* (নাগেশ ভট্ট)
- *কাব্যপ্রকাশনিদর্শন*
- *কাব্যামৃত-তরঙ্গিণী*

কাব্যপ্রকাশ-এর চর্চা এভাবেই উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নায়ক হয়ে উঠেছিল।

✓ উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে অন্যান্য তত্ত্বগ্রন্থের বাঙালি টীকাকার

কাব্যপ্রকাশ-এর টীকা ছাড়াও উনিশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে আরও কিছু টীকাগ্রন্থ রচিত হয়। যেমন, আদিনাথ নামে এক পণ্ডিত বাগভট্ট আচার্যের অলংকার-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন[64]। কবিরাজচন্দ্র কালিদাস-রচিত *শৃঙ্গারতিলক*-এর টীকা রচনা করেন[65]। *চন্দ্রালোক-প্রকাশ* নামে পূর্বোল্লিখিত *চন্দ্রালোক* গ্রন্থের একটি টীকাও যে বাংলায় রচিত হয়েছিল, এই তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি থেকে পাওয়া যায়—

> প্যারীমোহন প্রভুর নিকট যে চন্দ্রালোকের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। কথিত আছে, এই সংক্ষিপ্ত টীকা গ্রন্থকারের নিজের রচিত। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য নামক জনৈক পণ্ডিত বন্দ্যেলা (বুন্দেলা) বংশীয় রাজা বীরসিংহের পৌত্র ও রাজা রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রের আদেশানুসারে চন্দ্রালোক-প্রকাশ নামক ইহার একখানি টীকা

[64] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: দ্বাদশ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১৭৫।

[65] ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: দ্বাদশ প্রস্তাব," ১৭৭।

> প্রণয়ন করেন। এই প্রদ্যোতন বলভদ্র ভট্টাচার্যের তনয় বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[66]

এছাড়া বৈষ্ণব-তত্ত্বগ্রন্থেরও বেশ কিছু টীকা এই সময়ে রচিত হয়েছিল। যেমন, *অলঙ্কারকৌস্তুভঃ*-এর টীকা লেখেন লোকনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ* এবং *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*-র টীকা রচনা করেছিলেন। এই টীকাগ্রন্থগুলির নাম ছিল যথাক্রমে *ভক্তিরসামৃতবিন্দুকিরণ* এবং *উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ*। পরবর্তীকালে আবার *উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ* অনুসরণে লেখা হয় এরই সংক্ষিপ্ততর সংস্করণ *উজ্জ্বলনীলমণিকিরণলেশ* [67]।

১.৫ বৈষ্ণব রসতত্ত্বে সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রভাব

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য তাঁর লৌকিক ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে যে ধর্মের স্বরূপ তুলে ধরেন তারই অনুপ্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা নির্মাণ করেন বৈষ্ণব দর্শন এবং রসতত্ত্ব। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শ্রীরূপ-বিরচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, উজ্জ্বলনীলমণিঃ,* কবিকর্ণপূর রচিত *নাটক-চন্দ্রিকা, অলংকার-কৌস্তুভ* প্রভৃতি গ্রন্থের পাতায়। মনে রাখা প্রয়োজন এই রসতত্ত্ব একান্তভাবেই রূপ, জীব, স্বরূপ, সনাতন প্রমুখ গোস্বামীর নির্মাণ। মহাপ্রভুর মতানুযায়ী ভাগবতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত এই রসতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি। এর উৎসভূমি বৃন্দাবন হলেও যাঁরা এই দর্শনের নির্মাতা তাঁরা অধিকাংশই বাঙালি।

---

[66] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, “বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা,” *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৪৬৩।

[67] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, “বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা,” *নব্যভারত* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৩২৩।

তাই বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে বাঙালি কর্তৃক স্বকীয় রসতত্ত্ব নির্মাণের প্রথম চেষ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না।

এখন, বৈষ্ণব গোস্বামীদের নির্মিত রসতত্ত্বে মৌলিকতার উদ্ভাসন থাকলেও রসতত্ত্ব-নির্মাণের মূল ভিত্তি হিসেবে তাঁরা কিন্তু সংস্কৃত রসতত্ত্বের কাঠামোকেই অনুসরণ করেছিলেন। উনিশ শতক পূর্ববর্তী বাঙালি মননে সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রভাব কতখানি দৃঢ়মূল ছিল তা বুঝে নিতে গেলে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে সংস্কৃত রসতত্ত্বের ছায়া কতখানি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

১.৫.১ রসের অলৌকিকত্ব এবং একক রসকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুসারে একমাত্র রস ভক্তিরস, যার স্থায়িভাব কৃষ্ণবিষয়ক রতি। এই কৃষ্ণবিষয়ক রতিকে অলৌকিক বা অপ্রাকৃত বলে চিহ্নিত করেছিলেন বৈষ্ণব রসতত্ত্ব-নির্মাতারা। তাঁদের মতে, অন্য সব স্থায়িভাবের চেয়ে কৃষ্ণরতি পৃথক। তা অচিন্ত্যপূর্ব এবং প্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দের থেকে তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিরসের এই স্বাতন্ত্র্য এবং একটিমাত্র রসকে প্রাধান্য দেওয়ার[68] প্রবণতাই নিঃসন্দেহে প্রথাগত সংস্কৃত রসতত্ত্ব থেকে বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছিল।

কিন্তু রসের এই অলৌকিকত্ব এবং একটি রসকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার প্রবণতা প্রথাগত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পরিসরেই খুঁজে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের রসবাদী মতানুসারে রসাস্বাদের আনন্দ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের আনন্দাংশের আবরণ উন্মোচনজনিত অ-লৌকিক অনুভূতি। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব

[68] যদিও ভক্তিরসকে পাঁচটি মুখ্য ও সাতটি গৌণ স্থায়িরসে বিভক্ত করেছিলেন বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা।

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভক্তিরসকে সাধারণ কাব্যসাহিত্যের পাঠপ্রক্রিয়ানিষ্পন্ন রস থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু রসের অলৌকিকত্বের ধারণানির্মাণে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের অভিক্ষেপ অগ্রাহ্য করা যায় না। আচার্য জগন্নাথ *রসগঙ্গাধর*-এর প্রথম আননে বলেছেন—

> বিভাবাদিসমূহ মিলিত হইয়া একটি অলৌকিক মানস ব্যাপার সৃজন করে যাহার ফলে তৎকালের জন্য সামাজিকের স্বরূপানন্দের অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারিত হয় এবং তাহার পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধ বিলুপ্ত হয়। (*রসগঙ্গাধর,* প্রথম আনন, ৫৩)[69]

সাহিত্যদর্পণঃ-এও রসকে “অলৌকিক বিস্ময়রূপ”[70] বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে—

> চিত্তগত ভাবসমূহ সর্বদাই লৌকিক, স্থূল বিষয় হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া। কিন্তু ইহারা যখন রসে পরিণত হয় তখন তাহাদের লৌকিকত্ব তিরোহিত হইয়া যায়, লৌকিক জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধেরও অবসান ঘটে...। রসসম্ভূত-আনন্দ লৌকিক আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট।[71]

এমনকি, ভক্তির রসত্ব সম্পর্কে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে নানা পরস্পরবিরোধী মত থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য আচার্য আনন্দবর্ধনের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন “আলংকারিকগণ ভক্তির অলৌকিক আনন্দরূপতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, ইহা মনে করা অযৌক্তিক।”[72]

বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কৃষ্ণরতিজাত ভক্তিরস। তবে মূলত নবরসকেন্দ্রিক সংস্কৃত রসতত্ত্বেও একটিমাত্র রসকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত

---

[69] চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, *ভক্তিরসের বিবর্তন* (কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭২), ৭।

[70] বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ৫৪।

[71] চট্টোপাধ্যায়, *ভক্তিরসের বিবর্তন*, ৮।

[72] চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, “ভূমিকা,” *ভক্তিরসের বিবর্তন* (কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭২), ট।

বিরল নয়। ভবভূতি *উত্তররামচরিত*-এ বলেছেন— “একইমাত্র রস, উহা— করুণ। অন্য রসগুলি তাহার রূপভেদ (বিবর্ত্ত) মাত্র।”[73] আলংকারিক নারায়ণদেব এক “অখণ্ড পারমার্থিক রস” হিসেবে ‘অদ্ভুত’ রসকে চিহ্নায়িত করেছেন[74]। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ রসের প্রথাগত নটি (বাৎসল্যসমেত দশটি) ভেদ স্বীকার করলেও তিনি তৃতীয় পরিচ্ছেদ ‘রসাদি-নিরূপণ’-এর সূচনাতেই বলেছেন—

> সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়... ব্রহ্মাস্বাদতুল্য (আনন্দময়) এবং অলৌকিক বিস্ময়রূপ[75]। ... সর্বপ্রকার রসে ‘বিস্ময় বা চমৎকার’ সার বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং রসে ‘চমৎকার’ সারাংশ হওয়ায় একটি রসই- অদ্ভুত রস; সে কারণে পণ্ডিত নারায়ণ অদ্ভুত রসকেই রস বলিয়াছেন।[76]

রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী-র লেখক ভানুদত্তও একরসবাদী মতের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন— “অদ্ভুত এবৈকো রস ইতি নারায়ণপ্রভৃতয়ঃ। শৃঙ্গার এব রস ইত্যপি কেচিদালঙ্কারিকাঃ।”[77] অর্থাৎ, নারায়ণের মতে অদ্ভুতই একমাত্র রস; অপর কোনও কোনও আলংকারিকের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র রস[78]।

---

[73] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ২১৬।

[74] নারায়ণ-সম্মত অদ্ভুত সর্ব্বরসের সারভূত চমৎকারস্বরূপ। [উৎস: শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ২১৬।]

[75] “লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ” অর্থাৎ “অলৌকিক চমৎকারই রসের প্রাণস্বরূপ।” [উৎস: শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৭৪।]

“চমৎকার (অর্থাৎ বিস্ময়) রসের সার – সকল রসেই ইহা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব চমৎকার (বা বিস্ময়) যাহার সার (অর্থাৎ স্থিরাংশ), সেই অদ্ভুত রসই সর্ব্বত্র বিদ্যমান।” [উৎস: শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৭৪।]

[76] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩), ৫৪-৫৬। [নজরটান আরোপিত]

[77] নৌকা-টীকা, পৃষ্ঠা ৬৫।

[78] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ২১৮-১৯।

যেসব সংস্কৃত আলংকারিক শৃঙ্গাররসকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ভোজ। ভোজের মতে, "রসঃ শৃঙ্গার এবৈকঃ। রস একটিই মাত্র– উহা শৃঙ্গার"[79]। তাঁর *শৃঙ্গারপ্রকাশ*-এর প্রথম প্রকাশের নবম শ্লোকে বলা হয়েছে–

> যেরূপ রশ্মিসমূহ সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত হইয়া উহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে সেইরূপ চিত্তের ভাবস্বরূপ রতি প্রভৃতি ঊন-পঞ্চাশ সংখ্যক ভাব শৃঙ্গার তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়া উহাকে বর্ধিত করে।[80]

ভোজদেবের মতে শৃঙ্গারই কাব্যের কমনীয়তার হেতু। অর্থাৎ ভোজ আটটি বা নটি ভাবের রসত্ব স্বীকারের পরিবর্তে শৃঙ্গারকেই একমাত্র রস হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁর মতে–

> রস পরমার্থতঃ একটি। অভিমান বা অহঙ্কার বা শৃঙ্গার। ... আস্বাদন যোগ্যতা হেতু কেবল শৃঙ্গারকে রস বলা উচিত।... অহঙ্কারজন্য শৃঙ্গারই একমাত্র রস; রতি প্রভৃতি ভাবমাত্র। বিভাব ও অনুভাবের সহযোগিতায় পরিপোষিত রতি প্রভৃতি ভাবের দ্বারা প্রকাশ লাভ করিয়া শৃঙ্গার আস্বাদনার্হ হইয়া ওঠে।...একটি শৃঙ্গার রস হইতে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়।[81]

আবার, অভিনবগুপ্তের মতো পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক নবরসের মধ্যে শান্তরসকে এক অন্যতর মর্যাদার স্থান দিয়েছিলেন। অভিনবগুপ্তের মতে শান্তরসের স্থায়িভাব তত্ত্বজ্ঞান[82]। পরম সত্যের অনুভব আত্মজ্ঞান ছাড়া হয় না। তাই আত্মাই[83] শান্তরসের স্থায়িভাব।

---

[79] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ৮৯।

[80] চট্টোপাধ্যায়, *ভক্তিরসের বিবর্তন*, ৫২-৫৪।

[81] চট্টোপাধ্যায়, *ভক্তিরসের বিবর্তন*, ৫২-৫৪।

[82] শান্তরসের স্থায়িভাব কী তা নিয়েও সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কেউ নির্বেদকে শান্তরসের স্থায়িভাব বলেছেন। কেউ বলেছেন ধৃতিকে।

[83] ভরত একে আত্মা না বলে শম্ বলেছেন।

ভারতীয় দর্শন অনুসারে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতীয় রসশাস্ত্রের স্থায়িভাবগুলির মধ্যে বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত— এরা ধর্মলাভের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তি। রৌদ্র ও করুণ অর্থলাভের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তি। শৃঙ্গার এবং হাস্য কামলাভের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তি। কিন্তু মোক্ষলাভের উপযুক্ত স্থায়িভাব কোনটি? অভিনবগুপ্তের মতে শান্তই হল মোক্ষলাভের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তি। যেহেতু মোক্ষই ভারতীয় আদর্শ অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ তাই, মোক্ষের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তি হিসেবে অভিনবগুপ্ত শম্ (তত্ত্বজ্ঞান)-কে রসশাস্ত্রের আঙিনায় বিশেষ গুরুত্বের আসনে বসিয়েছিলেন।

এইভাবেই সংস্কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসে কেউ শৃঙ্গার, কেউ করুণ, কেউ অদ্ভুত আবার কেউ বা শান্তকে প্রধান রস হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া চেষ্টা করেছিলেন। যদিও বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের কৃষ্ণরতি এবং ভক্তিরস এই 'লৌকিক'রসগুলি থেকে পৃথক, তবু একটি বিশেষ রসকে প্রধানতম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার অন্তরালে ভোজ, ভবভূতি, নারায়ণ বা অভিনবগুপ্তের একক রস-পরিকল্পনার প্রভাব থেকে যেতে পারে।

১.৫.২ স্থায়িভাব

বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা স্থায়িভাবের সংজ্ঞায় বলেছিলেন—

> অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
> সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।।[84]

---

[84] *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ২। ৫। ১ [উৎস: রূপ গোস্বামী, "২। দক্ষিণ-বিভাগঃ– স্থায়িভাবাখ্যা পঞ্চম লহরী, শ্লোক– ১," *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*, সম্পা. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ৩৫৮।]

অর্থাৎ, “হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে” তাকে স্থায়িভাব বলে।[85] ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখতে পাই বৈষ্ণব গোস্বামীদের এই সংজ্ঞা অনেকাংশেই বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* দ্বারা প্রভাবিত। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ স্থায়িভাবের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছিলেন—

> অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
> আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সংমতঃ।। (৩.১৭৮)[86]

অর্থাৎ, অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাকে তিরোহিত করতে পারে না, যা রসাস্বাদের অঙ্কুরের কন্দ বা মূলস্বরূপ, তাকেই স্থায়িভাব বলে। স্থায়িভাবের ‘উত্তম রাজার মতো বিরাজ’ করার ধারণাটি ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে প্রাপ্ত বলে মনে হয়। কারণ, *নাট্যশাস্ত্র*-এ স্থায়িভাবের প্রকৃতি বোঝাতে ভরত বলেছিলেন—

> যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
> এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ।।[87]

অর্থাৎ, প্রজাদের মধ্যে রাজা বা শিষ্যদের মধ্যে গুরু যেমন প্রধান, তেমনি ভাবগুলির মধ্যে স্থায়িভাবও বিশেষ প্রাধান্যের অধিকারী। যে-কোনও মানুষের মধ্যে জন্মলাভমাত্রই এই

---

[85] রাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: সপ্তম পর্ব্ব – রসতত্ত্ব* (কলিকাতা: প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ২৯১৮। [এই শ্লোকের টীকায় জীবগোস্বামী অবিরুদ্ধভাব বলতে অনুকূল বা মিত্রভাব এবং উদাসীন ভাবগুলি (হাস্য, উৎসাহ, গর্ব, হর্ষ, লজ্জা ইত্যাদি) বুঝিয়েছিলেন। বিরুদ্ধ ভাব বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন ক্রোধ, শোক, ভয়, বিষাদ, দৈন্য, মোহ প্রভৃতি প্রতিকূল ভাব।]

[86] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৪৫।

[87] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ভরত নাট্যশাস্ত্র—প্রথম খণ্ড*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১৫৬।

ভাবগুলি থাকবেই। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*-র স্থায়িভাবের সংজ্ঞা তাই ভরতের শ্লোক থেকেই অনুপ্রাণিত বলে মনে হয়।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বনির্মাণের যে অংশটি সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী, তা হল সাতটি গৌণ স্থায়িভাব সংক্রান্ত ধারণা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

> শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম
> কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।।
> ... ...
> হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়।
> পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়।
> পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে।
> সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে।।[88]

সুতরাং, বৈষ্ণবমতে, গৌণ স্থায়িভাব এবং গৌণ-রস সাত প্রকার। হাস (হাস্যরস), বিস্ময় (অদ্ভুতরস), উৎসাহ (বীররস), শোক (করুণ), ক্রোধ (রৌদ্র), জুগুপ্সা (বীভৎস), ভয় (ভয়ানক)। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ* অনুসারে—

> হাস্যোহদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
> ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।
> এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে।।[89]

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ-কথিত এই গৌণরসগুলির ধারণা ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে ভরত-কথিত অষ্টরসের ধারণা থেকেই গৃহীত হয়েছে।

---

[88] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, "মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ," *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সম্পা. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭), ৩৫১-৫৩।

[89] *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, ২। ৫। ১১৬-১৭। [উৎস: রূপ গোস্বামী, "২। দক্ষিণ-বিভাগঃ– স্থায়িভাবাখ্যা পঞ্চম লহরী, শ্লোক– ১১৬-১১৭," *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*, সম্পা. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ৪০৬।]

১.৫.৩ রসনিষ্পত্তি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-তে চৈতন্যদেবের বাচনে রসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হল তা এইরকম—

> প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে
> কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে।।
> বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
> স্থায়িভাব রস হয় মিলি এই চারি।।
> দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে।
> 'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্বাস্বাদনে।।

অর্থাৎ, "যেমন দধি প্রভৃতি দ্রব্য শর্করা ও মরিচাদির সহিত যথাযথ ভাগবিশেষে সংযোজিত হইলে রসালা নামক রসে পরিণত হয়, তেমনি সর্বথা কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অনুভব হইতে উদ্ভূত এক অপূর্ব প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারময় রস ভক্তগণ কর্তৃক আস্বাদনীয় হয়।"[90]

এই তত্ত্বে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হল, যিনি রস আস্বাদন করবেন তিনি কৃষ্ণভক্ত। তাঁর চিত্তে পূর্বে স্মৃত বা অবগত বা শ্রুত কৃষ্ণ সম্পর্কে যে পূর্বসংস্কার আছে তাকেই বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা একমাত্র মুখ্য স্থায়িভাবের মর্যাদা দিলেন। এর নাম দেওয়া হল কৃষ্ণরতি। বলা বাহুল্য, সাধারণ রতির থেকে কৃষ্ণরতি পৃথক। বৈষ্ণব আচার্যরা জানালেন, একমাত্র ভক্তহৃদয়ে ইতিপূর্বে উপ্ত কৃষ্ণরতিই রসপরিণতি লাভ করতে পারে। ভক্তের চিত্তে কৃষ্ণরতি আছে বলেই তা কৃষ্ণস্মৃতিকে উদ্দীপিত করতে পারে। কৃষ্ণস্মৃতিই ভক্তচিত্তে কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি চরিত্রকে বিভাবতা প্রাপ্ত করায়। অর্থাৎ, সমুদ্র যেমন নিজের জলের দ্বারা মেঘকে পূর্ণ করে ও পরে সেই মেঘকর্তৃক বর্ষিত জলের দ্বারা নিজে পূর্ণ হয়, তেমনি

---

[90] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, "মধ্যলীলা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ," *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, সম্পা. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭), ৪২০।

কৃষ্ণরতি কৃষ্ণাদিকেই বিভাবতা প্রাপ্ত করিয়ে “সেই পরিপুষ্ট বিভাবাদি দ্বারাই... বৈচিত্র্যময়ী হইয়া রসরূপতা ধারণ করে”[91]।

ভক্তি নিজেই স্বাদবিশিষ্ট— সে নিজেই আনন্দ দান করতে পারে। বিভিন্ন প্রাকৃতবস্তুতে জীব যে আনন্দ পায়, তাদের সমষ্টিভূত আনন্দের চেয়েও আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে কোটি কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ। এই কারণে ভক্তচিত্তের রতি কাব্যনাটকের চরিত্রকে অর্থাৎ রাধা বা কৃষ্ণকে বিভাবতা দানে সক্ষম। এই বিভাবিত কৃষ্ণই আবার রতিকে বর্ধিত বা উচ্ছ্বসিত করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এই সংবর্ধিত পরিণামপ্রাপ্ত কৃষ্ণরতিই হল ভক্তিরস।

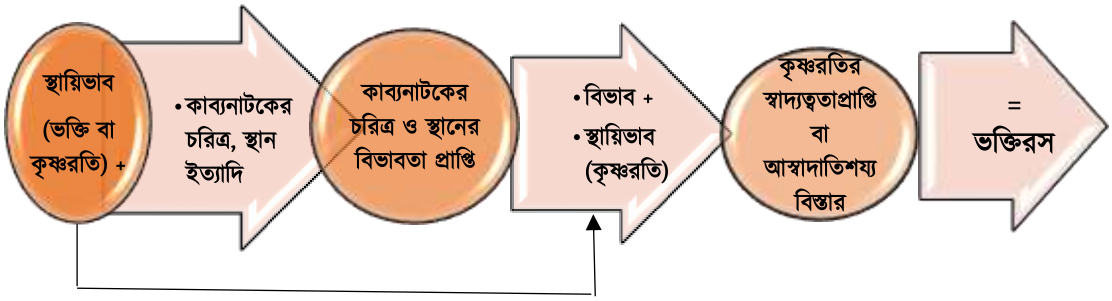

আপাতদৃষ্টিতে রসনিষ্পত্তির এই তত্ত্ব, যা ‘পরিণতিবাদ’ নামে পরিচিত, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের রসনিষ্পত্তি-সংক্রান্ত ধারণার থেকে অনেকখানিই পৃথক। বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা এমন এক তত্ত্বের নির্মাণ করেছিলেন যা বৈষ্ণবভক্তকুলের মধ্যে তৈরি করবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সংশ্লিষ্ট পরমপুরুষকেন্দ্রিক এক ডিসকোর্স। যেখানে সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যরস-উপলব্ধির চেয়েও গুরুত্ব পাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তির গহিনতম তলে অবগাহনের

[91] রাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: সপ্তম পর্ব্ব— রসতত্ত্ব* (কলিকাতা: প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ৩০২১।

আকুতি। যেখানে 'অ-লৌকিক' মায়ার জগৎ থেকে রস যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠবে পরমপুরুষসৃষ্ট অলৌকিকতামণ্ডিত এক জগৎ, যেখানে অভক্তের প্রবেশাধিকার নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন তার ধর্মীয় অভীষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কাব্য-নাট্য ইত্যাদির গুরুত্ব যথাসম্ভব কমিয়ে এনেছিল। বলা হয়েছিল, ভক্তের চিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতিই রসপরিণতির মুখ্যহেতু। এ ক্ষেত্রে কাব্যনাট্যাদির গুরুত্ব অতি সামান্য। সংস্কৃত রসতত্ত্ব অনুসারে কাব্য বা নাট্যের উপস্থিতি ছাড়া স্থায়িভাবের রসপরিণতি-প্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ কাব্য বা নাট্যই লৌকিক জীবনের ভাবকে অ-লৌকিক রসে পরিণত করে। এদিকে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে বলা হল, কৃষ্ণরতিই সেই মূল অলৌকিক উপাদান যা ভাবকে রসপরিণতি দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। চিত্তে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব না হলে কেবল কাব্যনাট্যাদির অনুশীলনে কৃষ্ণাদি বিভাবতা প্রাপ্ত হয় না[92]। কাব্যনাট্য আস্বাদনের প্রাচুর্য বিস্তার করে ঠিকই, বিভাব-অনুভাব ইত্যাদির মিলনে কৃষ্ণরতির আস্বাদনের চেয়েও অপূর্ব অনির্বচনীয় এক আনন্দ চমৎকারিতা জন্মায়। কিন্তু কাব্যনাট্য ছাড়াও, কেবল হরিসম্বন্ধীয় কথা শুনেই সাধুভক্তের রসাস্বাদন ঘটতে পারে। এভাবে কাব্যনাট্যের গুরুত্বকে নস্যাৎ করা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব আচার্যদের কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যকে ঔজ্জ্বল্য দেওয়ার প্রকল্পকেই স্পষ্ট করে দেয়। বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের অনুকূল একটি স্বতন্ত্র রসশাস্ত্রের ধারা তৈরি করাই ছিল বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মূল অভীষ্ট।

---

[92] অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে কিন্তু কাব্যনাট্যের অনুশীলনে অভ্যস্ত যে-কোনও দর্শক বা শ্রোতার কাছে কৃষ্ণবিষয়ক নাটকে রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ বিভাব হিসেবে পরিগণিত হবেন। এর জন্য তাঁদের কৃষ্ণভক্ত হওয়া আবশ্যক নয়।

তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভরত-কথিত রসসূত্রই বৈষ্ণব পরিণামবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তথাকথিত রসতত্ত্বের কাঠামোকে একেবারে নস্যাৎ করেনি বৈষ্ণব রসনিষ্পত্তির তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে—

> বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারি ভাব— এই চতুর্বিধ সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়; দধি যেমন শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইয়া রসালারূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ।[93]

অন্যদিকে, *নাট্যশাস্ত্র*-এ ভরত রসনিষ্পত্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা এইরকম—

> রস ছাড়া কোন বিষয় হয় না। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী (ভাবের সংযোগে) রসনিষ্পত্তি হয়। দৃষ্টান্ত কি? এই প্রশ্নের উত্তর—যেমন নানা তরকারী, ওষধি দ্রব্য সংযোগে (কটু অম্লাদি) রস জন্মে, তেমনই নানাভাবের উপস্থিতিতে হয় রসনিষ্পত্তি। যেমন গুড়াদি দ্রব্যসমূহ, তরকারী ও ওষধিসমূহের দ্বারা ছয়টি রস উৎপন্ন হয়, তেমনই নানা ভাবের মিশ্রণে স্থায়িভাবসমূহ রসত্ব প্রাপ্ত হয়...। ব্যঞ্জন ও ওষধির সংমিশ্রণ যেমন অন্নকে সুস্বাদু করে, তেমনই ভাব ও রসসমূহ পরস্পরকে ভাবিত (ব্যক্ত) করে।[94]

গুড়, ব্যঞ্জন, ওষধি প্রভৃতির মিশ্রণে ষাড়ব নামক যে পানীয়ের কথা এখানে বলা হল, সেটি এমন এক মিশ্রণ যেখানে গুড়, ব্যঞ্জন কোনোটির স্বাদেরই পৃথকভাবে প্রাধান্য থাকে না, বরং সবকটি স্বাদ মিশে একটি নতুনতর স্বাদের জন্ম হয়। বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকরা তারই অনুসরণে বললেন, "রসালার আস্বাদনে কেবলমাত্র দধির, বা শর্করার বা মরিচাদির আস্বাদন পাওয়া যায় না; দধি, শর্করা ও মরিচের সম্মিলিত আস্বাদনের অনুভব হয়।"[95]

---

[93] নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, ৩০২৫।

[94] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ভরত নাট্যশাস্ত্র— প্রথম খণ্ড*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১৩৭-৩৮।

[95] নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*, ৩০২৫।

গুড়, ব্যঞ্জন ও ওষধির সমন্বয়ে রসের উৎপত্তির কথা বলা হলেও, অন্নকে ব্যঞ্জন ও ওষধির সংমিশ্রণে 'সুস্বাদু'[96] করে তোলার প্রসঙ্গও ছিল সংস্কৃত রসতত্ত্বে। বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকরা মনে হয়, ভক্তহৃদয়ে উপস্থিত কৃষ্ণরতিকে কাব্যনাট্যের বিভাবের দ্বারা পরিবর্ধিত করে তোলার ধারণাটি এখান থেকেই পেয়েছিলেন।

১.৫.৪ শান্তরস

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণরতিই হল মুখ্য স্থায়িভাব। কৃষ্ণরতিকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন রসতাত্ত্বিকরা। শুদ্ধা (শান্ত), প্রীত (দাস্য), সখ্য (প্রেয়), বাৎসল্য ও প্রিয়তা (মধুর)—

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতিঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথপূর্বমনুত্তমাঃ।।

শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ।।[97]

বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুসারে শুদ্ধারতি আবার তিন প্রকার—

১) **সামান্যা শুদ্ধারতি**: শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে রতি স্বচ্ছত্ব, শান্তত্ব, দাস্য, সখ্য বা অন্য কোনও রতির মতো বিশেষত্বপ্রাপ্ত হয়নি তাকে সামান্যারতি বলে[98]।

---

[96] ব্যঞ্জন ও ওষধির সংমিশ্রণ যেমন অন্নকে সুস্বাদু করে, তেমনই ভাব ও রসসমূহ পরস্পরকে ভাবিত (ব্যক্ত) করে। [উৎস: বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র— প্রথম খণ্ড*, ১৩৯।]

[97] *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ২। ৫। ৬ [উৎস: রূপ গোস্বামী, "২। দক্ষিণ-বিভাগঃ- স্থায়িভাবাখ্যা পঞ্চম লহরী, শ্লোক- ৬," *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*, শ্রীধর-দেবগোস্বামী সম্পাদিত (কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ৩৫৯।]

[98] যেমন, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সাধারণ মথুরাবাসীর মনের মৃদুতাপ্রাপ্তি— এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধের জ্ঞান নেই।

২) **স্বচ্ছা শুদ্ধারতি:** যার চিত্তে কৃষ্ণরতির বীজ স্থান পেয়েছে, তিনি যদি কৃষ্ণভক্তদের সাধনপদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁর চিত্তের রতিবীজও নানাভাবে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। স্ফটিক নিজে স্বচ্ছ বলেই নিকটের বস্তুটির রং ধারণ করতে পারে। তেমনই এই জাতীয় রতি নানারূপ ধারণ করতে পারে বলে একে স্বচ্ছা রতি বলে[99]।

৩) **শান্তি:** এই রতিতেও সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। কেবল স্বরূপের জ্ঞান স্ফুরিত হওয়ার ফলে পরব্রহ্ম-পরমাত্মা হিসেবে কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মায় ও পরমানন্দের অনুভূতি হয়। শান্তিরতিকে রূপগোস্বামী আবার দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, সমা (শ্রীকৃষ্ণের অনুভবময়ী শান্তিরতি, যার রসপরিণতি পারোক্ষ্যশান্তরস) এবং সান্দ্রা (সাক্ষাৎদর্শনময়ী শান্তিরতি, যার রসপরিণতি সাক্ষাৎকারজনিত শান্তরস)।

এখন, এই 'শান্তিরতি' নামক ধারণার সঙ্গে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের শম্ এবং শান্তরস সংক্রান্ত ধারণার মিল পাওয়া যায়। ভরতের প্রচলিত সংস্করণ এবং তার অনুবাদগুলিতে আটটি স্থায়িভাব ও স্থায়িভাবজাত আটটি রসের উল্লেখ আছে। কিন্তু অভিনবগুপ্ত *অভিনবভারতী* রচনাকালে ভরতের যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, সেই পাঠে নবম রস ছিল শান্ত—

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ।।[100]

নাট্যশাস্ত্র-এর ভাষ্যতেও পাওয়া যায় "এবং তে নব রসাঃ"[101]।

---

[99] যেমন, অতিশুদ্ধ আর্যদের রতি— শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কান্ত, কখনও পুত্র, কখনও মিত্র বলে মনে করা

[100] গায়কোয়াড় সিরিজের বরোদা-সংস্করণ।

[101] হেমচন্দ্রের বৃত্তি। ৬.১০৯।

অভিনবগুপ্ত ছাড়াও আচার্য উদ্ভট তাঁর *কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ* গ্রন্থে নবম রস হিসেবে শান্তের উল্লেখ করেছিলেন। অনুমান করা যায়, উদ্ভটই সর্বপ্রথম শান্তরসকে স্বীকার করে নাট্যে নবরসের কথা বলেন। কোনও কোনও পণ্ডিত আবার মনে করেন তিনিই ভরত-প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র*-এর ব্যাখ্যার সময় মূল গ্রন্থে শান্তরসের কথা নিবদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও শান্তরসের স্বীকৃতি আছে। সেখানে বলা হয়েছে—

> যাহার স্থায়িভাব শম ও প্রকৃতি উত্তম, তাহা হইতেছে শান্ত (রস)—ইহাই (আলঙ্কারিকগণের) অভিমত। ইহার বর্ণ কুন্দেন্দুসুন্দর এবং দেবতা শ্রীনারায়ণ। অনিত্যত্বাদিবশতঃ অশেষ বস্তুর অসারত্ব অথবা যাহা পরমাত্মস্বরূপ—তাহা হইতেছে ইহার আলম্বন বিভাব।... শান্তরস নিরহঙ্কার। (৩.২১০-১১)[102]

সাহিত্যদর্পণঃ অনুসারে, আমি দয়া করব, আমি ধর্মাচরণ করব— এই জাতীয় অহংকার বীররসে থাকলেও শান্ততে তা অনুপস্থিত। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদে তন্ময়তাই হল শান্তের মূল লক্ষণ। সাহিত্যদর্পণকার আরও অনেক বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করে শান্তরসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

অভিনবগুপ্তের আগে থেকেই ভারতীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে শান্তরস নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ ছিল। অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী আচার্য ধনঞ্জয় ও তাঁর টীকাকার ধনিক ছিলেন শান্তরসের বিরোধী। ধনঞ্জয় জানিয়েছিলেন ‘ইহ শান্তরসং প্রতিবাদিনাম্ অনেকবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ’। শারদাতনয় শান্তরসকে বলেছেন ‘বিকলাঙ্গ’।

এহেন বিরুদ্ধবাদীদের মতে, মনোমধ্যে নির্বিকল্পত্বই হল শম্[103]। শম্ভাব নির্বিকার বলে শান্তরসের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যে রতি (ভাব) নির্বিকার-স্বভাব তা কখনোই

---

[102] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৭২-১৭৪।

[103] মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে।

রসে পরিণত হতে পারে না। কারণ নির্বিকারের গতি নেই, ক্রিয়া নেই। অথচ রসনিষ্পত্তির জন্য গতি ও ক্রিয়া আবশ্যক। আলম্বনবিভাবের প্রতি স্থায়িভাবের গতিই রসাস্বাদনকে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু শম্‌রতি তো 'ন সর্ব দুঃখং, ন সুখং, ন চিন্তা দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা'! সুতরাং নির্বিকার-স্বভাব শান্তরতির পক্ষে গতি ও ক্রিয়া অসম্ভব। অতএব শান্তরতি রসপরিণতি লাভ করতে পারে না।

দশম শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তই প্রথম এই বিরুদ্ধমতগুলি খণ্ডন করে যুক্তিসহকারে শান্তরসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাকেই শ্রেষ্ঠ রস বলে প্রমাণ করেন। অনুরূপভাবে বৈষ্ণব আচার্যরাও সমস্ত বিরুদ্ধমত খণ্ডন করে শান্তরসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

১.৫.৫ বাৎসল্যরস

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুসারে মধুরারতির অন্যতম ভেদ বাৎসল্য। কৃষ্ণরতির পাঁচটি প্রকারের মধ্যে চতুর্থটি হল বাৎসল্য। *চৈতন্যচরিতামৃত*-তে রায় রামানন্দ ও চৈতন্যের কথোপকথনে শান্ত, দাস্য ও সখ্যপ্রেমের তুলনায় বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে[104]। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও ভরত-কথিত নবরসের বর্ণনার পর 'মুনীন্দ্রসম্মত' বৎসলকে দশম রস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল—

> বৎসলশ্চ রস ইতি তেন দশমোরসঃ
> স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলশ্চ চ রসং বিদুঃ।। (৩.২১৩)[105]

---

[104] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পা., *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭), ২০৯।

[105] বৎসলও রস, সেহেতু তাহা দশম রস।
চমৎকারিতাহেতু স্ফুট বৎসলকেও রস বলিয়া (মুনিগণ) জানেন। [উৎস: মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৭২-১৭৪।]

বাৎসল্যের ধারণার ক্ষেত্রে বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের সংস্কৃত রসশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাটি তাই নস্যাৎ করা যায় না।

১.৫.৬ সাত্ত্বিকভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ-তে বলা হয়েছিল—

> শ্রীকৃষ্ণ–সম্বন্ধী ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব
> বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহকে সাত্ত্বিকভাব বলে... [106]

সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ এই তিনটিই মায়িক গুণ। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে এই সত্ত্ব ‘মায়িক’ সত্ত্ব নয়। বৈষ্ণব আচার্যেরা জানালেন এখানে সত্ত্ব একটি পারিভাষিক শব্দ। কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চলতাপ্রাপ্ত হয়ে নিজেকে প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) সমর্পণ করে। প্রাণের এই বিক্ষোভের ফলে ভক্তের দেহও বিক্ষুব্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ দেহেই সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। সুতরাং কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত তথা ‘সত্ত্ব’ থেকে উৎপন্ন অনুভাবসমূহই এই মতানুসারে সাত্ত্বিকভাব। যে কোনোরকম কৃষ্ণরতি (পাঁচটি মুখ্য বা সাতটি গৌণ) থেকে সাত্ত্বিকভাব উদ্ভূত হতে পারে।

অন্যদিকে, সাত্ত্বিকভাবের আলোচনায় ভরত বলেছেন—

> স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
> বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।।[107] (৬।২২)

---

[106] কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২। ৩। ১) [উৎস: রূপ গোস্বামী, “২। দক্ষিণ-বিভাগঃ– সাত্ত্বিকাখ্যা তৃতীয় লহরী, শ্লোক– ১,” *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ,* শ্রীধর-দেবগোস্বামী সম্পাদিত (কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ১৯৫।]

[107] বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র– প্রথম খণ্ড,* ১৮৯।

সাত্ত্বিকভাবগুলি আসলে বিশেষ প্রকারের অনুভাব। বাচিক এবং আঙ্গিক অভিনয়ে অভিনেতার দ্বারা অনুকৃত ভাবের 'বিকার' হল অনুভাব। অনুভাব অনুকার্যের 'ইচ্ছাপ্রণোদিত' 'বিকার'। কিন্তু সাত্ত্বিকভাব 'স্বতঃস্ফূর্ত' বিকার। অনুভাবের প্রকাশে অনুকার্যের নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশে অনুকার্যের সচেতন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এগুলি অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য। ভরত আটটি সাত্ত্বিকভাবের তালিকা দিয়েছেন। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বিবর্ণতা, অশ্রু এবং প্রলয় (জ্ঞানশূন্যতা)।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব অনুসারে 'সত্ত্ব' থেকে উৎপন্ন ভাবই হল সাত্ত্বিকভাব। বৈষ্ণব আচার্যেরা সাত্ত্বিকভাবের ক্ষেত্রে 'সত্ত্ব' গুণের এই অস্তিত্বকেই নাকচ করেছিলেন। বৈষ্ণব আচার্যরা সাত্ত্বিকভাবের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করলেও ভরতকথিত আটটি সাত্ত্বিকভাবকেই তাঁরা তাঁদের সাত্ত্বিকভাব-সংক্রান্ত আলোচনার মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বলা যায়, তত্ত্বের নবনির্মাণ হলেও ষোড়শ শতকে বাঙালি বৈষ্ণব তত্ত্বনির্মাতাদের চিন্তনপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল সংস্কৃত রসতত্ত্ব থেকেই।

১.৫.৭ শৃঙ্গার-বিভাজন

মধুরা রতির বৈচিত্র্য নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা সংস্কৃত রসতত্ত্বের দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন, মধুররসের দুটি রূপ। সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। কৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গাস্থিত হ্লাদিনী-সঞ্জাত রাধাকে যে মুহূর্তে পৃথক করেছেন নিজের থেকে, সে মুহূর্ত থেকেই বিরহ বা বিপ্রলম্ভ মধুররসবৈচিত্রীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বৈষ্ণব অলংকার-শাস্ত্রমতে, 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পরিপুষ্টতে'। এই শ্লোকের ছায়া দেখা যায় ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-এ এবং *সাহিত্যদর্পণঃ* গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* অনুসারে—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষারিতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ মাগো বিবর্দ্ধতে।।[108]

বস্তুত, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকেই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের এই ভেদের সূত্রপাত[109]। বিশ্বনাথ কবিরাজও শৃঙ্গার রসকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ[110]। তাঁর মতে, যেখানে প্রবল রতি অভীষ্টকে পায় না সেখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়।

বৈষ্ণবমতে বিপ্রলম্ভ চারপ্রকার— পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। এই চারটি পরিভাষার তিনটিই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ পাওয়া যায়। সেখানে বিপ্রলম্ভকে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, করুণ— এই চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভোজের মতেও বিপ্রলম্ভের চারটি অবস্থা— পূর্বানুরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। বিশ্বনাথ কবিরাজ, ভোজ প্রমুখের শৃঙ্গার-পরিকল্পনা থেকেই ‘পূর্বরাগ’, ‘মান’ ও ‘প্রবাস’ (অদূর ও সুদূর)— এই তিনটি পরিভাষা বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

একমাত্র সংস্কৃত রসতত্ত্বের করুণ-বিপ্রলম্ভের ধারণাটি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা বর্জন করেছিলেন। কারণ, তা তত্ত্বগতভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিরোধী। বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের নায়ক কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর আর রাধা তাঁরই অংশজাত হ্লাদিনী। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুর কোনোরকম সম্ভাবনা কাব্যে-নাটকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু হলে[111] তবেই করুণ-বিপ্রলম্ভ হয়। তাই করুণ-বিপ্রলম্ভের বদলে তাঁরা প্রেমবৈচিত্ত্যকে নিয়ে এলেন তাঁদের আলোচনা পরিসরে। প্রেমবৈচিত্ত্য হল কান্ত বা কান্তার

---

[108] *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* ৫। ৫২

[109] অত্রোচ্যতে— পূর্বমেবাভিহিতং সম্ভোগবিপ্রলম্ভকৃতঃ শৃঙ্গার ইতি। [বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র— প্রথম খণ্ড*, ১৪১।]

[110] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ১৪৯।

[111] যেক্ষেত্রে কাব্যে বা নাটকে তাঁরা আবার বেঁচে ওঠেন সেক্ষেত্রে করুণ-বিপ্রলম্ভ হয়। অন্যথায় কাব্যনাটকে পাত্রপাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা শৃঙ্গাররসের আধার না হয়ে করুণরসের আলম্বন হয়।

উপস্থিতিতেও বিচ্ছেদ আশঙ্কা। এটি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের দিক দিয়ে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ,[112] প্রেম-মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তেমনি ভাবনার গভীরতাকেই প্রকাশ করে। তবু এই স্বকীয়তার অন্তরালে সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রথাগত শৃঙ্গার-বিভাজনকেও অস্বীকার করা যায় না।

বৈষ্ণব রসতত্ত্বে পূর্বরাগ, মান, অদূর ও সুদূর প্রবাসের পরবর্তী সম্ভোগকে যথাক্রমে 'সংক্ষিপ্ত', 'সংকীর্ণ', 'সম্পন্ন' ও 'সমৃদ্ধিমান' নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর মধ্যেও আছে প্রথাগত সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রবর্তিত শ্রেণিবিভাজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর টীকায় সম্ভোগকে প্রকৃষ্ট ও অপ্রকৃষ্ট ভেদে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য চারপ্রকার বিপ্রলম্ভের পরে সম্ভোগ-সম্ভাবনা থাকে বলে সম্ভোগের চারটি প্রকারভেদের কথা বলা হয়। তাদের সুনির্দিষ্ট কোনও নাম ছিল না। ভোজরাজের মতে, সম্ভোগের চারটি অবস্থা— পূর্বানুরাগ পরবর্তী সম্ভোগ, মান পরবর্তী সম্ভোগ, প্রবাস পরবর্তী সম্ভোগ, করুণ পরবর্তী সম্ভোগ। শিঙ্গভূপাল আবার সম্ভোগের এই একই শ্রেণিবিভাগকে চারটি পারিভাষিক নাম দেন। সংক্ষিপ্ত (পূর্বানুরাগ পরবর্তী সম্ভোগ), সংকীর্ণ (মান পরবর্তী সম্ভোগ), সম্পন্নতর (প্রবাস পরবর্তী সম্ভোগ) এবং সমৃদ্ধিমান্ (করুণ পরবর্তী সম্ভোগ)[113]। সুতরাং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্ন-সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের ধারণা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছিল তা বোধহয় আর আলাদাভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিক-প্রবর্তিত সম্ভোগ-শৃঙ্গারের বিভাজন কাঠামো হুবহু শিঙ্গভূপালের মতোই ছিল। কেবল অচিন্ত্যভেদাভেদের দর্শন অনুসারে 'করুণ'-বিপ্রলম্ভের ঠাঁই হয়নি বলেই

---

[112] রাধা যেহেতু কৃষ্ণেরই অন্তরঙ্গাশক্তির অংশ তাঁরা তাই এক হয়েও পৃথক, আবার পৃথক হয়েও একাত্ম।

[113] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ৬৫।

'সম্পন্নতর' সম্ভোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অদূর প্রবাস পরবর্তী 'সম্পন্ন' সম্ভোগ এবং 'সমৃদ্ধিমান্' সম্ভোগকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সুদূর প্রবাস পরবর্তী সম্ভোগ হিসেবে। অর্থাৎ, নিজেদের মূলগত দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে অনৈক্যের সম্ভাবনা ঘটার আগে পর্যন্ত বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের মূল কাঠামো থেকে খুব একটা বিচ্যুত হননি। এমনকি যেখানে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে নিজেদের মূলগত দার্শনিক ভাবনার অনৈক্য দেখা গেছে, সেখানেও সাযুজ্য বজায় রাখতে তাঁরা যেটুকু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা প্রায় নগণ্য।

১.৫.৮ পূর্বরাগ ও মান

বৈষ্ণব আচার্যরা তিনপ্রকার পূর্বরাগের কয়েকটি দশার উল্লেখ করেছেন।

সাধারণ পূর্বরাগের ছটি দশা। অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিজল্প।

সমঞ্জস পূর্বরাগের দশ দশা। অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিজল্প, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মৃত্যু।

প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ দশা। লালসা, উদ্বেগ, জাগর, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু।

পূর্বরাগের এই পর্যায়নির্দেশ সম্ভবত বিশ্বনাথের পূর্বরাগ আলোচনায় দশ প্রকারের কামদশার[114] আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত।

মানের ক্ষেত্রে বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের বিভাজন অবশ্য *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুরূপ। সাহিত্যদর্পণকার 'প্রণয়মান' (কারণহীন মান যা কেবল প্রেমের আধিক্যের

[114] অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

কারণেই উদ্ভূত হয়) এবং 'ঈর্ষামান' (পতির অন্যাসক্তি দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হওয়ার ফলে উদ্ভূত মান)— এই দুই ভাগে মানকে বিভক্ত করেছিলেন। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সহেতু এবং নির্হেতু মান তারই প্রতিবিম্বমাত্র।

১.৫.৯ নায়িকাভেদ

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুযায়ী কৃষ্ণবল্লভাদের স্বকীয়া এবং পরকীয়া– এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভানুদত্তের *রস-মঞ্জরী* গ্রন্থের নায়িকাভেদে স্বীয়া, পরকীয়া ও গণিকা[115]— এই তিনটি ভেদ পাওয়া যায়। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ নায়িকাদের স্বা, অন্যা এবং সাধারণী— এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল[116]। যদিও বৈষ্ণব রসতত্ত্বে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব অন্যতর দার্শনিক মাহাত্ম্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, তবু স্বকীয়া-পরকীয়া ভেদের মধ্যে চিরাচরিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ছায়া অস্বীকার করা যায় না।

রস-মঞ্জরী-র 'গণিকা' বা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'সাধারণী' ভেদটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অনুপস্থিত, তবে 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা' ও 'সমর্থা'– এই রতিভেদের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের 'সাধারণী' ধারণার প্রক্ষেপ লক্ষ করা যায়।

বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের নির্মিত রসতত্ত্বে স্বকীয়া নায়িকার তিনটি ভাগ— মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা। *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং আরও কিছু রসতত্ত্বকেন্দ্রিক গ্রন্থে স্বীয়া নায়িকাদের মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা– এই তিনভাগেই ভাগ করা হয়েছিল। মধ্যা এবং

---

[115] সতীশচন্দ্র রায় সম্পা., *রস-মঞ্জরী* (কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ), ৩।

[116] নায়িকা ত্রিবিধ; স্বা, অন্যা ও সাধারণী স্ত্রী। [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩), ৮৭।]

প্রগল্‌ভা নায়িকাকে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ যেমন ‘ধীরা’, ‘অধীরা’ ও ‘ধীরাধীরা’— এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল, *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*-তেও সেই একই পথ অনুসরণ করা হয়েছে।

বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুযায়ী নায়িকাদের আটটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।

১) অভিসারিকা – যিনি স্বয়ং অভিসার করেন অথবা নায়ককে অভিসার করান। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে অভিসারিকা নায়িকার আরও উপবিভাগ আছে। *উজ্জ্বলনীলমণিঃ* অনুসারে, অভিসারিকা নায়িকার ভেদ দুই প্রকার— জ্যোৎস্নী এবং তামসী।

২) বাসকসজ্জা – কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় যে নারী কুঞ্জ সাজিয়ে এবং নিজে সেজে অপেক্ষা করেন।

৩) উৎকণ্ঠিতা – কান্তের আগমনে দেরি দেখে চিন্তিত নায়িকা।

৪) বিপ্রলব্ধা – সংকেত করা সত্ত্বেও নায়ক কেন এলেন না, এই চিন্তায় গ্রস্ত নায়িকা।

৫) খণ্ডিতা – প্রিয়দেহে অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন দেখে কুপিতা নায়িকা।

৬) কলহান্তরিতা – রোষপ্রকাশ করার পরে অনুতপ্তা নায়িকা।

৭) প্রোষিতভর্তৃকা – যে নায়িকার নায়ক প্রবাসে আছেন।

৮) স্বাধীনভর্তৃকা – যে নায়িকার নায়ক তার বশীভূত।

অষ্টনায়িকার এই বিভাজন কিন্তু বৈষ্ণব রসতত্ত্বেই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে, এমন নয়। সংস্কৃত রসতত্ত্বেই এমন বিভাজন আগে থেকেই ছিল, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব হয়তো তার সামান্য পরিভাষাগত পরিবর্তন করেছে। যেমন, ভোজ তাঁর *শৃঙ্গারপ্রকাশে* জানিয়েছিলেন, অবস্থাভেদে নায়িকা আট প্রকার— ১) খণ্ডিতা ২) কলহান্তরিতা ৩) বিপ্রলব্ধা ৪) বাসকসজ্জা

৫) স্বাধীনপতিকা ৬) অভিসারিকা ৭) প্রোষিতভর্তৃকা ৮) বিরহোৎকণ্ঠিতা। অন্যদিকে *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুসারেও অবস্থাভেদে নায়িকা আট প্রকার— ১) স্বাধীনভর্তৃকা ২) খণ্ডিতা ৩) অভিসারিকা ৪) কলহান্তরিতা ৫) বিপ্রলব্ধা ৬) প্রোষিতভর্তৃকা ৭) বাসকসজ্জা ৮) বিরহোৎকণ্ঠিতা।

সাহিত্যদর্পণঃ, রস-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে একশো আটাশ প্রকার নায়িকাকে উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ভাগ করা হয়েছিল[117]। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সেই ধারাকে গ্রহণ করেই উত্তম স্থানে অত্যুত্তম, মধ্যম স্থানে উত্তম এবং অধমের স্থানে মধ্যম নায়িকার কথা বলেছিল।

অনুরূপভাবে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নায়কভেদের ক্ষেত্রেও প্রথাগত সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকরা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিতে চাইলেও সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত রসতত্ত্বের সঙ্গে সংলগ্নতা রয়েই গিয়েছিল। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র চর্চিত হচ্ছিল টোল চতুষ্পাঠীতেও। স্বল্পসংখ্যক মৌলিক তত্ত্বগ্রন্থ এবং কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক বেশ কিছু প্রাচীন বইয়ের টীকাও বাংলায় রচিত হয়েছিল উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে। এইভাবেই উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়েই এখানে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে ছিল।

তবে, উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে পালাবদলের সূচনা হয়। ইউরোপ থেকে আসা অজস্র নতুন চিন্তাধারার প্রবেশে বদলে যাচ্ছিল বাঙালির দীর্ঘলালিত মননভূমি ও চিন্তনক্ষেত্র। তার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতক-পূর্ববর্তী

---

[117] মোট নায়িকাভেদ দাঁড়িয়েছিল ৩৮৪।

সময়কার বাঙালিদের কাব্যতত্ত্বচর্চার অভিমুখ উনিশ শতকে এক বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই বাঁকবদলের নানা দিক তুলে ধরাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলির প্রধানতম অন্বিষ্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বয়ান থেকে জানা গেছে, উনিশ শতকে টোল-চতুষ্পাঠীর সংস্কৃতচর্চায় কাব্য এবং অলংকারশাস্ত্রপাঠের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। যে অলংকার আগে পাঠ-পরিধির অন্তর্গত ছিল না, তাও প্রবেশ করছিল বাঙালির জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে।[1] উনিশ শতকের অন্যান্য লেখা থেকেও অলংকারের প্রতি কোনও কোনও ব্যক্তির পক্ষপাতের নজির পাওয়া যায়—

> আজকাল ইংরেজি সাহিত্য বড় নেড়া রকম— অলঙ্কারশূন্য। ...আমরা বাঙ্গালী, ইংরেজের অনুকারী; বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণ চলিতেছে, কাজেই আমাদেরও সেই রোগে ধরিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও সচরাচর বড় অলঙ্কারশূন্য। ...বিশুদ্ধ-যথার্থ মনোহর-অলঙ্কারের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সচরাচর বিশেষ অভাব।
>
> সংস্কৃত লেখকদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ অলঙ্কারপটু লেখক জাতি আর কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করেন নাই।[2]

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে *প্রচার* পত্রিকার পাতায় শোনা গিয়েছিল এই অভিযোগ। এই প্রবন্ধেই প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকরা অলংকার-প্রকাশে কত নিপুণ ছিলেন তা জানিয়ে[3] অবশেষে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলা হল—

---

[1] অনেক কাব্যের টোলে অলঙ্কার যাহা ১৫/১৬ বৎসর পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, পঠিত হইতেছে [উৎস: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "সংস্কৃত শিক্ষা," *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ বঙ্গাব্দ): ৭৮-৭৯।]

[2] অজ্ঞাত, "কালিদাসের উপমা," *প্রচার* ২য় বর্ষ (চৈত্র ১২৯২ বঙ্গাব্দ): ৪৬৭।

[3] বেদপ্রণেতাঋষিগণ হইতে ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশুদ্ধ অলঙ্কারপটু। একা মহাভারতেই যে অলঙ্কারচ্ছটা আছে ইংলন্ডের সমস্ত সাহিত্য একত্র করিলে তাহার তুলনীয় হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হিন্দু লেখকদিগের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।... অলঙ্কার প্রয়োগে কালিদাসের সমকক্ষ হইতে পারে এমন কেহই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

> দুঃখের বিষয় এই যে বিশুদ্ধ এবং যথার্থ মনোহর অলঙ্কারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ দেশীয় সাহিত্যে থাকিতেও বাঙ্গালি লেখকেরা তাহার অনুবর্ত্তী হয় না।[4]

আশ্চর্যের বিষয়, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য অলংকারশূন্য বলে আক্ষেপ প্রকাশ পায় যে সময়ে, প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের সর্বপ্রধান পত্রিকায় এই 'অলঙ্কার' শব্দকে ঘিরেই তীব্র বিতর্কের ধুয়ো তুলে দেন এক প্রাবন্ধিক—

> অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম শুনিলে ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে। ... সংস্কৃত ইংরেজিওয়ালারা বলেন অলঙ্কারশাস্ত্রে রসবোধ না হইয়া কেবল কতকগুলো নীরস বাগাড়ম্বর শিক্ষা হয় মাত্র;... [5]

কিশোরীমোহন রায় *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধতেও প্রায় একইধরনের অভিযোগ প্রকাশ করেছেন—

> প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র সাহিত্যের শোভানুভাবুকতা, মার্জ্জিত রুচি এবং দোষানুসন্ধান বিষয়ে অল্প যোগ্যতার পরিচয় দেয় নাই; কিন্তু তথাপি তাহা যেন একার্থক সাহিত্য সমালোচনা। কালের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান প্রত্যেক সুপরিচিত সাহিত্যের অভিনব শ্রীর উল্লেখ তাহাতে নাই...। অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্যের যে দোষ ও গুণ ভাগ আলোচিত হইয়াছে তাহা ধরাবাঁধা কয়খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার মাত্র; তাহাকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলা যায়,— পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা অত্যাবশ্যক বুঝিলেও সেই বিধিনিষেধ গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করিয়া যাইতেন, একটুও এদিক্ ওদিক্ নড়িবার যো ছিল না।[6]

---

[4] অজ্ঞাত, "কালিদাসের উপমা," ৪৬৭।

[5] অজ্ঞাত, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮।

[6] কিশোরীমোহন রায়, "সমালোচক," *ভারতী* ২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ২৫৩।

অলংকারশাস্ত্রের নিগড় সম্পর্কে উনিশ শতকের এই উষ্মা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। ইউরোপীয় নানা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচিত বাঙালির কাছে অলংকারশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনেকাংশে অযৌক্তিক বলেই মনে হচ্ছিল। অলংকারশাস্ত্রের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক অবশ্য এই অধ্যায়ের আলোচ্যবিন্দু নয়। কিন্তু উল্লেখ্য, 'অলংকার' শব্দকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। তবে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব কি কেবলই অলংকারকেন্দ্রিক? অলংকার ছাড়াও তো সেখানে রয়েছে আরও নানা পথরেখা। সুতরাং সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের নাম কেন 'অলংকারশাস্ত্র' হল, এই নিয়ে পরিভাষাজনিত বিতর্কের অবকাশ কম নেই। এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব ভারতীয় জ্ঞানচর্চার একটি স্বতন্ত্র পরিসর হিসেবে বিকশিত হওয়ার একেবারে প্রথম দিকে কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাবনার অভিমুখ কিন্তু ছিল প্রধানত শব্দার্থ আর সেই শব্দার্থের সজ্জার দিকেই। কাব্যতত্ত্বচর্চার সেই প্রাচীন যুগ তাই অনেকখানিই অলংকারকেন্দ্রিক। কাব্যতত্ত্বচর্চার নতুন যুগে ক্রমে ক্রমে ধ্বনি, রস প্রভৃতি ধারণা সামনে আসতে থাকে, জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে রসকেন্দ্রিক মতবাদের। কিন্তু পূর্বসূরিকে অগ্রাহ্য করে উত্তরসূরির ভিত্তিস্থল যেমন পোক্ত হয় না, তেমনি অলংকারবাদকে বাদ দিলে অস্তিত্বসম্ভব হয় না রীতি, ধ্বনি বা রসবাদ। সুতরাং উনিশ শতকের বাঙালি কীভাবে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই প্রথমেই অলংকারবাদের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সেদিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। অলংকারবাদের পাশাপাশি উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায়, বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায়, বিভিন্ন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের উল্লেখ এসেছে। তাও এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য।

২.১ উনিশ শতকের দৃষ্টিতে অলংকারবাদী তাত্ত্বিক: দণ্ডী এবং রুদ্রট

উনিশ শতকের গ্রন্থ বা পত্রিকাগুলিতে 'অলংকারবাদ' নামক পরিভাষাটির উল্লেখ সেভাবে চোখে পড়ে না। পৃথকভাবে অলংকারবাদের উল্লেখ না থাকলেও যাঁদের অলংকারবাদী তাত্ত্বিক বলে চিহ্নিত করা যায়, তাঁদের তত্ত্বভাবনার প্রতি উনিশ শতকের বিভিন্ন সমালোচনামূলক লেখায় প্রতিফলিত মনোভঙ্গি সামগ্রিক অলংকারবাদ সম্পর্কে বাঙালির সচেতনতার আভাস দিতে পারে। এ ধরনের অলংকারবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য *কাব্যাদর্শ* রচয়িতা দণ্ডী।

ষষ্ঠ শতাব্দীর আলংকারিক দণ্ডীকে কেউ কেউ রীতিবাদী আলংকারিক বলে উল্লেখ করেন। এ কথা যেমন ঠিক যে, বৈদর্ভ-গৌড়ীয় প্রভৃতি মার্গ আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ফলে দণ্ডী রীতিবাদের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন, তেমনি অলংকারবাদের ইতিহাসেও দণ্ডীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

দণ্ডীর মতে—

কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে'[7]

'শোভাকরত্বই অলংকারের লক্ষণ'[8]

অর্থাৎ যে-সব ধর্ম কাব্যকে শোভাযুক্ত করে তোলে, তাই-ই অলংকার। সৌন্দর্যবাচক 'কাব্যশোভাকর' ধর্মের কথা বলতে গিয়ে দণ্ডী দু-ধরনের 'শোভা'র কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'বিশেষ' বা বহিরঙ্গভূত সৌন্দর্য এবং 'সাধারণ' বা কাব্যের আত্মভূত সৌন্দর্য। পরবর্তীকালে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব জুড়ে সৌন্দর্য বা শোভা বা অলংকার শব্দের

---

[7] কাব্যাদর্শ ২.১

[8] তরুণ বাচস্পতি, *কাব্যাদর্শ*-এর টীকা

এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনারই আনাগোনা লক্ষ করা যায়। অবশ্য, কাব্য-সৌন্দর্য বলতে দণ্ডী এখানে বহিরঙ্গ নয়, সম্ভবত কাব্যের অন্তর্গত সৌন্দর্যের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য দণ্ডী অলংকারের পাশাপাশি গুণকেও 'কাব্যশোভাকর ধর্ম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গুণ বৈদর্ভমার্গের বিশেষ ধর্ম এবং অলংকার বৈদর্ভ ও গৌড়ীয় উভয়মার্গেরই ধর্ম। এইভাবে দণ্ডীর বিশ্লেষণে গুণ এবং অলংকারের একধরনের সমতা স্থাপিত হয়েছিল।

দণ্ডী যে যে অলংকারের কথা বলেছিলেন তাদের কয়েকটি হল,

শব্দালংকার:

অনুপ্রাস, যমক, গোমূত্রিকা, অর্দ্ধভ্রম, সর্বতোভদ্র, স্বরনিয়ম, স্থাননিয়ম, বর্ণনিয়ম, প্রহেলিকা।

অর্থালংকার:

স্বভাবোক্তি, উপমা, রূপক, দীপক, আবৃত্তি, আক্ষেপ, অর্থান্তরন্যাস, ব্যতিরেক, বিভাবনা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা, হেতু, সূক্ষ্ম, লব, ক্রম, তুল্যযোগিতা, বিরোধ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, ব্যজস্তুতি প্রভৃতি।

এই অলংকারগুলির বীজ পূর্বশাস্ত্রে নিহিত থাকলেও তাদের স্থায়ী রূপ দণ্ডীর নিজেরই সৃষ্টি। পরবর্তী আলংকারিকদের দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল ওই অলংকারগুলি। আবার, উপমার অন্তর্গত 'ধর্মোপমা', 'বস্তূপমা' প্রভৃতি পারিভাষিক নামগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, দণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গেই অলংকারশাস্ত্র থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।

বিশ্বনাথ কবিরাজ বা আচার্য মম্মটের মতো বহুল উল্লিখিত না হলেও উনিশ শতকের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-জুড়ে দণ্ডীর উপস্থিতিকে নস্যাৎ করা যায় না। দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* সম্পর্কে উনিশ শতকের বাঙালি যে একেবারে অনবহিত ছিলেন না, তার একাধিক সাক্ষ্য উনিশ শতকের বই ও পত্রপত্রিকা জুড়ে পাওয়া যায়।

ভামহকে যদি অলংকারবাদের প্রবক্তা ধরা হয়, তবে তাঁর দেখানো পথই অনুসরণ করেছিলেন উদ্ভট, দণ্ডী, রুয্যকের মতো আলংকারিকেরা। ভামহ, উদ্ভট, রুয্যক এঁদের উল্লেখ উনিশ শতকে তেমন পাওয়া যায় না। তবে দণ্ডীর একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*-এর একটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। সেই বইটির উল্লেখ আছে *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধে[9]। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থের 'Advertisement' অংশে 'হিন্দু' অলংকারশাস্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা হিসেবে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ E. B. Cowell দণ্ডীর রচনার উল্লেখ করেছেন[10]। আরও একটি বইয়ের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বাংলায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পরিচয় দেওয়ার জন্য রচিত *কাব্যদর্পণ* বইটিতে

---

[9] প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ (১৮৬১) মুদ্রিত করেন। [উৎস: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩১৬।]

[10] The following little work is an attempt to give in Bengali a succinct account of Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. *The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was written 1200 years ago* and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the ritis therein discussed, and surely if the Gauri Riti (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time. [উৎস: লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), (1) – (2).] [নজরটান আরোপিত]

লেখক জয়গোপাল গোস্বামী যেসব সংস্কৃত সাহিত্যতাত্ত্বিকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে তিনি রেখেছিলেন দণ্ডীকে।[11]

দণ্ডীর উল্লেখ প্রসঙ্গে উনিশ শতকে লেখা আর একটি গ্রন্থ্ স্মরণীয়, সেটি হল, পূর্ণচন্দ্র বসুর *সাহিত্য-চিন্তা*। দণ্ডী তাঁর কাব্যসংজ্ঞায় কাব্যের সঙ্গে 'ইষ্টার্থসাধন'-এর একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যে বা নাটকে কেন সরাসরি খুনের চিত্র দেখানো উচিত নয়— সেই যুক্তি সাজাতে গিয়ে পূর্ণচন্দ্রের সহায়ক হয়েছিল দণ্ডীর কাব্যসংজ্ঞা। তাঁর মতে, কাব্যে খুন বর্জনীয় কেন? কারণ তা দণ্ডী-কথিত ইষ্টার্থের পরিপন্থী—

> কাব্যশরীরকে এরূপে গড়িতে হইবে, যদ্দ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার ফলোদয় ঘটে। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ প্রকার ফলোদয় না ঘটে তাহা কাব্যই নহে। দণ্ডী কাব্যশরীরের এইরূপ লক্ষণ দেন:—
>
> "শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"
>
> যে পদাবলীর কোন বিশেষ ইষ্টার্থ আছে, তদ্দ্বারা কাব্যশরীর গঠিত হয়। ইষ্টার্থ কি? না
>
> "সহৃদয়বেদ্যোঽর্থঃ"
>
> তবেই দেখা যাইতেছে, কাব্য প্রীতিপ্রদ হওয়া চাই, এবং তদ্দ্বারা কোন ইষ্টার্থসাধন (desired effect) চাই।[12]

---

11 "সাহিত্যদর্পণ", "কাব্যপ্রকাশ", "কাব্যাদর্শ", "অলঙ্কারকৌস্তুভ" ও সহৃদয় শিরোমণি কবিচণ্ডীদাসপ্রণীত "কাব্যপ্রকাশদীপিকা" প্রভৃতি কএকখানি অলঙ্কারের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। [উৎস: জয়গোপাল গোস্বামী, *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ৮০।]

12 পূর্ণচন্দ্র বসু, "খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিকের মত," 'সাহিত্যে খুন,' *সাহিত্য-চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ৩০।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-তে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উনিশ শতকের বাঙালি অলংকারবাদকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল তা বুঝে নিতে এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধকার শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী অলংকার নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই এনেছিলেন দণ্ডীর প্রসঙ্গ[13]। কাব্যের দোষ এবং রীতির প্রসঙ্গেও দণ্ডীর উল্লেখ এসেছিল শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্নের এই প্রবন্ধে[14]।

দণ্ডীর তাত্ত্বিক অভিনিবেশের সুনির্দিষ্ট কোনও অভিমুখ যদি নির্ণয় করা যায়, তবে রীতির তুলনায় অলংকারের প্রতিই তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মনে করেছেন, দণ্ডীর সময়কালে শব্দালংকারের প্রতি কবিদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কবিদের সেই অলংকার-প্রিয়তা হয়তো প্রভাবিত করেছিল তাত্ত্বিকদেরও—

> যে সময়ে কাব্যাদর্শ-প্রণেতা দণ্ডী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন কবিসমাজে শব্দালঙ্কারের অত্যন্ত সমাদর ছিল। তিনি বহুবিধ যমক ও অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া তৃপ্ত হন নাই; পাঠকগণকে অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থ এবং কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।[15]

---

[13] ... আর একখানি অলঙ্কার গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ। ইহা দশকুমার-চরিত-প্রণেতা দণ্ডী কর্ত্তৃক বিরচিত। দণ্ডী কালিদাসের কিঞ্চিৎ পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যেহেতু তিনি কালিদাসের "সেতুবন্ধ" নামক প্রাকৃত কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যাদর্শে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গৌড়ীয় রীতি ও বৈদর্ভী রীতি বর্ণিত আছে। পরবর্ত্তী সমালোচকগণ পাঞ্চালী, মাগধী, লাটী ও আবন্তিকী রীতির বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যের গুণ ও অলঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্যের দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। [উৎস: শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১৮৮।]

[14] * যে সময়ে দণ্ডী কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করেন, তখন কাব্য রচনার দুইটি রীতিই প্রধানরূপে (তত্র বৈদর্ভগৌড়ীয় বর্ণোতে প্রস্ফুটান্তরৌ) [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২০৯]

** কাব্যের দোষ— কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডীর মতে কাব্যের দোষ দশটি [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২১১] (ইতি দোষা দশৈবৈতে বর্জ্যাঃ কাব্যেষু সূরিভিঃ) [*কাব্যাদর্শ* – ৩য় পরিচ্ছেদ]

[15] শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২১৯।

তাই 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' প্রবন্ধে অলংকারের প্রসঙ্গ এলে দণ্ডীকে উপেক্ষা করতে পারেননি প্রাবন্ধিক—

> মহাকবি কালিদাসের জন্মগ্রহণের পরই কাব্যাদর্শরচয়িতা দণ্ডী প্রাদুর্ভূত হন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সময়েও অলঙ্কার সকল আবিষ্কৃত হইতেছিল। তিনি বলিয়াছেন[16] অদ্যাপি অলঙ্কার সকল উদ্ভাবিত হইতেছে, অতএব কে ঐ অলঙ্কারের বিষয় নিঃশেষরূপে বলিতে পারে।[17]

উপমা অলংকার এবং প্রহেলিকা অলংকারের আলোচনা প্রসঙ্গেও দণ্ডী উল্লিখিত হয়েছেন।[18]

দণ্ডীর মতে অলংকারের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। তিনি সমস্ত অলংকারকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি। স্বভাবোক্তি অলংকারকে দণ্ডী বলেছেন আদ্যালংকার। দণ্ডী ভামহের অনুসরণেই রসকে একধরনের অলংকার হিসেবে গণ্য করেছিলেন। আবার মাধুর্যগুণের মধ্যেও রসকে অন্তর্ভুক্ত করে তাকে বাগ্‌রস এবং বস্তুরস এই দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন। দণ্ডীর গ্রন্থ *কাব্যালংকার*-এর অধ্যায় বিভাগ থেকেও

---

[16] কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মালঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।/ তে চাদ্যপি বিকল্প্যান্তে কস্তান্ কাৎর্স্নেন বক্ষ্যতি।। দণ্ডী। [উপরোক্ত শ্লোকটি প্রবন্ধের ফুটনোটে উল্লিখিত ছিল।]

[17] শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ১৮৮।

[18] * ...দণ্ডী বলেন, যে কোন প্রকারে সাদৃশ্য প্রতীতি হইলেই উপমালঙ্কার হইবে। তিনি এক উপমা অলঙ্কারের দ্বাত্রিংশৎটি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;— ধর্ম্মোপমা, বস্তূপমা, বিপর্য্যাসোপমা, অন্যোন্যপমা...

* *...আর তিনি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিকে অলঙ্কার শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। বাক্যার্থকে যে গোপন করে তাহার নাম প্রহেলিকা। দণ্ডী বলেন, কোন আমোদ প্রমোদের সভায় প্রহেলিকা দ্বারা লোকদিগকে উৎসুক অথবা বিমোহিত করা যায়, অতএব প্রহেলিকারও প্রয়োজন আছে। তিনি বঞ্চিতা, প্রমুষিতা, পরুষা, প্রকল্পিতা, নিভৃতা, সংমূঢ়া, পরিহারিকা, একচ্ছন্না, সংকীর্ণা প্রভৃতি কতিপয় প্রহেলিকার লক্ষণ নির্দ্দেশ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২১৯।]

অলংকারের প্রতি তাঁর পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়বিভাগের কথাও উল্লেখ করেছিলেন শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন—

> কাব্যাদর্শে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে গৌড়ীয় রীতি ও বৈদর্ভী রীতি বর্ণিত আছে।... দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যের গুণ ও অলঙ্কার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কাব্যের দ্বাদশ প্রকার দোষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[19]

আসলে দণ্ডীর গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু ছিল অর্থালংকার। আর তৃতীয় অধ্যায়ে শুধু দোষ নয়, শব্দালংকারের কথাও আলোচনা করেছেন তিনি। অর্থাৎ তিনটির মধ্যে দুটি অধ্যায় জুড়েই আছে অলংকারের প্রসঙ্গ। তাঁর মতে শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে কাব্যশরীর। আর সেই শব্দার্থগঠিত কাব্যশরীরের শোভাবর্ধন করে অলংকার।

বস্তুত অলংকারবাদের মূল কথা এই দুটিই। প্রথমত, অলংকারজাত সৌন্দর্যকে কাব্যের কাব্যত্বের উৎস বলে মনে করা। দ্বিতীয়ত, শব্দ ও অর্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ। ফলে অলংকারবাদী তাত্ত্বিকরা সাহিত্যকে শব্দ এবং অর্থের সম্মিলন হিসেবে দেখার পাশাপাশি শব্দার্থের গুরুত্বকেও তাঁদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। দণ্ডীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অলংকারবাদী তাত্ত্বিক দণ্ডীর সেই শব্দপ্রিয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ‘অলঙ্কার-শাস্ত্র’ প্রবন্ধে—

> প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী শব্দের প্রশংসা উপলক্ষে লিখিয়াছেন; —
>
> “... যদি শব্দনামক মহাজ্যোতিঃ জগৎ ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রদান না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় ভুবন গাঢ় মোহান্ধকারে আবৃত থাকিত। কেবল শব্দের সাহায্যেই প্রাচীন ভূপাল মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির কীর্তিকলাপ ভাষারূপ আদর্শে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাঁহাদের অবিদ্যমানেও ঐ

[19] শাস্ত্রী, “অলঙ্কার-শাস্ত্র,” ২১৯।

সকল আমাদের নয়ন পথে বিরাজ করিতেছে, কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় না।”[20]

এই *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-তেই সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ভবভূতির কাব্যে সমাসবাহুল্যের প্রসঙ্গে দণ্ডীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এখানে দণ্ডী এবং অলংকারবাদ সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ পক্ষপাত না থাকলেও দণ্ডীর কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে সচেতনতা যে ব্যক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[21]

অলংকারশাস্ত্রের পরিধিতে অপেক্ষাকৃত নতুন আগত ধ্বনিবাদ-রসবাদের অভিঘাতে অলংকারবাদ যে নিঃশেষে মুছে যায়নি, এটিই তার অন্যতম প্রমাণ। *সাধনা* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে রমেশচন্দ্র দত্তের ‘কবি ভবভুতি [য]’ প্রবন্ধতেও দণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে *কাব্যাদর্শ* রচয়িতা হিসেবে নয়, *দশকুমারচরিত*-এর রচয়িতা হিসেবেই তিনি সেখানে উল্লিখিত।[22] অন্যদিকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *দশকুমারচরিত*-রচয়িতা দণ্ডী এবং *কাব্যাদর্শ*-রচয়িতা দণ্ডী উভয়েরই উল্লেখ করেছিলেন তাঁর রচনায়[23]।

---

[20] শাস্ত্রী, “অলঙ্কার-শাস্ত্র,” ১৯৫-৯৬।

[21] এই ৭ম শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই দীর্ঘ সমাসপ্রিয় ছিলেন। দণ্ডী স্বীয় কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন:—

কাব্যের প্রকৃত শক্তি সমাসবাহুল্যের উপর নির্ভর করে।

ভবভূতি এই সকল কবির কিঞ্চিৎ পরে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের রীতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, এই জন্যই ভবভূতির কাব্যে বহুল পরিমাণে দীর্ঘ সমাস দৃষ্ট হয়। [উৎস: শাস্ত্রী, “অলঙ্কার-শাস্ত্র,” ১৩৩।]

[22] দশকুমারচরিত লেখক দণ্ডী বোধহয় শিলাদিত্যের রাজ্যকালেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। [উৎস: রমেশচন্দ্র দত্ত, “কবি ভবভুতি [য],” *সাধনা* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ২৫০।]

[23] দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। [উৎস: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৩।]

আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য’ রচিত প্রবন্ধ ‘কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা’। সেখানে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের কাব্যসংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজের কাব্যসংজ্ঞাকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং’ এই সংজ্ঞায় নাট্যে অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির মধ্যে যে কাব্যত্ব রয়েছে তার স্বীকৃতি নেই। প্রাবন্ধিকের মতে, দণ্ডী এবং মম্মটের কাব্যলক্ষণ এই ত্রুটি থেকে মুক্ত।[24] অবশ্য, দণ্ডী নির্দেশিত কাব্যলক্ষণে কেবল ‘ইষ্টার্থ’ই গুরুত্ব পেয়েছিল, দোষযুক্ত বাক্য কাব্যের মর্যাদা পাবে কি না সে বিষয়ে দণ্ডী নীরব ছিলেন। এই নীরবতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল প্রবন্ধটি[25]।

অলংকারবাদী আর এক উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক ছিলেন রুদ্রট। তিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের আলংকারিক। রস প্রস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি অলংকার-প্রস্থানেরই অনুসারী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নামও *কাব্যালংকার*। তিনি লাটী নামে একটি নতুন রীতির কথা বলেছিলেন, কিন্তু রীতিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। বরং দশটি পরিচ্ছেদে অলংকারের আলোচনা করেছিলেন। উদ্ভট-কথিত অলংকার ছাড়াও প্রায় তিরিশটি অতিরিক্ত অলংকারের আলোচনা তিনি করেছিলেন। শব্দালংকারকে পাঁচটি এবং অর্থালংকারকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। তাঁকেই অলংকার-প্রস্থানের সর্বশেষ প্রবক্তা বলা যায়।

---

[24] কিন্তু মম্মটভট্ট বা আচার্য্য দণ্ডীর কাব্য লক্ষণকে এ দোষ স্পর্শও করিতে পারে না। [উৎস: দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, “কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা,” *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৩৮৯-৯০।]

[25] [দণ্ডী নির্দেশিত] এই লক্ষণ অনুসারে ভাষাচ্যুতি-প্রভৃতি-দোষ-যুক্ত বাক্যও কাব্য হইতে পারে। এই আশঙ্কাতে মম্মটভট্ট অন্য প্রকার কাব্য লক্ষণ করিয়াছেন।... [উৎস: ভট্টাচার্য্য, “কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা,” ৩৮৯-৯০।]

উনিশ শতকের রচনায় তাঁর উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া যায় না, দু-একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত ছাড়া। শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন অবশ্য নিজের লেখায় তাঁর কথা বিস্মৃত হননি—

> কাশ্মীরীয় রুদ্রট যে কাব্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু নমি নামক পণ্ডিত ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে লিখিয়াছেন, তাঁহার টীকায় প্রাচীনতর ভাষ্য ও টীকার মত অনুসৃত হইয়াছে।[26]

এইভাবেই উনিশ শতকের বাঙালি পণ্ডিত-লেখক-সমালোচকদের কলমে উঠে এসেছিল অলংকারবাদী তাত্ত্বিকদের কথা।

২.২ উনিশ শতকের সংস্কৃত-কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত গ্রন্থে অলংকারের উল্লেখ

উনিশ শতকে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক যে সব বই রচিত হয়েছে, সেইসব গ্রন্থে অলংকার কীভাবে ও কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কোন কোন অলংকার আলোচনার পরিধিতে এসেছে— এই অংশে তা দেখে নেওয়া হবে।

জয়গোপাল গোস্বামী রচিত *সাহিত্যমুক্তাবলী* বইটির ‘অলঙ্কার পরিচ্ছেদ’ অংশে অলংকারের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে—

> যদ্দারা শব্দার্থের চমৎকারিতা ও রসের পরিপুষ্টতা হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। কটক কুণ্ডলাদি যেরূপ শরীরের শোভা সম্পাদন করে, এই অলঙ্কার সমূহও সেইরূপ কাব্যের দেহস্বরূপ যে শব্দার্থ তাহার যথোচিত শোভা সংবর্দ্ধন করে। কিন্তু এই অলঙ্কার সমূহ যে নিয়তই শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে এরূপ নহে, কখন কখন উহার অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা

[26] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, “অলঙ্কার-শাস্ত্র,” *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১৮৯।

> উহাকে শব্দের অনিয়ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অলঙ্কার দুই প্রকার; যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।[27]

একই লেখকের *কাব্যদর্পণ* গ্রন্থের অলংকারের সংজ্ঞাও প্রায় একই।[28] *সাহিত্যমুক্তাবলী* এবং *কাব্যদর্পণ* এই বইদুটিতে যে যে অলংকারের আলোচনা আছে তাদের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

সাহিত্যমুক্তাবলী

শব্দালঙ্কার

যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস, পুনরুক্তবদাভাস (প্রহেলিকা)

অর্থালঙ্কার

উপমা (মালোপমা, পূর্ণোপমা, অনন্বয় উপমা ইত্যাদি), স্মরণালঙ্কার, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্, উল্লেখ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, উৎপ্রেক্ষা (বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা), তুল্যযোগিতা, দীপক, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, সহোক্তি, সমাসোক্তি, পরিকর, অপ্রস্তুত প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, পর্য্যায়োক্ত, অর্থান্তরন্যাস, অনুকূল, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিষমালঙ্কার, সম, বিচিত্র, অধিক,

---

[27] জয়গোপাল গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী: অলঙ্কার। প্রথম ভাগ* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ), ৩০।

[28] যদ্দারা শব্দার্থের চমৎকারিতা ও রসের পরিপুষ্টতা হয়, তাহার নাম অলঙ্কার। কেয়ূর কুণ্ডলাদি যেরূপ শরীরের শোভা সম্পাদন করে, এই অলঙ্কার-সমূহও সেইরূপ কাব্যের দেহস্বরূপ যে শব্দার্থ তাহার যথোচিত শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে; কিন্তু এই অলঙ্কারসমূহ যে নিয়তই শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে এরূপ নহে, কখন কখন শব্দার্থে অলঙ্কারের অসদ্ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা উহাকে শব্দের অনিয়ত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অলঙ্কার দুই প্রকার; যথা— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। [উৎস: জয়গোপাল গোস্বামী, "সপ্তম পরিচ্ছেদ," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ১৯৩-৯৪।]

বিশেষ, ব্যাঘাত, কারণ-মালা, একাবলী, অন্যোন্য, সার, পর্যায়, পরিবৃত্তি, মীলিত, সামান্য, তদ্‌গুণ, অতদ্‌গুণ ... প্রভৃতি।[29]

কাব্যদর্পণ-এর তালিকাটি ছিল এইরকম—

শব্দালঙ্কার

যমক, শ্লেষ (অভঙ্গ, সভঙ্গ), অনুপ্রাস (ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস), বক্রোক্তি, কাকু বক্রোক্তি, ভাষাসম, পুনরুক্তবদাভাস

অর্থালঙ্কার

প্রহেলিকা, উপমা (পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা), একদেশ বিবর্ত্তিনী, মালোপমা, রসনোপমা, অনন্বয়োপমা, উপমেয়োপমা, রূপক (পরম্পরিত, সাঙ্গ, নিরঙ্গ, মালা, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য), স্মরণালঙ্কার, পরিণাম, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্, উল্লেখ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, উৎপ্রেক্ষা (বাচ্যা ও প্রতীয়মানা), অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা, দীপক, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, সহোক্তি, বিনোক্তি, সমাসোক্তি, পরিকর, অপ্রস্তুত প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি, পর্য্যায়োক্ত, অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, হেতু, অনুকূল, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিরোধ, অসঙ্গতি, বিষম, সম, আক্ষেপ, বিচিত্র, অধিক, অন্যোন্য, বিশেষ, ব্যাঘাত, কারণমালা, মালাদীপক, একাবলী, সার, যথাসংখ্য, পর্য্যায়, পরিবৃত্তি, পরিসংখ্যা, উত্তর, অর্থাপত্তি, বিকল্প, সমুচ্চয়, সমাধি, প্রতীপ, মীলিত, সামান্য, তদ্‌গুণ, অতদ্‌গুণ, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, স্বভাবোক্তি, ভাবিক, উদাত্ত।[30]

লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থে অলংকারের উল্লেখের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা সূচিপত্র থেকে পাওয়া যায়—

---

[29] গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী*, ৩০-৬৯।

[30] জয়গোপাল গোস্বামী, "সূচীপত্র," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ।৶ - ।।৶৹।

কাব্যনির্ণয়

> অধিক অলঙ্কার, অধিক পদতা, অন্যোন্য অলঙ্কার, অনন্বয়োপমা, অনুকূল অলঙ্কার, অনুপ্রাস, অপস্মার, অপহ্নুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থাপত্তি অলঙ্কার, অর্থপুনরুক্ততা, অর্থান্তরন্যাস, অসঙ্গতি অলঙ্কার, উত্তর অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা, উদাত্ত অলঙ্কার, উপমা (লুপ্তোপমা, রসনোপমা, মালোপমা, প্রতিবস্তূপমা), উল্লেখ, একাবলী অলঙ্কার, কাকু বক্রোক্তি, চিত্রালঙ্কার, নিশ্চয় অলঙ্কার, নিদর্শনা অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত অলঙ্কার, পরিবৃত্তি অলঙ্কার, বিরোধ, বিরোধাভাস, বিশেষ, বিশেষোক্তি, বিষম অলঙ্কার, ব্যতিরেক, ব্যাজোক্তি, ব্যাজস্তুতি, বিভাবনা, ভ্রান্তিমান্, যমক, রসবৎ অলঙ্কার, সন্দেহ, সম, সমাধি অলঙ্কার, স্মরণ, সার, সহোক্তি, সামান্য, সামান্য নিষেধ, সমাহিত, সমুচ্চয়, সহচর ভিন্নতা, সংসৃষ্টি, ব্যাঘাত।[31]

শুধু অলংকার-বিষয়ক গ্রন্থই নয়, পত্রিকার বিভিন্ন লেখালিখির মাধ্যমেও পাঠকের সঙ্গে সংস্কৃত অলংকারগুলির পরিচয় ঘটানোর একধরনের চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছিল। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' প্রবন্ধে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, প্রহেলিকা— এই কয়েকটি শব্দালংকার এবং পঁচিশটি অর্থালংকারের পরিচয় ছিল। অর্থালংকারগুলি হল—

> উপমা (মালোপমা, উপমেয়োপমা, রসনোপমা), রূপক, উৎপ্রেক্ষা (বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা), অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, অসঙ্গতি, উল্লেখ, স্মরণ, ব্যাজস্তুতি, বিষম, আক্ষেপ, অপহ্নুতি, অর্থান্তরন্যাস, বিরোধ, দীপক, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, বিশেষোক্তি, ভ্রান্তিমান্, সন্দেহ, প্রতিবস্তূপমা, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি।[32]

যে যে অলংকারের উল্লেখ প্রায় সব গ্রন্থেই ঠাঁই পেয়েছে সেগুলির একটি তালিকা নিচে রাখা হল—

---

[31] লালমোহন বিদ্যানিধি, "সূচীপত্র," *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), ৶০ - ៲៲০।

[32] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২১৯-২৭।

উপমা	**রূপক**
উৎপ্রেক্ষা	**অতিশয়োক্তি**
নিদর্শনা	**দৃষ্টান্ত**
বিভাবনা	**উল্লেখ**
ব্যাজস্তুতি	**বিষম**
অপহ্নুতি	**অর্থান্তরন্যাস**
বিরোধ	**দীপক**
বিশেষোক্তি	**ভ্রান্তিমান্**
সন্দেহ	**প্রতিবস্তূপমা**

অগণিত অলংকারের মধ্যে কোন অলংকারগুলি উনিশ শতকে কিছুটা অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছিল তার আভাস এই তালিকা থেকে পাওয়া যেতে পারে।

২.৩ উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় অলংকারের প্রয়োগ

গোটা উনিশ শতক জুড়ে মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাতেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের অনুষঙ্গ এনেছেন লেখক ও প্রাবন্ধিকরা। তার সিংহভাগ আবার জুড়ে আছে রস ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ। কোনও কোনও সমালোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য অনুপ্রাস, উপমা, রূপক— এমন কিছু প্রচলিত অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। যেমন,

২.৩.১ শব্দালংকার— অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ

যে দুটি শব্দালংকার উনিশ শতকে সবচেয়ে বেশি আলোচিত, সেই দুটি হল অনুপ্রাস এবং যমক। অনুপ্রাস নিয়ে আলোচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য অনুপ্রাসের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বর নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করা হয়ছে। যেমন, *সংস্কৃতভাষা ও*

সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নৈষধচরিত সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

> শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং অনুপ্রাসবাহুল্য দ্বারা, নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া, সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন।[33]

অর্থাৎ, অনুপ্রাসের আতিশয্য উনিশ শতকের কোনও কোনও পণ্ডিতের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও সময়ান্তরে রুচির পরিবর্তনে অনুপ্রাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটছিল। ‘প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি’ প্রবন্ধে সেখ সাদি-র ফার্সি রচনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এসেছে অনুপ্রাসের প্রসঙ্গ—

> সেখ সাদি ফার্শীতে বোধ হয় অনুপ্রাসের প্রথম সূত্রপাত করেন। অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া ফার্শীভাষাকে তিনি বড়ই মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসের আড়ম্বরে তিনি ব্যকরণ [য] ও অলংকারের শ্রাদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।
>
> ...সেখ সাদির অনুপ্রাস লিখিবার প্রথাটা কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত অনেকটা মিলে। গুপ্তকবি অনেক সময়ে অনুপ্রাসের কুহকে পড়িয়া অর্থশূন্য প্রলাপ লিখিয়া গিয়াছেন... [34]

---

[33] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭৭), ১০৩।

[34] অজ্ঞাত, “প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমোন্নতি,” *ভারতী* ২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ): ২৫-২৬।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষে উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত *সৌদামিনী উপাখ্যান*-এর 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় অনুপ্রাস-প্রসঙ্গ এসেছে এবং অনুপ্রাসের অতিরেক সমালোচিতও হয়েছে—

> ...মধ্যে ২ অনুপ্রাসের ঘটা। তজ্জন্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[35]

প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত *মহিলা* কাব্যের সমালোচনায় বলা হল—

> এইরূপ "মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার" প্রভৃতি অনুপ্রাসগুলিও সুন্দর। পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে হয় যে অনুপ্রাসের অনুরোধে স্থানে স্থানে জোর করিয়া বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে। উহাতে অর্থকৌটিল্য ঘটিয়াছে, কোথাও বা লালিত্য কমিয়াছে।[36]

এখানে অনুপ্রাসের সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করা হয়নি বটে, তবে অনুপ্রাসের দাবি মেটানোর জন্য আরোপিত বা কৃত্রিম বাক্যবিন্যাস যে সমর্থনযোগ্য নয়—সেই মনোভাবও ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীশিঃ নামে রচিত 'কাব্য কবি ও কবিত্ব' প্রবন্ধে তো অনুপ্রাসের প্রতি লেখকের তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকট। তার কারণও অবশ্য লেখক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন—

> যে অনুপ্রাসের জন্য ঈশ্বরগুপ্তের মত একজন উৎকৃষ্ট কবি একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছেন, সেই অনুপ্রাসের প্রতি আমাদিগের স্বাভাবিকই কেমন বীতরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে হয় তো আমরা অনুপ্রাসের জন্য প্রসাদী বিদ্যাসুন্দরকে তত আদরণীয় জ্ঞান করিতাম না।...[37]

---

[35] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৫৯৪।

[36] অজ্ঞাত, "সমালোচনা: সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত *মহিলা*," *প্রচার* ৪র্থ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৩০১-৩।

[37] শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৮।

রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রাবন্ধিক অনুপ্রাসের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন—

> যে অনুপ্রাসপ্রিয়তা নিবন্ধন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সমুদায় কবিত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরে সেই অনুপ্রাসের আদর্শ দেখান। আবার এই অনুপ্রাসের জন্য প্রসাদী বিদ্যাসুন্দর অধিকতর বিরক্তিকর হইয়াছে।[38]

অবশ্য রামপ্রসাদের শাক্তসংগীতে অনুপ্রাস যে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, বরং স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগের দ্বারা কাব্যের শোভাবর্ধন করে সে কথা জানাতেও ভোলে না এই প্রবন্ধ—

> প্রসাদের অনুপ্রাসপ্রিয়তা তাঁহার সঙ্গীতমধ্যেও লক্ষিত হয়, কিন্তু এ স্থলে আমরা ভাবে এত বিমোহিত হই, যে সেদিকে আমাদিগের আর দৃষ্টি যায় না। এস্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়।[39]

নব্যভারত পত্রিকায় বীরেশ্বর গোস্বামী রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর সমালোচনায় বাক্যানুপ্রাসকে ভাষার সাবলীলতা নষ্টের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

> ... ছেকানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, ইত্যাদির ব্যবহার কালিদাস, জয়দেব ও শ্রীহর্ষাদির গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ইংরাজ কবি Tennyson যেমন বাক্যানুপ্রাসের সুন্দর ব্যবহার করিয়াছেন···সেরূপ আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমাদের বঙ্গকবি এই বাক্যানুপ্রাসের অস্থানে ব্যবহার, দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ [...ইত্যাদি দ্বারা ভাষার প্রাঞ্জলতা নষ্ট করেছেন] [40]

---

38 শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," ১৪৮।

39 শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৮।

40 বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ১৫৩।

ওই একই পত্রিকায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' অংশে নীলকান্ত রায়চৌধুরী প্রণীত *সীতাহরণ কাব্য*-এর সমালোচনায় কবি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দুই এক স্থলে অনুপ্রাস ও যমক অবতারণা করিতে যাইয়া বর্ণনা অঙ্গহীন ও ভাব জটীল করিয়াছেন।"[41]

নব্যভারত পত্রিকার 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' অংশের বিভিন্ন সমালোচনায় বারবার এসেছে অনুপ্রাস-প্রসঙ্গ। যেমন, এই পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *ক্ষণামিহির*-এর সমালোচনায় বলা হয়েছে—

> কিন্তু আজি কালি এত অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি... অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের সজ্জা, তারপর আবার নবজলধর পটল গছের বাঙ্গালা আর কেউ ভালোবাসে না।[42]

অর্থাৎ উনিশ শতকের অধিকাংশ সমালোচনামূলক লেখাতেই অনুপ্রাস সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ফুটে উঠেছে। অল্প কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে অনুপ্রাসকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়নি। যেমন, *নব্যভারত*-এরই 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা'য় অনুবাদের দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে—

> কোন কোন শ্লোকে মূলে অনুপ্রাস আছে; অনুবাদেও পরিবর্ত্তিত ভাবে অনুপ্রাস রচিত করিয়া কবি বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।[43]

---

[41] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: সীতাহরণ কাব্য," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৬৬৩।

[42] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: ক্ষণামিহির," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৬৭২।

[43] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৬৬৩।

'বাহাদুরি' শব্দটি এখানে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। *সাহিত্য* পত্রিকার প্রথম বর্ষে 'কমলাকান্ত' নামে কোনও লেখক 'আনুপ্রাসিক উপন্যাস' লেখার চেষ্টা করেছিলেন। সেই উপন্যাসের প্রথম বাক্যটি ছিল এইরকম—

> কষিত-কাঞ্চন-কান্তি কাদম্বিনী, কলিকাতা কপালীটোলার কালীকমল করের কন্যা।[44]

নব্যভারত পত্রিকার অষ্টম বর্ষে যথাক্রমে শরচ্চন্দ্র বাক্যরত্ন [য] এবং শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা রচিত দুটি প্রবন্ধ 'মাঘভট্ট' এবং 'ভারবি'-তে মাঘ এবং ভারবির যমক এবং অনুপ্রাস রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

- যবক[য] ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে মাঘ অসাধারণ ক্ষমতাশালী। ভট্টিকাব্যের লেখক ভট্টিকবি ব্যতীত তাঁহার তুল্য শব্দালঙ্কারের মাধুরী কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

- ... তাবদ্ভারবের্ভাত্তি, যাবন্মাঘস্যনোদয়ঃ।
  উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃক্বচ ভারবিঃ।।

  ইহা বোধ হয়, যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয় পাঠকদিগের উক্তি হইবে; নতুবা ভাবের পক্ষপাতী পণ্ডিতসমাজ, কদাচ তাঁহাকে [ভারবিকে] মাঘ ও শ্রীহর্ষের নিম্নে আসন প্রদান করিবেন না। ... কিন্তু কালিদাসের সময় হইতে যে যমক, অনুপ্রাস ও চিত্রময় কবিতা লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু ভারবি, যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে তত উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই; এ বিষয়ে মাঘভট্ট অধিক কৃতকার্য হইয়াছেন।[45]

---

[44] কমলাকান্ত, "আনুপ্রাসিক উপন্যাস," *সাহিত্য* ১ম বর্ষ (১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ১৭১-৭২।

[45] * শরচ্চন্দ্র বাক্যরত্ন [য], "মাঘভট্ট," *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৩৮।

* * শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, "ভারবি," *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৫১৪-৫১৮।

যমক প্রসঙ্গে ঘটকর্পর-বিরচিত ‘দ্বাবিংশতি শ্লোক’-এর উল্লেখ পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের লেখনীতে। ঘটকর্পর যমক-অলংকারযুক্ত কাব্য লেখার চ্যালেঞ্জ নিয়েই এই শ্লোকগুচ্ছ রচনা করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন— “যে কবি যমক লিখিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘটকর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব।”[46] বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, ঘটকর্পরের যমক-রচনাবিষয়ক এই দর্প চূর্ণ করতেই কালিদাস রচনা করেন *নলোদয়* কাব্য। তাই “নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। ...ঘটকর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক।”[47] ঘটকর্পর সম্পর্কে সরলা দেবী জানিয়েছেন—

> কথিত আছে শব্দালঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। নিত্য নিত্য নূতন যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত কবিতা রচনা করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে উপহার প্রদান করিতেন। একদা তিনি একখানি যমক কাব্য রচনা করিয়া মহারাজের হস্তে অর্পণ করেন।[48]

এখানেও ঘটকর্পরের পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছিলেন সরলা দেবী—

> নলোদয় যমকালঙ্কারের আদর্শ, ইহার শব্দবিন্যাসচাতুরীর নিকট পূর্বোক্ত কবি পরাজিত হইলেন।[49]

উনিশ শতকের একাধিক রচনায় শ্লেষ অলংকারেরও উল্লেখ আছে। যেমন, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ‘বাসবদত্তাকার সুবন্ধু’ প্রবন্ধে বলেছেন “বাসবদত্তা আদ্যন্ত শ্লেষোক্তি

---

[46] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, “সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব,” *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১* (কলকাতা: দে’জ, ২০২০), ৪০৫।

[47] বিদ্যাসাগর, “সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব,” ৪০৫।

[48] সরলা দেবী, “ঘটকর্পর,” ‘গ্রন্থ সমালোচনা,’ *ভারতী* ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ৯৫২।

[49] সরলা দেবী, “ঘটকর্পর,” ৯৫২।

পরিপূর্ণ।"[50] বিদ্যাসাগর *কাদম্বরী* প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাস ঘটিত রচনা করিয়াছেন।"[51]

রসসাহিত্যের, বিশেষ করে সংস্কৃত রসসাহিত্যের বিশ্লেষণে শব্দালংকারের প্রয়োগের এমনই অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২.৩.২ অর্থালংকার— উপমা ও রূপক

উপমাকেই কবিত্বের সমার্থক বলে চিহ্নিত করেছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম আধুনিক কবি[52]। উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় বারবার ফিরে এসেছে সেই উপমার কথা। বিভিন্ন টেক্সটের, বিশেষত সংস্কৃত রচনার বিশ্লেষণসূত্রেই উপমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন একাধিক সমালোচক। উপমার সমধর্মী আরেকটি তুলনাবাচক অলংকার হল রূপক। রূপকের উল্লেখও উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনায় সমালোচনার অঙ্গ হিসেবেই এসেছে। উপমা এবং রূপকের কথা একইসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

তবে শুধুই উপমার দৃষ্টান্ত নয়, উপমার মূল ধর্মকেও আশ্চর্য সহজে তুলে ধরেছিল *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ। দুটি আপাত বিসদৃশ বস্তুকে কল্পনাশক্তির বলে সাদৃশ্যসূত্রে গেঁথে নেওয়াই উপমার সৌন্দর্যের উৎস, সে কথা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে—

---

[50] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বাসবদত্তাকার সুবন্ধু," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩৫৯।

[51] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১১।

[52] 'উপমাই কবিত্ব'— কবি জীবনানন্দ দাশ।

> কবিতা ও কাব্য-রসের অর্থাৎ তদন্তরগর্ত সৌন্দর্যের অবশ্য নানা লক্ষণ আছে। ...কবি সম্প্রদায়ের নিজের এবং আলঙ্কারিকদিগের লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, কবিতার বৈজ্ঞানিককৃত লক্ষণ কি, বারেক দেখা যাউক। ...আলঙ্কারিক যাহা বহু কথায় বুঝাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক তাহা এক কথায় সারিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যের সৌসাদৃশ্য সৃষ্টিই কবিতা।[53]

'সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যের সৌসাদৃশ্য সৃষ্টিই কবিতা'— এই কথার মধ্য দিয়ে আসলে উপমাকেই কবিতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বক্তব্য যেন হুবহু মিলে যায় কবি জীবনানন্দ দাশের উপমা-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে।

কিন্তু এর বহু আগেই কালিদাস তাঁর উপমা প্রয়োগের ঈশিত্বে এ বক্তব্যের সত্যতা একপ্রকার সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রায় কোনও কবি-লেখকই কালিদাসের উল্লেখ এলে উপমাপ্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের 'কবি ভবভুতি' [য] প্রবন্ধটির পুনরুল্লেখ করতেই হয়—

> কালিদাসের উপমাগুলি যেন উপবনে রাশি রাশি বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ বিচিত্র, সেইরূপ সুগন্ধ ও সুন্দর— হৃদয়মুগ্ধকারী। ভবভূতির সেইরূপ উপমাচাতুর্য্য নাই।[54]

এই একই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রবন্ধের উল্লেখ অনিবার্য। অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'কালিদাসের উপমা' নামক রচনার শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট, এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় কালিদাসের কাব্য-নাটকে উপমার ব্যবহার। এখানে উপমা তথা অলংকারকেই

---

53 অজ্ঞাত, "এক অপরিজ্ঞাত কবি," *নব্যভারত* ১২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ২১৫।

54 রমেশচন্দ্র দত্ত, "কবি ভবভুতি [য]," *সাধনা* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ২৪৫।

কালিদাসের কবিত্বের নির্যাস বলে ধরে নিয়েছিলেন লেখক। তার ভূমিকা হিসেবে উপমার শ্রেণিবিভাগ বিষয়ক কিছু সাধারণ আলোচনাও করেছিলেন—

> অলঙ্কার বিবিধ প্রকার— তন্মধ্যে উপমা একজাতীয় অলঙ্কার...। প্রথমে উপমার প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় উপমা দ্বিবিধ। ...প্রথম সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে, কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত আর একটী বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে।
>
> দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটি বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি ব্যয় করে, রাজা দশরথ সেইরূপ ধনব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট— দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট— মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আনুষঙ্গিক মাত্র। ...এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য্য।[55]

এরপর কালিদাসের উপমার প্রশংসা করে বলেছেন—

> কালিদাসের উপমা— অব্যর্থসন্ধান। পৃথিবীতে এমন উপমাপটু কবি আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠককে, সেই উপমাকুসুমের একছড়া ক্ষুদ্র হার গাঁথিয়া অদ্য উপহার প্রদান করিব।...
>
> কালিদাস এরূপ উপমাপটু যে, অনেক স্থানে এবং প্রায় প্রতিশ্লোকেই উপমা ব্যবহার করিয়াছেন।

---

[55] অজ্ঞাত, “কালিদাসের উপমা,” *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৪৬৩-৬৪।

> ...এক্ষণকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশুদ্ধ অলঙ্কারশূন্য শোভাহীন অবস্থা দেখিয়া কালিদাসের উপমার প্রতি বাঙ্গালি লেখক ও পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।[56]

এই রচনায় কালিদাসের কাব্য থেকে উপমার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আলোচিত হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮২ বঙ্গাব্দে। তার প্রায় এগারো বারো বছর পরে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে *প্রচার* পত্রিকায় ওই একই শিরোনামের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুটি প্রবন্ধের লেখক যে একই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় তাঁর লেখায় "বর্ত্তমান লেখক প্রণীত কালিদাসের উপমা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বপ্রচারিত একটি প্রবন্ধ"[57]-এর উল্লেখ থেকে। 'পূর্ব্বপ্রচারিত' ওই প্রবন্ধটি যে আগে *বঙ্গদর্শন*-এ বেরিয়েছিল তারও উল্লেখ করেন লেখক। *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি আর সহজলভ্য থাকবে না, এই আশঙ্কায় সেই প্রবন্ধের অধিকাংশই *প্রচার*-এর পাতায় উদ্ধৃত করেন তিনি। অল্প কিছু পাঠান্তর ছাড়া *বঙ্গদর্শন*-এর প্রবন্ধ ও *প্রচার*-এর প্রবন্ধে তেমন কোনও ফারাক চোখে পড়ে না।[58] কিন্তু, দুটি পত্রিকায় একই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ থেকে বোঝা যায়

---

[56] অজ্ঞাত, "কালিদাসের উপমা," ৪৬৩-৬৪।

[57] অজ্ঞাত, "কালিদাসের উপমা," *প্রচার* ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৪৬৭।

[58] এইস্থলে উপমা বুঝাইবার জন্য কিছু বলিবার আছে। তাহা বুঝাইবার জন্য হইতে প্রথমতঃ কিছু উদ্ধৃত করিব।

উপমা দ্বিবিধ। ...প্রথম সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত আর একটী বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটী বা ততোধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধে সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি বিকীর্ণ করে, রাজা দশরথ তেমনি ধন বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট— দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট— মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধের যেরূপ সাদৃশ্য, যদি সম্বন্ধ বিশিষ্টেরও সেইরূপ সাদৃশ্য থাকে, সেই উপমাই সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ...এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং

কালিদাসের কবিত্বকে উপমার আলোয় তুলে ধরতে কতটা উদগ্রীব ছিলেন উনিশ শতকের লেখক ও সম্পাদকবৃন্দ।

উল্লিখিত প্রবন্ধে *শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব* প্রভৃতি কাব্যের উপমা সংক্রান্ত আলোচনা আছে। *রঘুবংশ*-এর উপমা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “রঘূবংশের [য] প্রথম সর্গ উপমা জন্য বিখ্যাত।”[59] তবে *রঘুবংশ*-এর অনেক জায়গা যে মার্জিত রুচির পরিপন্থী, সেই মত এই প্রবন্ধ-লেখকের বয়ানে উঠে এসেছে এবং উপমার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েও পুনর্বার অশ্লীলতার দিকটিতে আলোকপাত করেছেন তিনি।[60] ‘রঘুর উনবিংশ’[য] অংশটিতে, তাঁর মতে “উৎকৃষ্ট উপমা... অনেকগুলি আছে; কিন্তু একটীও উদ্ধৃত করিবার মতো নহে।”[61]

কালিদাসের উপমা-প্রসঙ্গ আবার ফিরে এসেছে *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা’ অংশে। বলা হয়েছে—

> ...কালিদাসের উপমা দেশবিখ্যাত... সেই উপমা অনুবাদে কবির হাত
> কেমন প্রকাশ পাইয়াছে, দেখা যাউক।—

কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য্য। কালিদাস এরূপ উপমাপটু যে, অনেক স্থানে এবং প্রায় প্রতিশ্লোকেই উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। [উৎস: অজ্ঞাত, “কালিদাসের উপমা,” *প্রচার* ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৪৭৩-৭৪।]

59 বাগর্থাধিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে...প্রভৃতি শ্লোকের কথা বলা হয়েছে। [উৎস: অজ্ঞাত, “কালিদাসের উপমা,” *প্রচার* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩৪।]

60 “রঘুর উনবিংশ” [য] বিখ্যাত জিনিষ। সেই উনবিংশ স্বর্গে [য] “উনবিংশ শতাব্দী”সুলভ আচার সম্পন্ন রাজা অগ্নিবর্ণের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা। এ বর্ণনা বড় বৈচিত্র্যময়ী, ললিত, হৃদয়স্পর্শী এবং প্রাঞ্জল— কিন্তু নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন।

61 অজ্ঞাত, “কালিদাসের উপমা,” *প্রচার* ৩য় বর্ষ (১২৯৩-৯৪ বঙ্গাব্দ): ৩০৩।

...উপমানুবাদের সৌন্দর্য ... ইত্যাদি শ্লোকে দ্রষ্টব্য।[62]

পুনর্বার কালিদাসের উপমার উল্লেখ পাওয়া যায় *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত 'কবি ভবভুতি [য]' প্রবন্ধে। সেখানে ভবভূতি এবং কালিদাস— এই দুই কবির উপমাপ্রয়োগের তুলনা করে লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছিলেন—

> কালিদাসের উপমাগুলি যেন উপবনে রাশি রাশি বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ বিচিত্র, সেইরূপ সুগন্ধ ও সুন্দর— হৃদয়মুগ্ধকারী। ভবভূতির সেরূপ উপমাচাতুর্য্য নাই।[63]

উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহিত্য-সংক্রান্ত সমালোচনায় উপমা প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল—

1. ...কবি রামপ্রসাদ সহজ কথায় এবং সামান্য উপমা দ্বারায় যে অসামান্য ভক্তিভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রকৃত ভক্ত ও কবিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসাধ্য।[64]
2. দশগ্রীব রাবণ, রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত বিদেহনন্দিনী সীতাকে অর্ণবে অবসন্ন পোতের ন্যায় দীন ও দুঃখার্ত্ত দেখিল। ...একবার তরঙ্গমালাকুল দুস্তরসাগরবক্ষে নিমজ্জন্ত, অসহায়, বিদীর্ণসন্ধি, ভগ্নকূপদণ্ড, সলিলস্রোতে ব্যাযচ্ছমান পোতের দুর্দ্দশা স্মরণ করুন। স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ... শত্রুকারাগারমধ্যে অবরুদ্ধ রাক্ষসীকুলপরিবৃত দুঃখ ও অনাহার-কৃশা জানকীর ঐ পোতের সহিত ঔপম্য ঘটিতে পারে কি না। দ্বিতীয় উপমাটি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ছেদের পূর্ব্বে যখন শাখাটি বনস্পতির অঙ্গীভূতা ছিল, তখনকার অবস্থা স্মরণ করিতে হইবে।...[65]

---

[62] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *নব্যভারত* ১৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দ), ৬৬৩।

[63] রমেশচন্দ্র দত্ত, "কবি ভবভুতি [য]," *সাধনা* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ২৪৫।

[64] শ্রীলক্ষ্মী, "বাঙ্গালা গীতিকাব্য," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ২৭৬।

[65] রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, "কবি ও কাব্য," *প্রচার* ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৯১।

3. মহিলার কবি অলঙ্কার প্রয়োগে নিপুণ। আমরা দুই একটি উপমার উদাহরণ দিই[66] – ...উপমা কেমন সহজ, বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ এবং সুন্দর![67]
4. মাননীয় কবি হেমবাবু[র মতে,] মাইকেল রাশি রাশি উপমা স্তূপাকার করেন এবং অনেক সময়ে উপমা উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না। ...শব্দবিন্যাসের অপূর্ব কৌশল, ছন্দের ঝঙ্কার, ভূরিতা, লালিত্য ও মাধুর্য, উপমার সুন্দর ও অলঙ্কার-বিশুদ্ধ প্রয়োগ ...এই সকল মাইকেলের রচনার সাধারণ গুণ;...[68]
5. বর্ণনীয় বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবিগণ অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন এস্থলে যে দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা লক্ষ্মণ যে প্রকৃতই একজন নরহন্তা, তাহা জেন [য] আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে।[69]

উনিশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থেও উপমা ও রূপকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, পূর্ণচন্দ্র বসুর *কাব্য-চিন্তা* গ্রন্থে রামপ্রসাদের কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

> সেই ভাবের সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-ভূষণে চতুর্গুণ বর্দ্ধিত। রূপক-শোভা নহিলে কি ততদূর গভীর ভাবের সুন্দর বিকাশ হয়? রূপক শোভা ধারণ করাতেই তাহাদের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপমার সৌন্দর্য্যে ভাব-কুসুমাবলি কান্তিধারণ করিয়াছে।[70]

---

[66] কোন দুখ স্বপ্ন কথা/অন্তরে জাগিছে যথা/ ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে;/যেন বা প্রবাসে বাসে/ দূর হতে ভেসে আসে/ দেশপ্রিয়গীতখণ্ড সন্ধ্যা সমীরণে;...

[67] অজ্ঞাত, "সমালোচনা: সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত মহিলা," *প্রচার* ৪র্থ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৩০১–৩০৩।

[68] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য: উপসংহার," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৫৯।

[69] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র: তৃতীয় প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ২৩৬।

[70] পূর্ণচন্দ্র বসু, *কাব্য-চিন্তা* (কলকাতা: ডন প্রেস, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ), ১৫৬।

উনিশ শতকের নানা সাহিত্য-সমালোচনায় এরকম উদাহরণ বিরল নয়। রামপ্রসাদের রচনায় অলংকারের ব্যবহারের সৌন্দর্য উনিশ শতকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নিঃসন্দেহে। সেই কারণেই 'কাব্য কবি ও কবিত্ব' প্রবন্ধে বলা হল—

> তাঁহাদিগের [প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের] কল্পনা নব নব ভাবকুসুম বিরচিত করে, নব নব অলঙ্কাররাশি পরিধান করে... রামপ্রসাদের কল্পনা ...নূতন পথে অপূর্ব অলঙ্কাররাশি পরিধান করিয়াছে।[71]

এর পরেই এসেছে রামপ্রসাদের শাক্তগানে উপমা ও রূপকের প্রশংসা—

> আমরা রামপ্রসাদের সাধকত্বে যত না বিমুগ্ধ হই, তাঁহার সুসঙ্গত উপমাচ্ছটায়, ...রূপকরচনার চমৎকার ভাবে আমরা ততোধিক বিমুগ্ধ হইয়া যাই। ...কত অল্পকথায় কত সুমহৎ ভাব, কেমন সরল ভাষায় তাহা প্রকাশিত, কেমন রূপক ও উপমালঙ্কারে তাহা সুসজ্জিত। ...তাঁহার উপমাচ্ছটায় আমরা যত না আনন্দ লাভ করি, তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত হইয়া যাই।[72]

অলংকার-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রূপক এবং উপমার প্রসঙ্গ একত্রে উল্লিখিত হয়েছে— বেশ কিছু সংখ্যক এরকম উদাহরণও পাওয়া যায়। *কাব্য-চিন্তা* গ্রন্থে, 'কাব্য কবি ও কবিত্ব' প্রবন্ধে রূপক ও উপমার প্রসঙ্গ একত্রে এসেছে। 'কাব্য কবি ও কবিত্ব' প্রবন্ধে কবিদের তিনটি শক্তির কথা বলা হয়েছিল— "ভাব, কল্পনা, উদ্বোধন"। এর মধ্যে উদ্বোধনের অর্থ "Association of ideas." এবং কবিদের এই উদ্বোধন শক্তির ফল হল— "উপমা, রূপক, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি।"[73]

---

[71] শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৩।

[72] শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," ১৪৬।

[73] ...কবির অন্তরে আর একটী বিশেষ শক্তির কার্য্য দেখা যায়। তাহা উদ্বোধনী শক্তি অর্থাৎ (Association of ideas) ...এই শক্তি নিবন্ধন কবিদের রচনাতে উপমা রূপক দৃষ্টান্ত প্রভৃতির সদ্ভাব

আবার উপমা বাদ দিয়ে শুধুই রূপকের প্রসঙ্গ এসেছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বর্ষে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সমলোচনা'য় 'শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত' *কাব্যমঞ্জরী*-র বিশ্লেষণ করে জানানো হয়েছে— "...এই কবি কিছু রূপক প্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কার বিশিষ্ট।"[74]

২.৩.৩ অর্থালংকার— অতিশয়োক্তি ও স্বভাবোক্তি

অতিশয়োক্তি অলংকারের উল্লেখ উনিশ শতকে স্বল্প কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অনুপ্রাসের মতো অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রয়োগও বেশ নেতিবাচক ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত—

> নৈষধের আর একটী দোষ অতিশয়োক্তি-প্রিয়তা, এরূপ অতিশয়োক্তিপ্রিয় কবি আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। ... তবে তাঁহার অত্যুৎকট অতিশয়োক্তি দোষাবহ বটে, কিন্তু তিনি যে সময়ের লোক, সে সময় অতিশয়োক্তি-প্রিয়তাই অধিক ছিল। ইহা ভিন্ন এই গ্রন্থে অলঙ্কার দোষ বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।[75]

স্বভাবোক্তিকে অলংকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে স্বভাবোক্তির উল্লেখও উনিশ শতকে একেবারে বিরল নয়। যেমন, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য 'বৈদিক সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, "বৈদিক গীতিসমূহ অপূর্ব্ব কবিত্বময় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার পূর্ণ।"[76]

দেখা যায়। [উৎস: শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৬৮-৬৯।]

[74] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৩৭৭।

[75] শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, "শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য (২)," *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৬৫০-৫১।

[76] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বৈদিক সাহিত্য," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ২৪২।

অর্থাৎ উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার পরিধিতে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার— এই দুই ধরনের অলংকারের দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অলংকার যে উনিশ শতকের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২.৪ উনিশ শতকের রচনায় অলংকারবাদ সম্পর্কিত মত: সপক্ষে এবং বিপক্ষে

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে অলংকারবাদকে নস্যাৎ করে বা অতিক্রম করেই একে একে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অন্য সব মতবাদ। এভাবেই ধীরে ধীরে উঠে এসেছে, দোষ-গুণ, রীতি, ধ্বনি, রসের তত্ত্ব। ফলে ভারতীয় সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তাপরম্পরার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা যে উনিশ শতকে এসে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাওয়া অলংকারবাদকে কিছুটা উপেক্ষার চোখে দেখবেন, এই-ই তো স্বাভাবিক। *সাহিত্য* পত্রিকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের লেখায় অলংকারবাদের বিরোধী মতের তেমনই একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

> প্রকৃত কবিতা কাহাকে বলে, তাহা অনেকেই জানেন না, দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, অনেকার্থত্বকেই উৎকৃষ্ট কবিতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা কবিতার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া...আদিরসাত্মক কবিতার বৈরাগ্যপূর্ণ ও হাস্যরসাত্মক কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ... *শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, ছন্দোবৈচিত্র্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইলেও উহা প্রকৃত কবিত্বের লক্ষণ নহে।*
>
> ... সহৃদয়তাই কবিত্বের প্রধান অঙ্গ। ...যমকানুপ্রাসাদি অলঙ্কার কাব্যের শোভাবর্দ্ধক হইলেও, কাব্যের প্রধান অঙ্গ নহে। ...

> অলঙ্কারাদির অভাবেও কাব্যের আদর, এ কথার উদাহরণস্বরূপ রামায়ণের উল্লেখ করিতে পারা যায়।[77]

অলংকারবাদের বিরুদ্ধ বয়ান হিসেবে এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত কিশোরীমোহন সেনের বক্তব্যও স্মরণযোগ্য। এর সঙ্গেই বলতে হয় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-য় প্রকাশিত 'অলঙ্কার-শাস্ত্র'-এর কথা। এই নিবন্ধের অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে অলংকারের আলোচনা। নিবন্ধকার শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালংকার এবং উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালংকারের অলোচনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। কিন্তু তার পরেও অলংকার-নির্ভরতার দিকে ঝুঁকে পড়েননি তিনি। সাহিত্যদর্পণকারের উক্তি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তাঁর অলংকারবাদবিরোধী মনোভঙ্গিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> সাহিত্যদর্পণকার বলেন;— অঙ্গদ, বলয়, হার প্রভৃতি যেমন শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি রসাদির উপকারক এবং শব্দার্থের শোভাসম্পাদক; কিন্তু *এই সকল অলঙ্কার যে গুণের ন্যায় অবশ্যই কাব্যে থাকিবে তাহা নহে, না থাকিলেও কবিত্বের হানি হয় না* তবে ওজঃ, মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুলি থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়।[78]

অথচ উনিশ শতক যে অলংকারের গুরুত্বকে একেবারে বর্জন করেছিল, সে কথাও বলা চলে না। সেক্ষেত্রে *সাহিত্যমুক্তাবলী* (১৮৬২), *কাব্যনির্ণয়* (১৮৬৫), *কাব্য-দর্পণ* (১৮৭৪)-এর মতো গ্রন্থ রচিতই হত না। জয়গোপাল গোস্বামী *কাব্য-দর্পণ* গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' অংশে বলেছেন—

---

[77] সখারাম গণেশ দেউস্কর, "মহারাষ্ট্র সাহিত্য," *সাহিত্য* ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৪৭-৫০। [নজরটান আরোপিত]

[78] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র ," *সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ২১৭। [নজরটান আরোপিত]

> অলঙ্কারশাস্ত্র অতি বিস্তৃত, ইহার সমস্ত অংশ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই, বিশেষতঃ যে সকল অংশ অতি দুরূহ ও আংশিকরূপে নানালঙ্কার প্রবিষ্ট, সে সকল অংশের দিঙ্‌মাত্রও কেহ কখন প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। এজন্য আমি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।
> ... যদিও বঙ্গভাষায় কেবল অলঙ্কার পরিচ্ছেদের কোন কোন অংশ ব্যতীত আর সমস্ত পরিচ্ছেদেরই সমীচীন ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এই পুস্তকখানি অখণ্ড করিবার নিমিত্ত আমি ইহাতে অলঙ্কার পরিচ্ছেদের সমস্ত লক্ষণের তাৎপর্য্যই সন্নিবেশিত করিলাম,...[79]

তৎকালীন সময়ের সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও অলংকার-সংক্রান্ত জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ছিল— সে কথা এই অংশটি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার, জয়গোপাল গোস্বামীর লেখা সংস্কৃত অলংকার-সংক্রান্ত আরেকটি গ্রন্থ *সাহিত্যমুক্তাবলী*-তে দেখা যায়, ছাত্রদের জন্য অলংকার-বিষয়ক বইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাচ্ছেন এবং সেই বইয়ের প্রকাশে সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি উনিশ শতকের ব্রিটিশ-অধ্যুষিত ভারতের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদে আসীন। জয়গোপাল গোস্বামীর নিজের ভাষায়—

> একদা কথা প্রসঙ্গে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রমণ্ডলীর নিমিত্ত যেরূপ নানা প্রকার বাঙ্গালা পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে, সেই রূপ কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ বাঙ্গালা ভাষার কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হয় নাই।
>
> এই রূপ প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ আমাকে এই আদেশ করেন যে তুমি অলঙ্কার বিষয়ক কোন একখানি পুস্তক প্রস্তুত করুন, তাহাতে আমি

[79] জয়গোপাল গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা-অলঙ্কার* (কলিকাতা: জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ৵০।

> সম্মত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য দর্পণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া, উক্ত মহাত্মাকে দেখাইলাম; তিনি যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া মুদ্রিত করিতে আদেশ করিলেন,...[80]

উনিশ শতকে টোলগুলিও ছিল অলংকারচর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের টোলে স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, বাদার্থ, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতির সঙ্গে অলংকারও পড়ানো হত। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার সম্পর্কে বলেছেন, “কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদাঙ্গ ও জ্যোতিষ— যে বিষয়ে তিনি লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য হইয়াছেন।”[81] তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে পঁচাত্তর টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য ও অলংকারের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা* নামে একটি অলংকার-গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, যদিও তা মুদ্রিত হয়নি[82]।

১২৯৮ বঙ্গাব্দ নাগাদ যোগেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত *কাব্যপ্রবেশ* নামক একটি বই প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। *নব্যভারত* পত্রিকার সমালোচনায় বইটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কারপরিচয়ের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূল সূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার ভাষায় লেখা হইয়াছে। উদাহরণগুলিও তদুপযোগী।[83]

---

[80] গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী,* বিজ্ঞাপন।

[81] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, “বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা,” *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ৩৫১।

[82] ভট্টাচার্য্য, “বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা,” ৩৪৭-৫০।

[83] অজ্ঞাত, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,” *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৫৮৭।

তার সঙ্গে এও জানানো হয়— “এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।” লালমোহন বিদ্যানিধি নিজের বই *কাব্যনির্ণয়* সম্পর্কে বলেছিলেন— “ছাত্রদিগের উপযোগী হইবে মনে করিয়া যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছি।”[84] ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মধুসূদন সরকার কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল *কবিতাপাঠ* নামে একটি স্কুলপাঠ্য কবিতা সংকলন। তার পরিশিষ্টেও “ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ”[85] ছিল। অর্থাৎ অলংকার-শাস্ত্রকে স্কুলের ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্যভাবে পরিবেশন করা এবং অলংকার-শাস্ত্রকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ শাসকগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত— উভয় পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

এখানে মনে রাখা দরকার, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস ব্যারিংটন মেকলের মিনিটস বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল এনেছিল। ইংরাজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতাই হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শিক্ষানীতির কেন্দ্রীয় অভীষ্ট। সংস্কৃত-আরবি পুস্তকের প্রকাশ এবং প্রাচ্যপদ্ধতিতে শিক্ষাদানে সরকারি সহযোগিতা বন্ধ করার সচেতন সিদ্ধান্তও এই সময়ে গৃহীত হয়। তা সত্ত্বেও সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব ও অলংকার-সংক্রান্ত লেখালিখি একেবারে বন্ধ হয়নি, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে প্রশাসনের প্রশ্রয়ও ছিল। এর আরেকটি প্রমাণ লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়*। এই বইয়ের ‘Advertisement’ অংশে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ E.B Cowell লিখেছিলেন—

[84] লালমোহন বিদ্যানিধি, “প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন,” *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৯৮), ৴০।

[85] অজ্ঞাত, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,” *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ৩৯২।

> … it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.[86]

বইটির প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছিলেন "বঙ্গ ভাষায় একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ্ অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার কয়েকটী বন্ধু ঐ গ্রন্থ্খানি লিখিতে অনুরোধ করেন।"[87] ১৮৬৫-এর ২৯ জুলাই ফোর্ট উইলিয়াম থেকে Government of Bengal-এর জুনিয়র সেক্রেটারিকে লেখা Officiating Director of Public Instruction-এর পত্রটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। এই চিঠিতে *কাব্যনির্ণয়* সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "the book has already achieved for itself a high reputation."[88] সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বাঙালি মানস থেকে একেবারে দূরে সরে গেলে এই 'high reputation' অর্জন করা হয়তো সম্ভব হত না। *কাব্যনির্ণয়* বাংলার নর্ম্যাল স্কুলগুলিতে পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তা বাংলা বি.এ পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল[89]। এর সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় বিভিন্ন পাঠ্যবই ও ব্যাকরণগ্রন্থে *কাব্যনির্ণয়*-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।[90]

---

[86] E.B. Cowell, "Advertisement," in *Kavya-Nirnaya or a Treatise on Rhetorical Composition in Bengali*, Lalmohan Vidyanidhi Bhattacharyya (Hoogly: Budhodoy Jantra, 1898), [2].

[87] বিদ্যানিধি, "প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন," ৴০।

[88] Letter from Officiating Director of Public Instruction, Bengal, 29th July, 1865. [Published in *Kavya-Nirnaya,* 1898]

[89] It… is used in the Bengali Normal Schools, and is selected as the text book for the Bengali course in the B.A Examination of 1868, and 1869. [source: Ibid]

[90] পদ্য পাঠ, পদ্য প্রকাশ ও বাঙ্গালা ব্যাকরণাদিতে এই পুস্তক হইতে ছন্দঃ ও অলঙ্কারের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে। [উৎস: বিদ্যানিধি, "সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন," ৶০।]

উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকার পাতাতেও অলংকারের গুরুত্ব নির্দেশের উদাহরণ মেলে। *নব্যভারত* পত্রিকায় আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত *ভারত-মঙ্গল*-এর অলংকার-প্রয়োগের প্রশংসা করে বলা হয়— "কাব্যরচনার মূলমন্ত্র সুখদ অলঙ্কার প্রয়োগ।"[91] এই পত্রিকাতেই অন্যত্র বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র কাব্যশাস্ত্রের অপরিহার্য অংশ হিসেবে অলংকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন[92]। *রামসুন্দর* শীর্ষক মহাকাব্যের সমালোচনায় বহু অলংকারের প্রয়োগকে ইতিবাচক গুণ হিসেবেই দেখা হয়েছে[93]। অলংকারকে মর্যাদা দেওয়ার এমন আরও দৃষ্টান্ত উনিশ শতকে বিরল নয়।

সুতরাং সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ বলে অলংকারবাদ ও অলংকারের জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা উনিশ শতকে অবজ্ঞার অন্ধকারে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি। উনিশ শতকের বাঙালি ইতিবাচক দিক থেকে হোক, বা নেতিবাচক, অলংকারবাদকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার সাহিত্যচিন্তায়।

---

[91] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: ভারত মঙ্গল— পূর্ব্বখণ্ড— আনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৫২১।

[92] বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১)," *নব্যভারত* ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ১৮৩।

[93] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "সুন্দর দেব বৈদ্য," *নব্যভারত* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ): ৩২৯।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

> The Kavya-Prakasa of Mammata is one of the classic works on Sanskrit Poetics and Rhetoric which has always maintained a great authority and popularity throughout India.[1]

Some Problems of Sanskrit Poetics গ্রন্থে সুশীলকুমার দে-র এই মন্তব্য ভারতবর্ষে কাব্যতাত্ত্বিক হিসেবে মম্মটের বিপুল জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বপ্রাপ্তির কথা জানিয়ে দেয়। অন্যত্রও তিনি একইভাবে মম্মটের জনপ্রিয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন—

> The Kavya-Prakasa, consisting of ten Ullasas, traverses the whole field of Sanskrit Poetics… in only 143 Karikas and about 620 illustrations derived from various sources. As it combines the merit of fulness with that of conciseness, *it became one of the classic works on Sanskrit Poetics and Rhetoric which has always maintained a great authority and popularity throughout India*.[2]

কিন্তু এরই পাশাপাশি সুশীলকুমার দে বলেছেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যতখানি চর্চিত আর মুদ্রিত হয়েছেন মম্মট, বাংলায় নাকি সেই তুলনায় তিনি বেশ উপেক্ষিত।[3] বরং তাঁর মতে *কাব্যপ্রকাশ*-এর তুলনায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ-ই* বাংলায় বেশি সমাদৃত হয়েছে। মম্মটচর্চায় বাঙালির এই উপেক্ষা বা অনীহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া

---

[1] S.K De, "Mammata's Kavya-Prakasa," in *Some Problems of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1981), 108.

[2] S.K De, "Mammata and Allata," in *History of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1976), 154. [নজরটান আরোপিত]

[3] The Kavya-prakasa has not been so often printed in Bengal as it has been in other provinces of India where it is perhaps much more extensively studied; for in Bengal Visvanatha's Sahitya-darpana appears to be a more popular text book. [Source: S.K De, "Mammata's Kavya-Prakasa," 130.]

যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সপ্তম বর্ষে প্রকাশিত ‘নৈষধ সমালোচন’ প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধটির ফুটনোট অংশে লেখক বলেছেন—

> শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবিষয়ক একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া তদীয় মাতুল *সাহিত্যদর্পণকার মম্মট* তাঁহার অতি বুদ্ধি কিছু কমাইবার জন্য তাঁহাকে মাসকলাই খাইতে উপদেশ দিলেন।...[4]

বলা বাহুল্য, যে প্রাবন্ধিক মম্মটকে ‘সাহিত্যদর্পণকার’ বলে অভিহিত করেন তাঁর মম্মটবিষয়ক জ্ঞান নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। লেখকের দিক থেকে ভুলটি অনবধানতাবশত বলেও যদি ধরে নিই, তবে প্রশ্ন ওঠে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনার পরেও এই ক্রুটি সংশোধিত হয়নি কেন? এর সমতুল্য আরও একটি ক্রুটির কথা উল্লেখ্য। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র ষষ্ঠ ভাগের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর ‘অলঙ্কার-শাস্ত্র’ প্রবন্ধ। সেখানে অর্থালংকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দণ্ডীকে ‘কাব্যপ্রকাশকার’[5] অভিধা দেওয়া হয়েছে, যদিও এই অভিধার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন মম্মট।

বঙ্গদর্শন এবং *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র মতো মর্যাদাময় পত্রিকায় এত বড় ভুল দেখে সন্দেহ জাগে, এগুলি কি আদৌ অনবধানতাবশত, নাকি সম্পাদকদের ঔদাসীন্য অথবা অজ্ঞতাও কোথাও এর জন্য দায়ী! *বঙ্গদর্শন* এবং *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*— দুটিই উনিশ শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য-পত্রিকা বলেই সংশয় হয়, এই অনবধানতা কিংবা

---

[4] অজ্ঞাত, “নৈষধসমালোচন,” *বঙ্গদর্শন* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৪৫। [নজরটান আরোপিত]

[5] কাব্যপ্রকাশকার দণ্ডী বলেন, যে কোন প্রকারে সাদৃশ্য প্রতীতি হইলেই উপমালঙ্কার হইবে। [উৎস: শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, “অলঙ্কার-শাস্ত্র,” *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ২১৯।]

ঔদাসীন্য হয়তো বা মম্মট সম্পর্কে উনিশ শতকের সামগ্রিক উপেক্ষারই এক খণ্ডচিত্র তুলে ধরে।

তবে এই কথাও ঠিক যে, এটি একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণমাত্র। এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকের মম্মট-বিষয়ক মনোভাবকে যাচাই করা সম্ভব নয়। মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর যেসব গুণের পরিচয় আমরা পাই, তার প্রেক্ষিতে মনে হয় উনিশ শতকের বাংলাতেও বেশ সমাদৃত হওয়ারই কথা ছিল এই গ্রন্থের। *কাব্যপ্রকাশ*-কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল তার স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা, সুবিন্যস্ত যুক্তিক্রম এবং পূর্বসূরিদের তাত্ত্বিক মতগুলিকে একত্রিত করে তুলে ধরার প্রবণতা[6]। তাছাড়া অলংকারবাদ ও রীতিবাদের পুরোনো ধারা ছেড়ে ধ্বনিবাদ ও রসবাদের পথে যে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, তার নান্দী যেন ঘোষণা করেছিল মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*।[7]

এখন, এই গুণগুলির বেশ কয়েকটি উপস্থিত ছিল বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও। সুসংহত যুক্তিপরম্পরা, সম্পূর্ণতা আর রসতত্ত্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি

[6] ...its value consists not in its originality but in the *orderly, concise and clear discussion of the main issues of Sanskrit Poetics; and his definition as well as general treatment attempts to cover almost all the field of thought traversed by his predecessors*. He… shows himself familiar with the works of almost all the distinguished writers on Poetics who preceded him. The great popularity and authority which the Kavya-prakasa has always enjoyed… must be explained as due not to any creative genius or remarkable novelty of treatment, but to the *systematic and lucid…working out of the already recognized stock of ideas*… [Source: S.K De, "Mammata's Kavya-Prakasa," 125-26.] (নজরটান আরোপিত)

[7] It sums up in itself all the activitics that had been going on for centuries in the field of Poetics, while *it becomes itself a fountain-head from which fresh streams of doctrines issue forth*. [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, "উপক্রমণিকা," *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ব।] (নজরটান আরোপিত)

সাহিত্যদর্পণঃ-কে উনিশ শতকের বাঙালির কাছে করে তুলেছিল সবচেয়ে আদৃত তত্ত্বগ্রন্থ[8]। তাহলে উনিশ শতকের বাঙালির কাছে কেন উপেক্ষিত রইলেন মম্মট?

এই প্রশ্নের সাপেক্ষে আমরা দেখে নেব উনিশ শতকে মম্মট সত্যিই উপেক্ষিত ছিলেন কি না। যে প্রবন্ধে সুশীলকুমার দে বলেছেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বাংলায় মম্মট-চর্চা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, সেই প্রবন্ধেই তিনি জানিয়েছেন,

> …the work of Mammata was studied extensively in Bengal is indicated not only by popular printed commentary of Mahesvara Nyayalamkara Bhattacarya, but also by a large number of commentaries written by well-known writers of Bengal, which have not yet been printed.[9]

সুতরাং সুশীল কুমার দে-র মত অনুসারে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম হলেও বাংলায় মম্মটের চর্চা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। মধ্যযুগের বাংলার সেই মম্মট-চর্চার কোনও দূরপ্রসারী ছাপ উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্যবিষয়ক বা সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় পড়েছিল কি না, এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অংশে তা দেখে নেওয়া হবে।

৩.১ নৈষধের কাহিনিতে মম্মটভট্ট

> শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা করিয়া স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মটভট্ট, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার অলঙ্কার গ্রন্থের দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত

[8] পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত

[9] S.K De, “Mammata’s Kavya-Prakasa,” 130.

> পাইলে, আমায় এত পরিশ্রম হইত না। এক গ্রন্থ হইতেই সমুদায় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।[10]

নৈষধচরিত সম্পর্কে এই ‘অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী’-র উল্লেখ করেছেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*-এ। যদিও বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য ছিল নৈষধচরিতের পরিচয় দেওয়া, কিন্তু একজন সংস্কৃত আলংকারিকের নামও এসে পড়েছে এই প্রসঙ্গে। প্রায় অনিবার্যভাবেই। তিনি হলেন কাব্যপ্রকাশকার মম্মট। ‘অনিবার্যভাবে’ শব্দটি ব্যবহারের কারণ, উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক রচনায় বারেবারেই ফিরে এসেছে নৈষধ-সম্পর্কিত এই anecdote আর তারই সূত্র ধরে নৈষধকারের মাতুল মম্মটও চলে এসেছেন উনিশ শতকের সাহিত্যিক আলোচনার পরিধিতে। শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন *নব্যভারত* পত্রিকার নবম বর্ষে ‘শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য’ নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানে নৈষধের অতিশয়োক্তি, দুষ্ক্রম্যতা প্রভৃতি দোষের কথা বিবৃত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাহিনিটিরই যেন অবিকল প্রতিধ্বনি করেছেন—

> ...এই প্রকারের দোষ নৈষধে অনেক আছে। এ সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতিও আছে। যথা,— নৈষধকার প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি নৈষধচরিত রচনা করিয়া মাতুলকে দেখাইলে উক্ত ভট্ট বলিয়াছিলেন, বাপু, কিছুদিন পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি পাইলে আমার বড় উপকার হইত, কেননা কাব্যপ্রকাশে দোষ পরিচ্ছেদ লিখিবার কালে আমাকে বিস্তর কাব্য অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে,

---

[10] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, “নৈষধচরিত,” ‘সাহিত্যশাস্ত্র,’ *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, সম্পা. মদনমোহন কুমার (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৭), ১০৩-১০৪।

> পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি হস্তগত হইলে এক গ্রন্থ হইতে সমুদয় উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।[11]

বঙ্গদর্শন পত্রিকার পথ-চলা যখন থেকে শুরু হয়েছিল, সেই সূচনার বছরেই 'শ্রীহর্ষ' নামে একটি প্রবন্ধে রামদাস সেন বিদ্যাসাগর-কথিত কাহিনিটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন—

> তাঁহার মাতুল প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার "নৈষধ" "কাব্য প্রকাশ" রচনার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইত, তাহা হইলে তিনি এক নৈষধের শ্লোক লইয়া সমুদায় দোষ পরিচ্ছেদটি লিখিতেন।[12]

আবার *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সপ্তম বর্ষে 'নৈষধসমালোচন' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে লেখক ফুটনোট অংশে মম্মট সংক্রান্ত যে-দুটি কাহিনি শুনিয়েছেন, তার মধ্যে একটি ওই একই কাহিনির প্রতিধ্বনি—

> শ্রীহর্ষ নৈষধ রচনা করিয়া কেমন হইয়াছে দেখিবার জন্য মামাকে দিলেন। মামা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, 'দেখ বাপু, যদি বইখানি কিছু আগে লিখিতে তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হইত।' ভাগনে কহিলেন, "কিসে?" মামা কহিলেন "তাহা হইলে আমার দোষ পরিচ্ছেদের উদাহরণ খুঁজিতে হইত না।"[13]

সদ্য-তারুণ্যের প্রতিস্পর্ধায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'কুপিত-কপি-কপোল'-এর প্রসঙ্গ টেনে এনে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর বিশেষ এক স্থানের দোষ উল্লেখ করেছিলেন[14]। এর থেকে আরও কয়েক পা এগিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, সংস্কৃত

---

[11] শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, "শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য," *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৬৫০-৫১।

[12] রামদাস সেন, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৫৮২।

[13] অজ্ঞাত, "নৈষধসমালোচন," *বঙ্গদর্শন* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৪৫।

[14] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ১৩।

আলংকারিকরা কাব্যের যে সব দোষের উল্লেখ করছেন, *মেঘনাদবধ কাব্য* খুঁজলে নাকি তার অধিকাংশই পাওয়া যেতে পারে।[15] এই প্রসঙ্গে আবারও এসেছে নৈষধকারের সেই কাহিনি আর মম্মটভট্টের কথা—

> প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া, তাঁহার মাতুল কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট ভট্টকে দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্ব্বে রচিত হইলে আমাকে আর আমার অলঙ্কারের দোষ-পরিচ্ছেদ লিখিবার সময়ে নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না; এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।" মম্মট-ভট্ট নৈষধ কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদ-বধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন অন্বেষণ করিলে তাহার প্রত্যেকটিই ইহাতে লক্ষিত হইবে।[16]

---

[15] যদিও তিনি *মেঘনাদবধ কাব্য*-কে 'বাঙ্গালা ভাষার মহামূল্য রত্ন' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

[16] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদবধ-চিত্র," *নব্যভারত* ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৮৪। পরবর্তীকালে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই প্রবন্ধটিই যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে উদ্ধৃত অংশটি ছিল নিম্নরূপ:

> প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার, তাঁহার মাতুল সুপ্রসিদ্ধ কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট ভট্টকে তাঁহার রচিত কাব্য দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে আমার অলঙ্কারের দোষ-পরিচ্ছেদ লিখিবার সময়ে আমাকে নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না; এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।" মম্মট-ভট্ট নৈষধ কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদ-বধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্বেষণ করিলে তাহার প্রত্যেকটীই ইহাতে লক্ষিত হইবে।

[উৎস: যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদবধকাব্য," মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫), ২৮৯।]

লক্ষণীয়, এখানে সমস্ত সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রতিনিধি হিসেবেই যেন মম্মটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৩.২ 'নৈষধকার' শ্রীহর্ষের পরিচয় ও কালনির্ণয়-বিতর্কে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

এই নৈষধকারের পরিচয়ও যথেষ্ট রহস্যে আবৃত। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, নৈষধের রচয়িতা 'শ্রীহর্ষ' নামধারী এক কবি। এও জানা যায় শ্রীহর্ষের মাতুল ছিলেন মম্মট। এই শ্রীহর্ষের পরিচয় ও কালনির্ণয়ের সূত্রেও উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় জরুরি হয়ে উঠেছিল মম্মটের নাম। উদাহরণ হিসেবে *নব্যভারত*-এর ষোড়শ বর্ষে প্রকাশিত 'উদয়ন আচার্য' নামে একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

> শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর ও মাতার নাম মামল্ল দেবী। এই মামল্ল দেবী সুবিখ্যাত কাশ্মীরী আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের ভগিনী ছিলেন। মম্মট ভট্ট 'কাব্য প্রকাশ' নামে প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[17]

রত্নাবলী, নাগানন্দ প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা হিসেবে ইতিহাসে যে শ্রীহর্ষের কথা পাওয়া যায় তিনি এবং নৈষধকার শ্রীহর্ষ— দুজন একই ব্যক্তি কি না, এই প্রশ্ন ঘিরে উত্তাল হয়েছিল উনিশ শতকের একাধিক পত্রিকা। আর সেই উত্তপ্ত বিতর্কে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা বারেবারেই ফিরে গেছেন মম্মট রচিত একটি বিশেষ শ্লোকের কাছে।[18] সেই শ্লোকের একটি পাঠভেদে 'ধাবক' নামটির উল্লেখ আছে। অন্যটিতে নেই। যাঁরা

[17] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "উদয়ন আচার্য্য," *নব্যভারত* ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ৪৭৬।

[18] শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্ / শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং

প্রথম পাঠান্তরটি গ্রহণ করেছেন তাঁরা মনে করেন ধাবক নামধারী কবিই[19] *রত্নাবলী*-র প্রকৃত রচয়িতা, শ্রীহর্ষ নন। মম্মটের *কাব্যপ্রকাশে* পাওয়া এই শ্লোক থেকে উনিশ শতকের পণ্ডিতরা অনুমান করছিলেন, সেই প্রাচীন যুগেও Ghost Writing-এর ঘটনা নিতান্ত বিরল ছিল না! টাকা দিয়ে আরও অনেক কিছুর মতোই কবিযশকেও কিনে নিতে পারতেন ক্ষমতার অধিকারী শাসকেরা।

তাই শ্রীহর্ষ নিজে আদৌ *রত্নাবলী* লিখেছিলেন না অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিজে কবিখ্যাতির অধিকারী হতে চেয়েছিলেন, সে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। অবশ্য মম্মটের শ্লোকের পাঠান্তর থাকার ফলে *রত্নাবলী*-র রচয়িতা যে আসলে কে সেই নিয়ে কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়েছিলেন সেই সময়কার সংস্কৃতজ্ঞরা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—

> এরূপ প্রবাদ আছে ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ওই দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন।[20]

এই সূত্র ধরেই বিদ্যাসাগর জানান— “প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।” সুতরাং *রত্নাবলী*-রচয়িতার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে রীতিমতো মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল পণ্ডিতমহলে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে *সাহিত্য* পত্রিকায় প্রকাশিত সতীশচন্দ্র রায়ের ‘রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ’ শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঘনিয়ে ওঠা

---

[19] *সাহিত্যসার* প্রভৃতি গ্রন্থে ধাবকের নামোল্লেখ আছে। ধাবক মন্ত্রবলে কবিত্বশক্তি লাভ করেও অতি দরিদ্র ছিলেন। পরে এক শত সর্গে “নৈষধীয়” রচনা করে শ্রীহর্ষের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ নিষ্কর ভূমি লাভ করেন।

[20] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৯।

বাদানুবাদের আঁচ পাওয়া যায়। এবং সেই সূত্রে আবারও উঠে আসে *কাব্যপ্রকাশ*-এর প্রসঙ্গ।[21]

আর এই বিতর্কের বিস্তৃত চেহারা দেখতে পাওয়া যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার পাতায়। ‘শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং’– মম্মটের এই পাঠান্তরটি যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মতে *রত্নাবলী*-র রচয়িতা ছিলেন বাণভট্ট অথবা শ্রীহর্ষ। *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বছরে ‘শ্রীহর্ষ’ নামে প্রবন্ধে রামদাস সেন নৈষধকার শ্রীহর্ষ এবং *রত্নাবলী*-রচয়িতাকে দুজন আলাদা ব্যক্তি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন।[22] তবে তাঁর মতে *রত্নাবলী*-রচয়িতা ধাবক নন, কাশ্মীরাধিপতি হর্ষরাজ। ‘শ্রীরাজ’ নামধারী এক সমালোচকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে রামদাস সেন *বঙ্গদর্শন*-এর তৃতীয় বর্ষে যে প্রবন্ধ লিখলেন তাতে আবারও রইল কাব্যপ্রকাশকারের অমোঘ উল্লেখ–

> বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা স্বীকার করিয়াছেন[।] এক *“কাব্যপ্রকাশের” প্রমাণ বেদবৎ মান্য করিয়া শ্রীহর্ষের কীর্ত্তি লোপ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। ... মম্মটাচার্যের “শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্” বাক্য আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।*[23]

---

[21] ‘কাব্যপ্রকাশনিদর্শন’ নামে কাব্যপ্রকাশের টীকায় ‘শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং’ এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ... ন্যায়রত্ন মহাশয়ই উল্লেখ করিয়াছেন, কাব্যপ্রকাশের টীকা “কাব্যপ্রকাশনিদর্শনে” শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং এইরূপ পাঠ কল্পিত হইয়াছে। ... হল সাহেব এই পাঠ প্রদর্শনেই অপর কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে বাণভট্টকে রত্নাবলীকার বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ... “কাব্যপ্রকাশের” রচয়িতা মম্মটভট্ট যে কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর বুলার সাহেব কাশ্মীর হইতে এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। [উৎস: সতীশচন্দ্র রায়, “রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ,” *সাহিত্য* ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ৭৩৭]

[22] রামদাস সেন, “শ্রীহর্ষ,” *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৫৮২।

[23] রামদাস সেন, “শ্রীহর্ষ,” *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৫। [নজরটান আরোপিত]

অন্যদিকে *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় 'জটিল সন্ন্যাসী' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে *রত্নাবলী* রচয়িতা হিসেবে শ্রীহর্ষকেই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে *আর্য্যদর্শন*-এর প্রবন্ধকারকে প্রথমেই ব্যবহার করতে হয়েছে *কাব্যপ্রকাশ*-এর উদ্ধৃতি। রামদাস সেনের মতো তিনিও *কাব্যপ্রকাশ*-এ উল্লিখিত 'শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্' শ্লোকটির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—

> হর্ষদেব সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, অনেক অর্থ দিয়া ধাবকের নিকট হইতে উক্ত দৃশ্যকাব্য দুখানি (নাগানন্দ ও রত্নাবলী) লইয়া আপনার নামে প্রচারিত করেন এবং সেই সময়ে উক্ত নাটক ও নাটিকার প্রথমে—"শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপোষ্য গুণগ্রাহিণী।" এই শ্লোকটী লিখিত হইয়াছে। "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং।" মম্মটভট্টের এই কথা যথার্থ কি পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কারণ হর্ষদেব মূর্খ ছিলেন না। তিনি সৎকবি ও বহুভাষায় নিপুণ ছিলেন, এ কথা রাজতরঙ্গিণীর অষ্টম তরঙ্গে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে... [24]

আবার 'শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্' এই পাঠভেদের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন *রত্নাবলী*-র আসল লেখক ধাবক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[25] সম্ভবত এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত ছিলেন, কারণ রামদাস সেনের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে *বঙ্গদর্শন*-এর তৃতীয় বর্ষে তিনি ধাবকের নামই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে

[24] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ৬৩।

[25] *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় 'শ্রীরাজ' নামে তাঁর 'শ্রীহর্ষ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধই পরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *নানা প্রবন্ধ*-এর অন্তর্গত হয়। [উৎস: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *নানা প্রবন্ধ* (কলকাতা: নব গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৮৮৫), ৬৫।

উল্লেখ করলেন। সেজন্য তাঁকে অবশ্য *কাব্যপ্রকাশ*-এরই দুটি টীকার (মহেশ্বর এবং বৈদ্যনাথ) সাহায্য নিতে হয়েছিল।[26]

বস্তুত, *রত্নাবলী*-র রচয়িতা হর্ষ নিজে বা বাণভট্ট বা ধাবক[27] যিনি-ই হোন না কেন, তিনি যে উনিশ শতকের সংস্কৃত-চর্চার আবহে মম্মটকে আলোকিত ঔজ্জ্বল্যে এনে ফেলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু *রত্নাবলী*-রচয়িতা ও শ্রীহর্ষের প্রকৃত পরিচয় সংক্রান্ত বিতর্কেই নয়, উনিশ শতকে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কালানুক্রমিক সালতামামি নির্মাণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল মম্মটের। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে *কাব্যপ্রকাশ*-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন অলংকারগ্রন্থের কালানুক্রমিকতা বোঝাতে গিয়ে *কাব্যপ্রকাশ*-কে তিনি যুগবিভাজনের সূচক হিসেবে নিয়েছিলেন। *কাব্যপ্রকাশ*-এর

---

[26] শ্রীহর্ষ একজন দিগ্‌বিজয়ী রাজা। তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্য বিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। *কাব্য প্রকাশকার লিখিয়াছেন,*

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্"

শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবক প্রভৃতির ধন প্রাপ্তি হইয়াছিল।

প্রকাশাদর্শে [কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা] মহেশ্বর বলেন,

"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নামা কৃত্বা বহু ধনং লব্ধং।"

কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাস্য কবি বহুধনং লভেদিতি প্রসিদ্ধং।"

[উৎস: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ২০।] (নজরটান আরোপিত)

[27] প্রসিদ্ধি আছে ধাবক নামক একজন কবি ছিলেন। তিনি নাগানন্দ নাটক ও রত্নাবলী নাটিকা রচনা করেন। ধাবক কবি দরিদ্র ছিলেন, এই জন্য তিনি ঐ কাব্যদ্বয় মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের নিকটে বিক্রয় করিলেন। শ্রীহর্ষ ঐ কাব্যদ্বয় ক্রয় পূর্ব্বক আপনার নামে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতেই ধাবক কবি বহুল ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। [উৎস: দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪০৬-৭।]

আগে এবং *কাব্যপ্রকাশ*-এর পরে রচিত— এইরকমভাবে সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থগুলির শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল।[28]

৩.৩ অন্যান্য ক্ষেত্রে মম্মট ও *কাব্যপ্রকাশ*-এর উল্লেখ

কিন্তু উনিশ শতকীয় বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চার পরিধিতে মম্মটের গুরুত্ব কি শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস ও কালনির্ণয়-সংক্রান্ত বিতর্কনিষ্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? তা নয়। উনিশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকারসংক্রান্ত গভীরতর তাত্ত্বিক আলোচনাতেও মম্মট স্থান পেয়েছেন।

কাব্য কেন লেখা হয়, কাব্য লিখে কী ফল হয়, কোন কোন বৈশিষ্ট্য কাব্যের কাব্যত্বের নির্ণায়ক— এ জাতীয় দার্শনিক প্রশ্নে উনিশ শতকের বাঙালিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন মম্মট, সেই প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে এই অভিসন্দর্ভে দেখে নেওয়া হবে কাব্য-সংরূপ, কাব্যের চরিত্র, কাব্যের দোষ-গুণ প্রভৃতি প্রয়োগগত দিকগুলিতে মম্মটের তত্ত্ব দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল উনিশ শতকের বাঙালি।

বীরাঙ্গনা কাব্য-এর 'শকুন্তলা পত্র'-এর সমালোচনাকালে বীরেশ্বর গোস্বামী শকুন্তলা চরিত্রে মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ খুঁজতে গিয়ে *কাব্যপ্রকাশ*-এর সংজ্ঞাকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> আলঙ্কারিক নির্দ্ধারিত (৪) "মুগ্ধা নায়িকার" লক্ষণ মাইকেলের
> শকুন্তলা যতটা সার্থক করিয়াছেন – কালিদাসের সেরূপ নহে।

---

28 *কাব্যপ্রকাশ*-এর আগে— *বামনসূত্রবৃত্তি, কাব্যাদর্শ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ব্যক্তিবিবেক, অভিনবভারতী* প্রভৃতি। *কাব্যপ্রকাশ*-এর পরে— অপ্পয়দীক্ষিতের *চিত্র-মীমাংসা, কুবলয়ানন্দ, সাহিত্যদর্পণ*, গোবিন্দ ঠক্কুরের *কাব্যপ্রদীপ*, জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*, কেশবমিশ্রের অ*লঙ্কারশেখর*, প্রভাকরের *অলঙ্কাররহস্য*। [উৎস: শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১৮৯।]

প্রথম যৌবনাবতীর্ণা রতৌ বামা
কথিতা মৃদুশ্চযানে সা নারী মুগ্ধেতি।
ইতি কাব্যপ্রকাশে।[29]

ভবভূতির কাব্যে সংস্কৃত আলংকারিকরা যেসব দোষ লক্ষ করেছেন সেগুলি নিয়ে আলোচনা-সূত্রেও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মম্মটের দোষ-পরিচ্ছেদকেই অবলম্বন করেছেন—

> পরশুরাম রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন ও ইত্যবসরে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল, “রাজন্! কলঙ্কমোচনের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করুন।” পরশুরামের অনুমতি লইয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। *আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট এইরূপ স্থলকে অকাণ্ডচ্ছেদ নামক দোষের উদাহরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*[30]

একইভাবে *ভারতী*-তে প্রকাশিত ‘রামায়ণ’-এর সমালোচনায় সমালোচক *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পাশাপাশি *কাব্যপ্রকাশ*-এর দোষ-পরিচ্ছেদের উল্লেখ যেভাবে করেছেন, তাতে অনুমান করা যায়, উনিশ শতকে কাব্যের দোষ-গুণ সম্পর্কে জানতে এই দুটিই ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টেক্সট—

> আমরা মনে করি যে, বাল্মীকির সময়ে সংস্কৃত ভাষা এক হিসাবে নিতান্ত সরল ছিল। তখন ভাষার ‘খুঁটিনাটী’ ধরা লোকের তাদৃশ অভ্যাস হয় নাই। ভাষা যত বেশীকাল অনুশীলিত হয়, ততই লোকে তাহার ‘খুঁটিনাটী’ ধরিতে আরম্ভ করে। *তখন ক্রমে ক্রমে লোকে ভাষার সেই সমস্ত দোষ ধরিতে শিখে, যাহা সাহিত্য-দর্পণ ও কাব্যপ্রকাশের সপ্তম পরিচ্ছেদে সবিস্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে।* যথা, কাছাকাছি একটী শব্দ দুবার প্রয়োগ করিও না (কথিত পদত্ব), শুনিতে কঠোর এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিও না (শ্রুতিকটু), যাহার

---

[29] বীরেশ্বর গোস্বামী, “বীরাঙ্গনা কাব্য,” *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ১৫৩। [নজরটান আরোপিত]

[30] সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, “ভবভূতি,” *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ?। [নজরটান আরোপিত]

শ্রবণে কুৎসিতভাব মনে আইসে এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিও না (অশ্লীল)।[31]

অর্থাৎ, মম্মটের দোষ-পরিচ্ছেদে কাব্যের যে-সব দোষের উল্লেখ আছে (অকাণ্ডচ্ছেদ, শ্রুতিকটু প্রভৃতি) সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন উনিশ শতকের সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা। আবার, *ভারতী (ও বালক) পত্রিকা*-য় প্রকাশিত রাজশেখরের নাম-সংবলিত অলংকার গ্রন্থের তালিকায় *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, সাহিত্যদর্পণঃ* প্রভৃতি বইয়ের সঙ্গে *কাব্যপ্রকাশ*-এর নামও পাওয়া যায়।[32] এর থেকে অনুমান করে নেওয়াই যায়, অন্তত একাধিক আগ্রহী ব্যক্তির মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃত ধারণা ছিল। এ বিষয়ে চর্চার ভিত যতদূর পোক্ত থাকলে, দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনও বিশেষ কবির নামোল্লেখ *কাব্যপ্রকাশ*-এ আছে কি না তা সহজেই বলে দেওয়া যায়, তাঁদের মম্মট-চর্চা ততদূর বিস্তৃত ছিল।

মম্মটের বইয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল লেখক কর্তৃক কাব্যের দোষ-গুণ, রীতি ও রসের আলোচনা। বিশেষত রসের আলোচনা। মম্মটের দোষ-গুণের বিবরণ কীভাবে উনিশ শতকের বাঙালিকে প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে। তাঁর রীতি ও রস সংক্রান্ত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-য় প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রচিত ‘অলঙ্কার-শাস্ত্র’ প্রবন্ধে। এখানে প্রাবন্ধিক বিভিন্ন সংস্কৃত আলংকারিকের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। ‘দ্বাদশ

---

[31] অজ্ঞাত, “রামায়ণ,” *ভারতী* ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ): ৩৭৫। [নজরটান আরোপিত]

[32] রাজশেখরের কবিতা ও নাম দশরূপ, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ক্ষীরস্বামীকৃত অমরটীকা, মুকুটকৃত অমরটীকা, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ ... প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিদ্যমান আছে। [উৎস: রামদাস সেন, “মহাকবি রাজশেখর,” *ভারতী ও বালক* ১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৪৭।]

শতাব্দীতে বিরচিত' 'দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত'[33] *কাব্যপ্রকাশ*ও উপেক্ষিত হয়নি তাঁর রচনায়। বরং যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। *কাব্যপ্রকাশ*-এ কাব্যের লক্ষণ, কাব্যের রস ও রীতি সংক্রান্ত যে সব মৌলিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে তার সহজবোধ্য সারাংশ এই প্রবন্ধে তুলে দিয়েছিলেন শরচ্চন্দ্র।[34]

৩.৪ কাব্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে মম্মট

৩.৪.১ কাব্যের সংজ্ঞা

মম্মট সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা ছিল বলেই যখন কাব্যের সংজ্ঞা, লক্ষণ, রস-রীতি, কবিপ্রকৃতি, কাব্যের উপযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে দার্শনিক-তাত্ত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে উনিশ শতকের বাঙালি, সে প্রায়শই *কাব্যপ্রকাশ*-এর শরণাপন্ন হয়েছে। প্রথমেই আসা যাক কাব্যসংজ্ঞা প্রসঙ্গে। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' প্রবন্ধে মম্মটের কাব্যসংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে কাব্যে অলংকার থাকার অপরিহার্যতার দিকটি কীভাবে নস্যাৎ করেছেন মম্মট— শরচ্চন্দ্র গভীর বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই দিকটি তুলে ধরেছেন। ভোজরাজের কাব্যসংজ্ঞার সঙ্গে মম্মটের তুলনাও করা হয়েছে—

---

33 "কাব্যপ্রকাশ" দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। ইহার প্রণেতা কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ মম্মটভট্ট। ইনি নৈষধচরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষের মাতুল। [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ১৮৯।]

34 ... কাব্যপ্রকাশকারের মতে রস আট প্রকার যথা;—
শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত।
তিনি আরও একটি রস স্বীকার করিয়াছেন উহার নাম শান্ত। [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ১৯৯।]
রীতি। কাব্যে পদনিচয়ের সংস্থানপ্রণালীই রীতি নামে অভিহিত। ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। ...কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট রীতিবিষয়ে বামনের মত (রীতি তিনটি – বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী) অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। [উৎস: শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ২০৯।]

> অপর আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যের ঐরূপ লক্ষণ [অর্থাৎ, ভোজরাজ কথিত লক্ষণ। ভোজের মতে, কাব্য হবে নির্দোষ, গুণবিশিষ্ট, অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, রসযুক্ত] স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন; —
>
> "দোষহীন গুণযুক্ত শব্দ এবং অর্থ, অলঙ্কারযুক্তই হউক অথবা অলঙ্কারবিহীনই হউক উহাই কাব্য।" [তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি] মম্মটভট্টের মতে কাব্য তিন প্রকার যথা;— ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ ও অধমকাব্য।[35]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র পাশাপাশি *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' প্রবন্ধেও মম্মটের কাব্যসংজ্ঞার উল্লেখ আছে—

> [দণ্ডী নির্দেশিত] এই লক্ষণ অনুসারে ভাষাচ্যুতি-প্রভৃতি-দোষ-যুক্ত বাক্যও কাব্য হইতে পারে। এই আশঙ্কাতে মম্মটভট্ট অন্য প্রকার কাব্য লক্ষণ করিয়াছেন। তাহা এই—
>
> "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতি পুনঃক্কাপি"।
>
> স্পষ্টরূপে কোন অলঙ্কার থাকুক বা নাই থাকুক দোষ-শূন্য অথচ গুণযুক্ত যে শব্দ এবং অর্থ তাহাই কাব্য।[36]

এই প্রবন্ধে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ উল্লিখিত কাব্যসংজ্ঞার চেয়ে মম্মটের সংজ্ঞার প্রতিই লেখকের অধিক আস্থা ব্যক্ত হয়েছে। *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুসারে, রসাত্মক বাক্যই কাব্য[37]। *আর্য্যদর্শন*-এর প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞা অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। কারণ, সেখানে 'বাক্য' শব্দটির উল্লেখ দৃশ্যকাব্যের অভিনেয় (non-verbal) অংশগুলিকে কাব্যপরিধির অন্তর্গত করে না। নটের অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি কাব্যত্বের মর্যাদা পায় না। এই

---

[35] শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," ১৯৭।

[36] দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৩৮৯-৯০।

[37] বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্। [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১৭।]

দোষ থেকে মম্মটের কাব্যসংজ্ঞা মুক্ত বলে মনে করেছিলেন 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক।

জয়গোপাল গোস্বামী রচিত অলংকার-বিষয়ক বই *সাহিত্যমুক্তাবলী* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। এটির কাঠামো সম্পূর্ণভাবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুসারী। তাই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ যেভাবে মম্মটের কাব্যসংজ্ঞাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা আছে,[38] তাকেই অনুসরণ করেছেন জয়গোপাল। যদিও তিনি বিশ্বনাথের মতোই মম্মটের নামোল্লেখ করেননি, তবু তাঁর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি যে মম্মটভট্টেরই— এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না—

> কেহ কেহ বলেন যে, "যে বাক্য দোষ রহিত, সগুণ, ও সালঙ্কার তাহার নাম কাব্য" কিন্তু একথা সম্ভবপর নহে, কারণ, যেসকল বাক্যের কোন কোন অংশে দোষ আছে, কোনরূপেই তাহার কাব্যত্বের হানি হইতে পারে না;...[39]

৩.৪.২ কাব্যরচনার উদ্দেশ্য

কাব্যপ্রকাশ-এর প্রথমেই কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মম্মটভট্ট বলেছিলেন,

> "কাব্যং যশসেহর্থকৃতে
> ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে
> কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।"

---

[38] তৎ কিং স্বরূপং তাবৎ কাব্যম্ ইত্যপেক্ষায়াং কশ্চিদাহ – "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি" – ইতি।
তাহা হইলে "কাব্যের স্বরূপ কি?"— এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ [কাব্যপ্রকাশকার মম্মট ভট্ট] বলেন:— দোষবিহীন, গুণযুক্ত, কখনও বা অনলংকৃত শব্দ ও অর্থ হইতেছে কাব্য। [উৎস: মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ৬।]

[39] জয়গোপাল গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী: অলঙ্কার— প্রথম ভাগ* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ), ২।

—কাব্য রচিত হয় যশের নিমিত্ত, অর্থের নিমিত্ত, লোক-ব্যবহার পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, অমঙ্গল বিনাশের নিমিত্ত, সদ্যঃ পরনির্বৃতি বা পরম আনন্দ লাভের নিমিত্ত এবং কান্তা-সম্মিত উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্ত।’[40]

মম্মট-কথিত এই শ্লোক থেকে কাব্যরচনার ছটি ফলের কথা পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

১) যশ লাভ

২) অর্থলাভ

৩) মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ

৪) অমঙ্গল দূরীকরণ

৫) পরম আনন্দলাভ

৬) পাঠককে উপদেশ দান (যা স্ত্রী-র উপদেশের মতোই মধুরভাবে পরিবেশিত)

মম্মট-বর্ণিত এই ফলগুলির কথা উনিশ শতকের একাধিক সাহিত্যসমালোচনামূলক লেখাতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি’ প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘সংস্কৃত আলঙ্কারিক’দের বর্ণিত কাব্যের উপদেশদানের যে কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন, তা আর অন্য কারও নয়, মম্মটেরই উক্তি। *কাব্যপ্রকাশ*-এর প্রথম উল্লাসে উল্লিখিত কাব্যের ছটি প্রয়োজনের মধ্যে ‘কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে’ শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়। বেদ প্রভুর মতো আচরণ করে তাই বেদ প্রভুসম্মিত, পুরাণ বন্ধুর মতো যুক্তিসহ সদুপদেশ দেয়, তাই পুরাণ মিত্রসম্মিত এবং কাব্য হল পত্নীর মতো। সে কেবল উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না,

[40] সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, *কাব্যালোক* (কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), ১২।

যথাযথ পথে প্রবৃত্তও করে। তাই কাব্য কান্তাসম্মিত।[41] মম্মটের এই ভাবনারই প্রত্যক্ষ প্রভাব পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়—

> সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন। যেটী বাহির করেন সেটি কিন্তু অমোঘ।[42]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সমালোচনায় বলেছিলেন—

> সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যরচনা ও আলোচনার বহুবিধ সুফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাব্যরচনায় কবির যশোলাভ অর্থাগম অমঙ্গলশান্তি হয়; কাব্য আলোচনায় কাব্যামোদীর মধুর উপদেশ, লোকচরিতজ্ঞান এবং সদ্যঃ পরানির্বৃতি সাধিত হয়।[43]

এখানে কাব্যচর্চার যে সুফলের কথা বললেন হীরেন্দ্রনাথ, তা কি মম্মটের শ্লোকেরই অনুরণন নয়? মম্মটের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে 'সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে... কীর্ত্তিত' বলে যে কাব্যরচনার সুফলের যে তালিকা তিনি দিলেন, তা তাঁর মম্মটচর্চারই

---

[41] মম্মট ত্রিবিধ উপদেশের কথা বলিয়াছেন,— প্রভুসম্মিত আদেশ, সুহৃৎসম্মিত পরামর্শ ও কান্তাসম্মিত উপদেশ; বেদে থাকে প্রথমটি, পুরাণ-ইতিহাসে থাকে দ্বিতীয়টি; সৎ কাব্যে থাকে শেষটি। এই শেষটিতেই কান্তা সরসতা দ্বারা চিত্ত অভিমুখী করিয়া বুঝাইয়া দেন,... [উৎস: সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, "বস্তু ও বিভাব," *কাব্যালোক* (কলকাতা: এ মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ৩৪০।]

[42] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি," *বঙ্গদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৮৫। (পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটি *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত হয়। গ্রন্থপাঠে 'কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে' শ্লোকের সঙ্গে মম্মটভট্টের নাম উল্লিখিত আছে) [উৎস: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১), ৪৯০।]

[43] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, "কুরুক্ষেত্র: সমালোচনা," *সাহিত্য* ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৪৫১।

সচেতন বা অবচেতন অভিক্ষেপ। ‘সদ্যঃ পরানির্বৃতি’ শব্দবন্ধের মধ্যেও রয়েছে মম্মটের কাব্যসংজ্ঞার অনুরণন।

শুধু তাই নয়, *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল’ প্রবন্ধের রচয়িতাও মম্মটের এই সূত্রটি তুলে দিলেন। সঙ্গে বললেন, “মম্মটভট্টের সূত্র দেখিয়া কিছু কালিদাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু নানা গ্রন্থে উপরোক্ত গুণ সকল দেখিয়া তবে মম্মট কাব্যের লক্ষণ লিখিয়াছেন।”[44] ‘কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা’ প্রবন্ধে ‘কাব্যের প্রয়োজন’ তথা কাব্যপাঠের ফল আলোচনা করতে গিয়েও লেখক ‘দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য’ মম্মটের ওই একই শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিস্তারিতভাবে শ্লোকের অর্থগুলিও প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করলেন তিনি—

> সম্প্রতি কাব্যের প্রয়োজন বলা যাইতেছে। মম্মটভট্ট বলিয়াছেন।
>
> “কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃ
> পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।।”[45]

---

[44] কালীপদ ঘোষ, “কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল,” *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৪৩৯।

[45] কাব্যনির্ম্মাণ করিলে রচয়িতার যশ হয়।

যদিও যশোজনক অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে তথাপি কাব্য নির্ম্মাণের যশ সে সকল যশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।...

অপর প্রয়োজন। কাব্যনির্ম্মাণ করিলে ধন সম্পত্তি জন্মে। পূর্ব্বকালে কাব্যের দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে যশের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইত অর্থাৎ কবি কাব্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বকে যশোলিপ্সু অপর ব্যক্তির নিকট তাহা বিক্রয় করিতেন তিনি আপনার নামে ঐ কাব্য পৃথিবীতে প্রচার করিতেন, সুতরাং কাব্যের ক্রয় বিক্রয়কে এক প্রকার যশের ক্রয় বিক্রয়ই বলা যাইত ...কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপে কাব্য বিক্রয় করিতে হয় না। ...হয় পুস্তক বিক্রয় করিয়া, না হয় পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিয়াও প্রচুর ধন লাভ করা গিয়া থাকে।

কাব্যের অন্য প্রয়োজন পাপক্ষয়। অর্থাৎ উত্তম কাব্য দ্বারা যদি ঈশ্বরের স্তুতি করা যায় তবে তাহাতে পাপক্ষয় ও স্বর্গলাভ হয়। ...অতএব কাব্য নির্ম্মাণ এবং কাব্যের জ্ঞান উভয়ই পাপক্ষয় ও পুন্য লাভের কারণ।

৩.৪.৩ কাব্যের প্রকৃতি

কাব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে মম্মটের এক অবিস্মরণীয় উক্তি ছিল,

> নিয়তি কৃতি নিয়ম রহিতাং
> হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাং
> নবরস রুচিরাং নির্ম্মিতি
> মাদধতী ভারতী কবের্জয়তী।।

কবির দ্বারা সৃষ্ট কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা বোঝাতে গিয়ে ‘কবি ও কাব্য’ প্রবন্ধে এই শ্লোকেরই সাহায্য নিয়েছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—

> যে সকল মহাকবি সম্যক পর্য্যবেক্ষণকারী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাই আবার কল্পনাবলে অসীম বলীয়ান্ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই শক্তিই মহাকবিদিগের অস্ত্রস্বরূপ। এই শক্তিই তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড * এই শক্তি বলেই তাঁহারা অবাস্তব মানসিক পদার্থে বাস্তবত্ব বুদ্ধি উৎপাদন ও জড়জগতের পরিচ্ছেদ (Finiteness) ও অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করেন।... এই নিমিত্তই প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—
>
> “নিয়তি কৃতি নিয়মরহিতাংহ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাং।
> নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তী।।”

কাব্যের অন্য প্রয়োজন উৎকৃষ্ট প্রীতিলাভ। অর্থাৎ কাব্য নির্ম্মাণ করিলে অথবা কাব্য পাঠ পূর্ব্বক অর্থ বোধ করিলে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। ...কাব্য বোধের আনন্দ যে অন্যান্য মধুর পদার্থ উপভোগের আনন্দ অপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে আমদের সন্দেহ নাই।

কাব্য পর্য্যালোচনার অপর একটি ফল উপদেশ লাভ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কাব্যের তিন প্রকার অর্থ আছে। বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য, তন্মধ্যে ব্যঙ্গ্যার্থই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কাব্যের সেই ব্যঙ্গ্যার্থই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

...কবিরা কাব্য দ্বারা যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা সামান্য উপদেশের ন্যায় দুর্ব্বল নহে, তাঁহাদের উপদেশগুলি অন্তঃকরণে নিখাত হইয়া যায়। [উৎস: দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, “কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা,” *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪০৬-১১।]

> "ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়তি শক্তি দ্বারা নিয়তরূপা। অর্থাৎ ইহা কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন ও পরমাণ্বাদি উপাদানকারণসাপেক্ষ, ইহা দুঃখ-শোক-মোহাদিময়, ইহাতে ছয়টি মাত্র রস (কটু-তিক্ত-কষায়াদি) আছে। সেই রসের সকলগুলিই আবার সুস্বাদু নহে। কিন্তু কবিকৃত সৃষ্টি অনিয়তরূপ, কোন কারণ বিশেষের অনধীন, দুঃখশোকাদিস্পর্শশূন্য, কেবলমাত্র আনন্দময়ী ও নবরসবিশিষ্ট (শৃঙ্গার করুণ ইত্যাদি) সুতরাং ইহা ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।..."[46]

আবার, 'ভবভূতির প্রকৃতি' প্রবন্ধে কবিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে হুবহু একই উক্তিরই আশ্রয় নিতে হয়েছে বসন্তকুমার রায়কে—

> মম্মটভট্ট বলিয়াছেন, "ব্রহ্মার সৃষ্টি সতত একবিধ, কবির সৃষ্টি সতত অভিনব; কবির সৃষ্টি বিশুদ্ধ আনন্দময়; ব্রহ্মার সৃষ্টি পরমাণু ও কর্ম্ম সাপেক্ষ, কবির সৃষ্টি স্বাধীন; ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ষট্‌ রস, কবির সৃষ্টিতে নবরস; অতএব কবির ভারতীকে অভিবাদন করি...।"[47]

সুতরাং দেখা গেল, কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে উনিশ শতকের একাধিক সমালোচক মম্মটভট্টের তত্ত্বভাবনাকে গ্রহণ করেছেন।

৩.৪.৪ কাব্যের বাচ্য অর্থ ও ব্যঞ্জনা-প্রসঙ্গ

মম্মট তাঁর পূর্বসূরি প্রাচীন অলংকারবাদী, রীতিবাদীদের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত নতুন মতবাদ অর্থাৎ ধ্বনি ও রসবাদের প্রভাবও একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি তাঁর রচনায়। ধ্বনিবাদীদের 'ধ্বনি' সংক্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

---

[46] রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, "কবি ও কাব্য," *প্রচার: মাসিক পত্র ও সমালোচন* ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ), ১৫২-৫৩। ('কবি ও কাব্য' প্রবন্ধের পরবর্তী সংখ্যায় এই অংশটির উল্লেখ করে বলা হয়েছে "(কাব্যের) উপাদেয়তার কারণরূপে অনন্যপরতন্ত্রতা, নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য, হ্লাদৈকময়ত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছিলাম।") [উৎস: রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, "কবি ও কাব্য," *প্রচার: মাসিক পত্র ও সমালোচন* ৪র্থ বর্ষ, ১১-১২শ সংখ্যা (ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯৫ বঙ্গাব্দ), ৪৭০।]

[47] বসন্তকুমার রায়, "ভবভূতির প্রকৃতি," *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ১৪০।

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কাব্যের ব্যঞ্জনা-সংক্রান্ত ধারণা। যা কাব্যের অভিধা তথা বাচ্য অর্থকে অতিক্রম করে ‘বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যঞ্জনা’ ব্যক্ত করে তাই-ই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি। শব্দের অভিধা ছাড়াও তার এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি নিয়ে *কাব্যপ্রকাশ*-এ আলোচনা করেছিলেন মম্মট। ‘কাব্যের স্বরূপ ও উপযোগিতা’ প্রবন্ধে রইল মম্মটের আলোচিত সেই ব্যঞ্জনাবৃত্তির অনুষঙ্গ—

> কবৃ অর্থাৎ কব্ ধাতুই প্রত্যয় করিয়া কবি শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। কবৃ ধাতুর অর্থ বর্ণনা। [বর্ণনা = বর্ণ দ্বারা বস্তুর অবস্থা বা স্বরূপ বোঝানো, বর্ণ = রং/অক্ষর] যদিও উক্ত প্রসিদ্ধি অনুসারে কবৃ ধাতুতে উভয়বিধ বর্ণনা না বুঝাইয়া শব্দ-প্রয়োগ দ্বারা বর্ণনাই কেবল বুঝাইয়া থাকে, তথাপি ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা চিত্রকরণ রূপ – অর্থও ঐ ধাতুতে উপস্থিত হয়।
>
> কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা মম্মটভট্ট কর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা
>
> “অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিষন্ত্রিতে
> সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতিরঞ্জনং।”
>
> সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি কারণবশতঃ নানার্থক শব্দের একটি অর্থ বাচ্য হইলেও ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে অপরাপর অর্থের উপস্থিতি হয়।[48]

এই ব্যঙ্গ্যার্থকে যে কখনও কখনও উপমান হিসেবেও প্রকাশ করা যেতে পারে, আর সেক্ষেত্রে বাচ্যার্থ উপমেয়ের ভূমিকায় থাকে— এই বক্তব্যও *কাব্যপ্রকাশ* থেকে পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রবন্ধে *কাব্যপ্রকাশ*-এর উল্লেখ করেই বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গ্যার্থের এই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছিলেন প্রাবন্ধিক—

> যে স্থলে এইরূপে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত দুইটী অর্থ উপস্থিত হয়, সে স্থলে অন্বয়বোধের নিমিত্তে ঐ দুই অর্থের উপমান উপমেয় ভাব সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বাচ্যার্থ উপমেয় রূপে ও ব্যঙ্গ্যার্থ উপমানরূপে প্রতিভাত হয় *কাব্যপ্রকাশকার ইহা বলিয়াছেন,* যথা।

---

[48] ভট্টাচার্য্য, “কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা,” ৩৮৮।

"বাক্যস্য অসম্বন্ধার্থাভিধায়কত্বং মাপ্রসাঙ্ক্ষীদিত্যপ্রাকরণিক
প্রাকরণিকয়োরুপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পনীয়ঃ" ইতি।[49]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণেই নয়, কাব্য-সংক্রান্ত নানা গভীরতর তাত্ত্বিক প্রশ্নেও উনিশ শতকের বাঙালির সহায় হয়ে উঠছেন মম্মটভট্ট। ১৮৭৪ সালে সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্যভাবে পরিবেশন করতে প্রকাশিত হয় জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্যদর্পণ*। এই বইয়ের ভূমিকায় সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক যে-সব বইয়ের থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছেন স্বয়ং লেখক, সেই সব বইয়ের তালিকার দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর নাম।[50] তাছাড়া, এই বইতে লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও মম্মটের উক্তি ব্যবহার করতে হয়েছে তাঁকে।[51] আবার, ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে *কাব্যপ্রকাশ*-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[52]

কেবল বই নয়, উনিশ শতকে প্রকাশিত নানা পত্রিকাতেও মম্মটের উল্লেখ রয়েছে। উনিশ শতকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধে যে যে সংস্কৃত আলংকারিকদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের

---

[49] ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," ৩৮৮। [নজরটান আরোপিত]

[50] "সাহিত্যদর্পণ", "কাব্যপ্রকাশ", "কাব্যাদর্শ", "অলঙ্কারকৌস্তুভ" ও সহৃদয় শিরোমণি কবিচণ্ডীদাসপ্রণীত "কাব্যপ্রকাশদীপিকা" প্রভৃতি কএকখানি অলঙ্কারের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। [উৎস: জয়গোপাল গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলকাতা: শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৪), ৶০।]

[51] ...শীতলত্ব পাবনত্বরূপ প্রয়োজনের সহিত লক্ষণার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ আলঙ্কারিক শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় সম্মট [য] ভট্ট বলেন যে "বিশিষ্টে লক্ষণা হইতে পারে না" তবে লক্ষিত বিষয়ে যে কিছু বিশেষ থাকিবে সেই বিশেষ বুঝাইতে ব্যঞ্জনার প্রয়োজন সুতরাং লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা ব্যতীত তটের বিশেষ গুণ যে শীতলত্বাদি তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। [উৎস: গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," ২৭৮।]

[52] *কাব্যসেবধি*-র বিজ্ঞাপন, *সংবাদ প্রভাকর* (কলকাতা: ১৮৫২, ১৪ জুলাই)।

নাম বিভিন্ন রচনায় কতবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে এই সময়ে বাংলায় কোন আলংকারিক কতখানি গুরুত্ব পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে *সংবাদ প্রভাকর, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, সাধনা, অবোধবন্ধু, বিভা, ভ্রমর, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, প্রচার*— এই পত্রিকাগুলিকে গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, বিভিন্ন পত্রিকায় সবচেয়ে বেশিবার উল্লিখিত হয়েছে *সাহিত্যদর্পণঃ*-রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজের নাম। আর দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছেন মম্মট (তালিকা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত)। ঊনবিংশ শতকের বাংলায় বিশ্বনাথ কেন এত বেশি গুরুত্ব পেলেন, তার আলোচনা থাকবে পরবর্তী পর্যায়ে। আপাতত সুদূর একাদশ শতক পেরিয়ে উনিশ শতকের বাংলায় মম্মটের দীর্ঘসূত্রী থেকে-যাওয়ার কারণগুলি দেখা যাক।

প্রথমত, ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে রসবাদই সবচেয়ে আধুনিক মত হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। রসতত্ত্বের কোনও প্রতিবাদী মতই পরবর্তীকালে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে রসবাদের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে অলংকারশাস্ত্রের অপর নামই হয়ে দাঁড়ায় রসশাস্ত্র। কিন্তু দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, বামন প্রমুখ প্রথম যুগের আলংকারিকদের কাছে রস তেমন গুরুত্ব পায়নি। যেমন, ভামহ, রুদ্রট প্রমুখের কাছে রস একজাতীয় অলংকারমাত্র ('রসবদলংকার')। রসতত্ত্বের পটভূমি প্রস্তুত করেছিল অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। শৈব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন-প্রাণিত অভিনবগুপ্তই প্রথম রসের আস্বাদনকে চৈতন্যের আনন্দ অংশের আস্বাদন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ফলে 'আনন্দ' বা 'হ্লাদ'-এর সঙ্গে কাব্যতত্ত্বের একটা গভীর যোগ স্থাপিত হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতো 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' না বললেও তিনি ঘোষণা করেন রসশূন্য কাব্যের অস্তিত্ব নেই। অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ ও রসবাদের মধ্যবর্তী সেতু গড়ার কাজটুকু

করে দিয়েছিলেন মম্মট। তাঁর 'নিয়তি কৃতি নিয়ম রহিতাং / হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাং/ নবরস রুচিরাং নির্ম্মিতি' প্রকৃতপক্ষে সেই আনন্দের আস্বাদন ও আস্বাদনের আনন্দকেই সকলের গোচরে এনেছিল। কাব্যের প্রয়োজন বোঝাতে 'পরনির্বৃতি' শব্দটি তিনি রসাস্বাদন সমুদ্ভূত আনন্দ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* যেন সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে এযাবৎ প্রচলিত সমস্ত মতের নির্যাস তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন মত হিসেবে রসবাদের ভূমিকা তৈরি করে দিয়েছিল। অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে আদৃত মতবাদের মুখবন্ধকার হিসেবেই পরবর্তীকালে এতখানি গুরুত্ব পেলেন মম্মট। এই প্রসঙ্গে পি ভি কানে বলেছেন—

> In the Alamkara literature, the Kavya Prakasa occupies a unique position… Like the শারীরিক ভাষ্য in Vedanta or the মহাভাষ্য in grammar, the Kavya Prakasa becomes a starting point for future exegies and expansion.[53]

কাব্যপ্রকাশ-এর বিশেষত্ব সম্পর্কে মম্মট নিজেও বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। এই বইয়ের অংশবিশেষ সম্পর্কে গজেন্দ্রগদকরের মন্তব্য—

> In this stanza, Mammata claims that different topics, expounded by his predecessors in different works have been brought together and treated by him within the campus of a single book so skillfully that *it presents the appearance of an organic whole and not that of a patch work.*[54]

[53] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ-এর* 'উপক্রমণিকা' অংশে উদ্ধৃত। [উৎস: মুখোপাধ্যায়, "উপক্রমণিকা," ব।]

[54] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ-এর* 'উপক্রমণিকা' অংশে উদ্ধৃত। [উৎস: মুখোপাধ্যায়, "উপক্রমণিকা," ভ।]

অবশ্য পি ভি কানে মম্মটকে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের নতুন মত ও পথের অগ্রপথিক বলে যেভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সে বিষয়ে সকলে একমত নন। একদিকে ভামহ ও বামন-প্রবর্তিত অলংকারবাদ ও রীতিবাদ, অন্যদিকে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-কে কেন্দ্র করে মম্মট, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজের ধারায় ধ্বনিবাদ ও রসবাদ— এই দুই ধারার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদরেখা সবসময় টানা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন সুশীল কুমার দে তাঁর *History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে। ধ্বনিবাদী বা রসবাদী বলে পরিচিত তাত্ত্বিকরাও তাঁদের কাব্য-সংক্রান্ত আলোচনায় রীতিবাদী ও অলংকারবাদী পূর্বসূরিদের ছায়া সবসময় অস্বীকার করতে পারেননি। যেমন, মম্মট কাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বামনের প্রভাবমুক্ত নয়। কিন্তু তারপরেও মম্মটের সাহিত্যতত্ত্ব রচনার দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের পরিসরে যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাংলাতেও প্রভাব ফেলেছিল তাঁর সেই মর্যাদাময় অবস্থান।

তবে উনিশ শতকের আগে থেকেই বাংলায় মম্মট-চর্চার এক ঐতিহ্যপূর্ণ পরম্পরা ছিল। *নব্যভারত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ‘বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা’ প্রবন্ধে জগদীশ তর্কালঙ্কার নামে সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের এক বাঙালি আলংকারিকের নাম পাওয়া যায় যিনি *রহস্যপ্রকাশ* নামে *কাব্যপ্রকাশ*-এর একটি টীকা লেখেন—

> সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট প্রণীত কাব্যপ্রকাশের টীকা বঙ্গদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত হয়, তন্মধ্যে জগদীশ তর্কপঞ্চানন বিরচিত ‘কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ’ নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক ১৫৭৯ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে রবিবারে তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ন্যায়লঙ্কার

অধ্যাপনার্থে লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্ত করেন। (কাব্যপ্রকাশসূক্তৌ সরস-রহস্যং প্রকাশয়তি)[55]

উনিশ শতকের অন্যান্য প্রবন্ধেও এই টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

... জগদীশ প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের "কাব্য-প্রকাশ" গ্রন্থেও "রহস্যপ্রকাশ" নামে টীকা রচনা করেন। রঘুনাথ ন্যায়ালঙ্কার ১৫৭৯ শকাব্দে (১৬৫৭ খ্রীঃ) স্বহস্তে এই টীকার যে প্রতিলিপি শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য লিপিবদ্ধ করেন, নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ সিদ্ধান্তের গৃহে তাহা বর্ত্তমান আছে। এই হস্তলিখিত পুঁথি হইতে জগদীশ এবং তাঁহার ছাত্র রঘুদেবের সময় নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে।...

স্বম্প্রতি স্বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশদ্বিজো ধীমান্।
কাব্য প্রকাশ-সূক্তৌ সরসরহস্যাং প্রকাশয়তি।।
শাকে রন্ধ্রাদি-বাণ-ক্ষিতি-পরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং ...
শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭৯

(কাব্যপ্রকাশ-রহস্যপ্রকাশ)[56]

এটিই অবশ্য বাঙালি রচিত *কাব্যপ্রকাশ*-এর একমাত্র টীকা নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজও *কাব্য-প্রকাশদর্পণ* নামে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর একটি টীকা রচনা করেছিলেন। 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় উনিশ শতকে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, যাঁর উদ্যোগে টোলভিত্তিক শিক্ষাপ্রণালী এবং পরীক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সংস্কৃত কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব টোলের পাঠক্রমের অন্তর্গত হয়েছিল, তিনি স্বকৃত টীকাসহ *কাব্যপ্রকাশ* প্রকাশ করেছিলেন। এখান থেকে মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত

---

[55] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৫৭৬।

[56] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "শূলপাণি ভট্টাচার্য্য," *নব্যভারত* ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ), ৯২।

কাব্যপ্রকাশ-এর 'সুবিস্তৃত ও নৈয়ায়িক-বিচারাদি পরিপূর্ণ একখানি টীকা'র কথাও জানা যায়।[57]

অবন্তীকুমার সান্যাল তাঁর অনূদিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ভূমিকায় জানিয়েছেন,

> মম্মটভট্ট রসতত্ত্বকে ভিত্তি করে সর্বপ্রথম পূর্ণাবয়ব অলঙ্কারগ্রন্থ 'কাব্যপ্রকাশ' লিখেছিলেন একাদশ শতাব্দীতে। মম্মটের গ্রন্থ প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিভিন্ন যুগে রচিত কাব্যপ্রকাশের প্রায় সত্তরখানি টীকার সন্ধান ও উল্লেখ পাওয়া যায়। এত টীকার সৌভাগ্য সম্ভবত আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থের হয়নি।[58]

এই টীকাগুলির রচয়িতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন বাংলার বাসিন্দা। *নব্যভারত* পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে প্রকাশিত ওই একই প্রবন্ধে জগদীশ তর্কপঞ্চানন ছাড়াও *কাব্যপ্রকাশ*-এর আরও বেশ কয়েকজন বাঙালি টীকাকারের সন্ধান মেলে—

> ...জগদীশ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় *রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি* আর একখানি *কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ* রচনা করেন। কাব্যপ্রকাশের আরো কতকগুলি টীকা আছে— *কাব্যপ্রকাশনিদর্শন, কাব্যামৃত তরঙ্গিনী, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার কৃত কাব্যপ্রকাশাদর্শ বা ভাবার্থচিন্তামণি, রামকৃষ্ণের কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ, শ্রীবৎস শর্ম্মার সারবোধিনী, ভাস্কর ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর রচিত কাব্যপ্রকাশ টীকা, পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর কাব্যপ্রকাশনিস্তারিকা, নাগেশ ভট্টের কাব্যপ্রদীপ, বৈদ্যনাথের কাব্যপ্রকাশপ্রভা, ও জয়রামের কাব্যপ্রকাশতিলক। নরহরি ভট্ট প্রণীত একখানি কাব্যপ্রকাশটীকা* আছে।... নরহরি সরস্বতীতীর্থ নাম ধারণ পুর:সর সন্ন্যাসাশ্রম

[57] পূজনীয় ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বকৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক মম্মটভট্ট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ, রত্নপ্রকাশাদি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কাব্যপ্রকাশের সুবিস্তৃত ও নৈয়ায়িক-বিচারাদি পরিপূর্ণ একখানি টীকা আছে। [উৎস: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ), ৯২।]

[58] অবন্তীকুমার সান্যাল, "ভূমিকা," *সাহিত্য-দর্পণ: প্রথম খণ্ড*, অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ সান্যাল অনূদিত (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), [উনিশ]।

অবলম্বন করেন। সন্ন্যাসী নরহরির কাশীতে অবস্থানকালে কাব্যপ্রকাশের প্রাগুক্ত টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশ্যাং সরস্বতীতীর্থযতিনা তেন রচ্যতে।
টীকা কাব্যপ্রকাশস্য বালচিত্তানুরঞ্জিনী।। [59]

এছাড়া, সুশীল কুমার দে তাঁর *History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থেও মম্মটের একাধিক বাঙালি টীকাকারের কথা বলেছেন। এঁদের নামের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

- শ্রীধরের *সন্ধি-বিগ্রহিকা* টীকা (ত্রয়োদশ শতাব্দী)
- চণ্ডীদাসের *দীপিকা* (ত্রয়োদশ শতাব্দী)
- বিশ্বনাথ কবিরাজের *কাব্যপ্রকাশদর্পণ* (পঞ্চদশ শতাব্দী)
- পরমানন্দ চক্রবর্তীর *বিস্তারিকা* (ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে)
- শ্রীবিদ্যা চক্রবর্তীর *সম্প্রদায়-প্রকাশিনী*
- জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের *তিলক/ জয়রামী* (১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ)
- শ্রীবৎস শর্মা এবং সুবুদ্ধি মিশ্রের *সার-বোধিনী* (সপ্তদশ শতকের পূর্বে)
- রত্নপাণির *কাব্য-দর্পণ* এবং রবির *মধুমতী টীকা*
- মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের *আদর্শ/ ভাবার্থ চিন্তামণি* (সপ্তদশ শতক)
- বলদেব বিদ্যাভূষণের *বৃত্তি/ সূত্র* (অষ্টাদশ শতক)
- রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির *রহস্য-প্রকাশ*
- রামচন্দ্রের *কাব্যপ্রকাশসার*

---

[59] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, “বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা,” *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৫৭৬। [নজরটান আরোপিত]

- শিবনারায়ণ দাসের *দীপিকা*
- বৈদ্যনাথের *উদ্ধারণ-চন্দ্রিকা* এবং *কাব্যপ্রকাশ-প্রভা* (গোবিন্দ ঠক্কুরের *প্রদীপ* নামক টীকার টীকা)

এই তালিকায় দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দীর্ঘসময় ধরে বাংলায় মম্মট অত্যন্ত গুরুত্ব নিয়েই পঠিত ও চর্চিত হয়েছেন। মম্মট ছাড়া আর কোনও আলংকারিকই সম্ভবত বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এত দীর্ঘসময় ধরে এত চর্চিত হননি। সেই চর্চার পরম্পরাই অব্যাহত রেখেছিল উনিশ শতক। উনিশ শতকে গোটা ভারতে মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর তিনটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণের হদিশ মেলে—

- কলকাতা থেকে নাথুরামের সম্পাদনায় ১৮২৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, এডুকেশন প্রেস থেকে মুদ্রিত। মদনমোহন মিত্র রচিত বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*-এর ভূমিকা থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনে "সাহিত্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া" *কাব্যপ্রকাশ* বইটি পেয়েছিলেন[60]। বিদ্যাসাগরের প্রাপ্ত *কাব্যপ্রকাশ* বইটি এডুকেশন প্রেসের সংস্করণ ছিল বলেই মনে হয়।
- কলকাতা থেকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সম্পাদনায় ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, সম্পাদকের টীকা *তাৎপর্য-বিবরণ*-সহ।

---

[60] মদনমোহন কুমার, "প্রবেশক," *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১৯।

- মুম্বাই থেকে বামনাচার্য ঝালালিকরের সম্পাদনায় প্রকাশিত সংস্করণ, *বালবোধিনী* টীকা সমেত (প্রথম সংস্করণ ১৮৮৯)[61]।

এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে প্রথম দুটিই কলকাতা থেকে প্রকাশিত। এ থেকে বোঝা যায় উনিশ শতকে মম্মটের চর্চায় সারা ভারতের মধ্যে বাংলাই ছিল পথপ্রদর্শক। প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই হয়তো মম্মটের প্রতিভার আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা এগিয়ে ছিল।

[61] S.K De, *History of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1960), 154-155.

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সময়-পরম্পরা অনুসারে যে সব প্রস্থানভেদকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার পথচলায়, তার মধ্যে আধুনিকতম তত্ত্ব নিঃসন্দেহে রস-প্রস্থান। রসপ্রস্থানের বীজ উপ্ত হয়ে ছিল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এই। তবে এই বীজ পরিণতি লাভ করে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের মাধ্যমে। চতুর্দশ মতান্তরে পঞ্চদশ শতকের তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণঃ* লেখার সময় রসতত্ত্বকেই তাঁর তত্ত্বভাবনার কেন্দ্রস্থলে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসকেই কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেন। উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রায় অবিসংবাদিত প্রাধান্য পেয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে অলংকারপ্রস্থান ও অলংকার, গুণপ্রস্থানের প্রবর্তক দণ্ডী এবং *কাব্যপ্রকাশ* রচয়িতা আচার্য মম্মট সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া গেছে। এই অধ্যায়ে আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে উনিশ শতকের বাংলায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-সংক্রান্ত চিন্তন।

***

পদ্মাবতী নাটক রচনার পর রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘোষণা করেন—

> If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.[1] (১৫ মে, ১৮৬০)

---

[1] যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫), ২২১।

মাইকেলের ‘Mr Viswanath’ রচিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুশাসনে নিজেকে শৃঙ্খলিত না করার এই অঙ্গীকার উনিশ শতকের ইতিহাসে বহুশ্রুত, বহুপঠিত এবং বহুব্যবহৃতও বটে। বিশ্বনাথ কবিরাজ সম্পর্কে মধুসূদনের লেখনী-নিঃসৃত এ বয়ান তাচ্ছিল্যের হলেও খেয়াল রাখা দরকার, *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই মধুসূদন এখানে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব তো কেবলমাত্র *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পরিসরে সীমায়িত নয়। আচার্য ভরত থেকে শুরু করে দণ্ডী, বামন, মম্মট, রাজশেখর, কুন্তক হয়ে সপ্তদশ শতকের *রসগঙ্গাধর* পর্যন্ত এর এক সুবিস্তৃত ও ঐতিহ্যময় পরম্পরা রয়েছে। সে কথা যেন বন্ধুকে লেখা চিঠিতে একপ্রকার বিস্মৃতই হয়েছেন মাইকেল! ওই একই চিঠির অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত এক অংশে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে সাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। সেখানে অ্যারিস্টটল, লঞ্জাইনাস, বার্ক, ড্রাইডেন প্রমুখ পাশ্চাত্য কবি-তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেও স্থান দিয়েছেন তিনি।[2] পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের নামের সেই দীর্ঘ সারিতে একমাত্র প্রাচ্যতাত্ত্বিক হলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকে মধুসূদনের কবিমানসে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিনিধিস্থানীয় বই হিসেবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি। অথচ তত্ত্বগ্রন্থ হিসেবে *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্পর্কে সমালোচনা এবং অভিযোগের পরিমাণও তো খুব কম নয়!

***

[2] I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya-Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair’s lectures or the German Schlegel. [উৎস: বসু, *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, ২২১।]

> তাঁর গ্রন্থে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, ব্যাখ্যানভঙ্গির সারল্য আছে, কিন্তু তাতে গভীর মননের অভাব।[3]

যে বইয়ের ভূমিকাতেই এমন কথা ঘোষণা করে দেন স্বয়ং অনুবাদক, সেই বইয়ের উৎকর্ষ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি হয় বইকি! বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ভূমিকায় এই কথা লিখেছিলেন অবন্তীকুমার সান্যাল। *সাহিত্যদর্পণঃ* গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে তাঁর সঙ্গে কিছুটা একমত না হয়ে উপায় থাকে না। বিশ্বনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেছেন তাঁর পূর্বসূরিদের। পরিমার্জন ক্ষেত্রবিশেষে থাকলেও সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পরিসরে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে এমন কোনও যুগান্তকারী চিন্তার স্বাক্ষর তিনি রেখে যেতে পারেননি এই বইতে। বিশ্বনাথের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি একাধিক কাব্যতাত্ত্বিকের[4] আলোচনায় মৌলিকতা ও প্রজ্ঞার যে সূক্ষ্ম চিহ্ন আছে, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ তা অনুপস্থিত। তাঁর লেখায় যুক্তিপরম্পরার স্পষ্টতা ও শ্রেণিবিন্যাসের অনুপুঙ্খতা যতটা আছে, কাব্যের রহস্যময় চারিত্র্যকে উদ্ঘাটনের মতো ভাবনার গভীরতা, মৌলিকতা ও কল্পনার বিস্তার তত নেই। এই কারণেই হয়তো অবন্তীকুমার সান্যালের মনে হয়েছিল—

> আলঙ্কারিক হিসেবে তাঁকে মোটেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।... কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যতত্ত্বের আলোচনা মম্মটের মতো প্রজ্ঞাদীপ্ত আলোচনা হয়ে উঠতে পারেনি। কাব্যতত্ত্ব বচনীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বনাথ তাকে যেন অতিবচনীয় করে তুলেছেন।[5]

---

[3] অবন্তীকুমার সান্যাল, "ভূমিকা," *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ: প্রথম খণ্ড,* অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), উনিশ।

[4] মম্মট, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, ভোজ, জগন্নাথ প্রমুখ।

[5] সান্যাল, "ভূমিকা," উনিশ।

প্রজ্ঞাদীপ্ত নয়, মৌলিক নয়, ভাবনার গভীরতা তেমন নেই; অথচ উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বচর্চার দিকে তাকালে দেখা যায়, সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে যে বইটি একাধিপত্য বিস্তার করেছে, তা এই *সাহিত্যদর্পণঃ-ই*! কীভাবে এবং কেন উনিশ শতকীয় বাঙালির সাহিত্যতত্ত্বচর্চায় এইভাবে প্রাধান্য পেয়ে গেলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ— সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা থাকবে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে।

এইখানে উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'দৃশ্যশ্রব্যকাব্যনিরূপণ'-সম্পর্কিত অর্থাৎ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অন্তর্গত নাটকবিষয়ক যে সব আলোচনা উনিশ শতকের সমালোচকদের কলমে উঠে এসেছিল, সেগুলিকে এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তা এই অভিসন্দর্ভের সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। নাট্যতত্ত্ব নয়, উনিশ শতকের পরিধিতে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রতিক্রিয়াই কেবল এই অধ্যায়ের আলোচ্য।

৪.১ উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভরতা

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির সাক্ষ্যেই বোঝা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে *সাহিত্যদর্পণঃ-ই* ছিল সমগ্র সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সমার্থক। সেই চিঠি লেখার আট বছর পরে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর তৃতীয় সংস্করণের টাইটেল পেজে যে সংস্কৃত উদ্ধৃতিটি[6] তিনি ব্যবহার করেছিলেন সেটি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'রসাদি-

[6] লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ— নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে [উৎস: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), প্রবেশক পৃষ্ঠা।]

নিরূপণ'-এর অন্তর্গত 'নায়ক-প্রকরণ'-এর ১৩০ সংখ্যক শ্লোকের অংশবিশেষ। মূল শ্লোকটি ছিল এইরকম:

> লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
> দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।।[7]
>
> অর্থাৎ পত্র প্রেরণ, সানুরাগ অবলোকন, মৃদুভাষণ ও দূতী প্রেরণের দ্বারা নায়িকাগণের ভাবাভিব্যক্তি বুঝা যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্য-এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কেবল পত্রপ্রেরণের অংশটিই নির্বাচন করেছিলেন মধুসূদন, তাঁর কাব্যের প্রবেশক হিসেবে। এখন, গভীর অভিনিবেশসহ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পাঠ ব্যতীত তো সেই গ্রন্থ থেকে নিজের কাব্যের জন্য এমন যথাযথ প্রবেশক খুঁজে নেওয়া সম্ভব নয়!

সাহিত্যদর্পণঃ-কে কাব্যের প্রবেশক হিসেবে তুলে আনা, কিংবা তার বিধিনিয়মের দিকে ছুড়ে দেওয়া উপেক্ষার বয়ান— এই দুটি ক্ষেত্র থেকেই কিন্তু স্পষ্ট হয়ে যায় মধুসূদনের মানস পরিসরে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর গুরুত্ব। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত এত গ্রন্থ থাকতেও এই একটি বইয়ের ওপর এ হেন নির্ভরতা বিস্ময়কর বটে! সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের বিস্তার ও গভীরতা সম্পর্কে উনিশ শতকের বাঙালির এ হেন উদাসীনতায় খানিক হতাশাই যেন প্রকাশ করেছেন পণ্ডিত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—

> মাইকেল এবং তাঁর সমকালীন পণ্ডিত সমাজ উভয়েই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস, তাতে বর্ণিত সাহিত্যসমালোচনাপদ্ধতির বিচিত্র ধারা, তার গভীর দার্শনিকতা, তার উদার সর্বজনীনতা– এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের সম্বল

---

[7] তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ, রসাদি-নিরূপণ, নায়ক প্রকরণ, ১৩০ সংখ্যক শ্লোক। [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১২২।]

> ছিল বিশ্বনাথ কবিরাজের ‘সাহিত্য-দর্পণ’ বা তারই একটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র।[8]

এখন, মধুসূদনের নিজের অলংকারশাস্ত্রজ্ঞান যে সীমিত ছিল সে কথা স্বীকার করেছেন তাঁর প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও—

> তিনি গ্রন্থারম্ভে নান্দী এবং নটী ও সূত্রধরের অভিনয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে যেরূপ পার্থক্য রাখা কর্ত্তব্য এবং নাটকীয় পাত্রগণ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক তিনি সে বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হন নাই।
>
> ব্যাকরণে বা অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার কোনকালেই অধিকার ছিল না; সুতরাং তাঁহার রচনা অনেক স্থলে ব্যাকরণদুষ্ট ও অলংকারবিরুদ্ধ হইয়াছিল।[9]

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অলংকারশাস্ত্র-বিষয়ক জ্ঞানে মধুসূদনের অসম্পূর্ণতা ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের সব বাঙালির কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান কি মধুসূদনের মতো কেবলই *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেন্দ্রিক ছিল? সত্যিই কি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে ‘সম্পূর্ণ অজ্ঞ’ ছিলেন তাঁরা?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে উনিশ শতকে প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

৪.১.১ উনিশ শতকে প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রভাব

উনিশ শতকে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

---

[8] বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, “অলঙ্কার-শাস্ত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা,” *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১২৫।

[9] যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত: অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা সম্বলিত* (কলকাতা: অশোক পুস্তকালয়, ১৯৬০), ২৪৬।

১) লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত *কাব্যনির্ণয়*

২) জয়গোপাল গোস্বামী প্রণীত *কাব্যদর্পণ*

৩) জয়গোপাল গোস্বামী প্রণীত *সাহিত্যমুক্তাবলী*

৪) শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত *কাব্যপ্রবেশ*

৫) রসিকচন্দ্র রায় প্রণীত *নবরসাঙ্কুর* প্রভৃতি

এই পাঁচটি বই-ই ছিল মূলত ছাত্রপাঠ্য। *কাব্যনির্ণয়*-এর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছিলেন—

> ...কতিপয় অভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছি, এবং *ছাত্রদিগের উপযোগী হইবে মনে করিয়া যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছি, এবং সাধ্যমত শ্রম করিতেও ত্রুটি করি নাই*। যে স্থলে কঠিন বোধ হইয়াছে তথাকার অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটী টীকাও লিখিয়া দিয়াছি;... [10]

সাহিত্যমুক্তাবলী অলংকার-গ্রন্থটি যে ছাত্রপাঠ্য হিসেবেই লেখা হয়েছিল, এর বিজ্ঞাপন থেকে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়—

> একদা কথা-প্রসঙ্গে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে *বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রমণ্ডলীর নিমিত্ত* যেরূপ নানা প্রকার বাঙ্গালা পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে, সেই রূপ কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক হওয়া নিতান্ত

[10] লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। [নজরটান আরোপিত]

> আবশ্যক, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকটিত হয় নাই।[11]

আরেকটি অলংকার-গ্রন্থ, যোগীন্দ্রনাথ বসুর *কাব্যপ্রবেশ*ও ছিল মূলত স্কুলপাঠ্য বই। *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত বইটির 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' থেকে সে কথা জানা যায়।[12] রসিকচন্দ্র রায়ের *নবরসাঙ্কুর*-এর বিজ্ঞাপনেও প্রায় একইভাবে লেখক ঘোষণা করেছিলেন "বালকবর্গের রসানুভব জন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।"[13] জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্যদর্পণ* সে অর্থে স্কুলপাঠ্য না হলেও রসতত্ত্ব তথা অলংকার-শাস্ত্রের জটিল ও দুরূহ ধারণা সাধারণের কাছে দেশীয় ভাষায় সহজভাবে তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য।[14]

সহজভাবে ছাত্র তথা সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে পৌঁছে দিতে গিয়ে এই বইগুলি যে তত্ত্বগ্রন্থকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিল, সেটি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *সাহিত্যদর্পণঃ*। *কাব্যনির্ণয়* বইটি ছিল ছাত্রপাঠ্য। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত বইটির সপ্তম সংস্করণে ভূমিকা অংশে লালমোহন লিখেছেন "বঙ্গভাষায় একখানি

---

[11] জয়গোপাল গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ), বিজ্ঞাপন। [নজরটান আরোপিত]

[12] বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কারপরিচয়ের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূল সূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার ভাষায় লেখা হইয়াছে। উদাহরণগুলিও তদুপযোগী। এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত। [উৎস: অজ্ঞাত, "প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৫৮৭।]

[13] অজ্ঞাত, "প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৯।

[14] অলঙ্কারশাস্ত্র অতি বিস্তৃত, ইহার সমস্ত অংশ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই, বিশেষতঃ যে সকল অংশ অতি দুরূহ ও আংশিকরূপে নানালঙ্কারপ্রবিষ্ট, সে সকল অংশের দিঙ্‌মাত্রও কেহ কখন প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। এজন্য আমি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ... [উৎস: জয়গোপাল গোস্বামী, *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), বিজ্ঞাপন।]

অলঙ্কার গ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া"[15] তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে এ বই লিখতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৮-৬৯ সালে বইটি বিদ্যালয় ও স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়েছিল। সাহিত্যতত্ত্বের ভাবনাগত জটিলতাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে সংস্কৃত ছন্দ-অলংকার-কাব্যতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলির সঙ্গে ছাত্রদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোই ছিল এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণেই এ বইয়ের পরিকল্পনা কাব্যতত্ত্বের পরিচিত রূপরেখার চেয়ে কিছুটা আলাদা। এখানে ধ্বনি, রস, বক্রোক্তি, স্থায়ী ভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভাব প্রভৃতি কাব্যতত্ত্ব ঘেঁষা বিষয়ের আলোচনা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-ব্যাজোক্তি প্রভৃতি অলংকার, গীতিকাব্য-মহাকাব্য প্রভৃতি কাব্যরূপভেদ, যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণগত ধারণা, মিত্রাক্ষর-মিশ্রত্রিপদী-যতি-কুসুমবিচিত্রা-তূণক-মালতী প্রভৃতি ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ-সংক্রান্ত আলোচনা। বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের বই এটি নয়না, তা সত্ত্বেও নানা জায়গায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সঙ্গে *কাব্যনির্ণয়*-এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[16]

লালমোহন বিদ্যানিধির রচিত *কাব্যনির্ণয়*	**বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ***
১) যে ভাবগুলি আমাদিগের অন্তঃকরণে কখন আবির্ভূত, কখন বা উহা হইতে অন্তর্হিত, (অর্থাৎ যাহারা একমাত্র রসে না থাকিয়া সকল রসেই উদ্ভূত বা অনুভূত হয় তাহাদিগকে সঞ্চারিভাব বলে। (পৃ. ৩৯)	১) বিশেষভাবে (স্থায়ী ভাবের আস্বাদব্যঞ্জক) সহায়তা সহকারে বিচরণ করে বলিয়া ইহারা ব্যভিচারী। এইগুলি স্থায়ীভাবের মধ্যে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হয়। (পৃ. ১২৭)
২) হাস্য: বিকৃত আকার বিকৃত বাক্য বেশধারিনটাদির বিকৃত চেষ্টা জন্য এই রসের উদয় হয়। (পৃ. ৫৪)	২) আকার, কথাবর্ত্তা, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি দ্বারা জাত কুহক (মনোবিভ্রম) হইতে হাস স্থায়ীভাবযুক্ত হাস্য (রস) হয়। (পৃ. ১৬৪)

[15] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়,* প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

[16] (i) বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়,* পৃষ্ঠাসংখ্যা মূল প্রবন্ধের ছকে উল্লিখিত।

(ii) মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ,* পৃষ্ঠাসংখ্যা ছকে উল্লিখিত।

৩) বৎসল: সন্তানাদির প্রতি পিতৃমাতৃ প্রভৃতি গুরুজনদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ (বাৎসল্যভাব) তাহাকে বৎসলরস কহে। এই রসে বৎসলতারূপ স্নেহ স্থায়িভাব। (পৃ. ৫৮)	৩) মুনীন্দ্রসম্মত বৎসল (রস) ... দশম রস... চমৎকারিত্বহেতু স্ফুট বৎসলকেও রস বলিয়া (মুনিগণ) জানেন। বাৎসল্যস্নেহ (ইহার) স্থায়ীভাব। (পৃ. ১৭৫)
৪) আদ্য রস: মনোভবের উদ্রেক হেতু নায়ক ও নায়িকার অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি স্বসম্বেদ্য যে এক অপূৰ্ব্ব অনুরাগ (রতি) জন্মে ও স্থায়ী হয় তাহাকেই শৃঙ্গার (আদ্য বা মধুর) রস বলে। ইহা উত্তম প্রকৃতিতে বর্ণনীয় (পৃ. ৪২) ...আদিরস প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। ...যেখানে পরস্পরের অনুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছে কিন্তু কেহ কাহাকেও লাভ করিতে পারিতেছে না তথায় বিপ্রলম্ভ বলে। বিপ্রলম্ভের চারি প্রকার ভাগ আছে। যথা; পূৰ্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ।... (পৃ. ৪৪) নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগ হেতু বা অত্যাসঙ্গনিবন্ধন পরস্পরের একাত্মতা রূপ সুখসম্মিলনকে সম্ভোগ বলে। (পৃ. ৪৫) ...বীররস দয়া, ধৰ্ম্ম, দান ও যুদ্ধ-ভেদে চারিপ্রকার। (পৃ. ৪৬)	৪) 'শৃঙ্গ' হইতেছে কামের আবির্ভাব। কামাবির্ভাবের হেতুস্বরূপ যে রসের মূল প্রায়ই উত্তম প্রকৃতির হইয়া থাকে, সেই রসকেই শৃঙ্গার রস বলা হয়। ...ইহা বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগভেদে দ্বিবিধ... যেখানে প্রবল রতি অভীষ্টকে পায় না, সেখানে উহা (শৃঙ্গার রস) বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার (হয়)। ...ইহা পূর্বরাগাত্মক, মানাত্মক, প্রবাসাত্মক ও করুণাত্মক -- এই চারি প্রকারের হয়। (পৃ. ১৪৮-৪৯) ...বিলাসী ও বিলাসিনী (নায়ক নায়িকা) পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলে যখন দর্শনস্পর্শনাদি করিতে থাকে, তখন সম্ভোগের উদাহরণ হয়। (পৃ. ১৬১) ...বীররস— দান, ধৰ্ম্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সহিত সমন্বিত হইয়া চারি প্রকারের হইয়া থাকে। (পৃ. ১৬৮)

এখানে লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়*-এর নির্বাচিত কয়েকটি অংশের সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর তুলনা করা হয়েছে। ছকটি দেখলেই বোঝা যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি কাব্যতত্ত্বের আলোচনার অধিকাংশ স্থানেই বিশ্বনাথকে অনুসরণ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শৃঙ্গারের ভেদ (বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ) এবং বাৎসল্যরসের প্রসঙ্গটি। সংস্কৃত কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বনাথই 'মুনীন্দ্রসম্মত' বৎসলকে দশম রসের মর্যাদা দেন। বৈষ্ণব আচার্য ব্যতীত আর কোনও আলংকারিকই বৎসলকে এইভাবে রসের স্বীকৃতি দেননি। বিপ্রলম্ভের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে বীররসের ভেদ— এই সব ক্ষেত্রেই *কাব্যনির্ণয়ে সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। লালমোহন বিদ্যানিধির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনার মূল অবলম্বন অন্য কেউ নন, কেবলমাত্র বিশ্বনাথ।

প্রায় একই কথা বলা চলে জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্য-দর্পণ* সম্পর্কেও। প্রথমত, *কাব্য-দর্পণ*-এর নামকরণেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রভাব টের পাওয়া যায়। এই বইয়ের ভূমিকায় সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক যে-সব বইয়ের থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছেন স্বয়ং লেখক, সেই সব বইয়ের তালিকায় প্রথমেই দেখা যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর নাম।[17] তাছাড়া, স্থায়ী, ব্যভিচারী, সঞ্চারী, বিভাব, অনুভাব থেকে প্রত্যেকটি রসের সংজ্ঞায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই যেন হুবহু অনুসরণ করেছেন লেখক। অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেখলেই এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।[18]

জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্যদর্পণ*	**বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ***
১) ব্যভিচারী ভাব। জড়তা: ইষ্টদর্শন ও অনিষ্টশ্রবণজনিত যে অপ্রতিপত্তি তাহার নাম জড়তা। ২) শৌর্য, দুর্ম্মুখতা, ক্রূরতা ও অপরাধাদিজনিত যে চণ্ডতা তাহার নাম উগ্রতা। স্বেদ, শিরঃকম্পন, তর্জ্জন ও তাড়নাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে। (পৃ. ৭১)	১) ব্যভিচারী ভাব। জড়তা : ইষ্ট ও অনিষ্টের দর্শন ও শ্রবণহেতু যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, তাহা হইতেছে জড়তা। ২) শৌর্য, অপরাধ প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত যে চণ্ডভাব তাহাই হইতেছে উগ্রতা। ইহাতে স্বেদ, শিরঃকম্প, তর্জ্জন, তাড়ন ইত্যাদি দেখা যায়। (পৃ. ১৩১)
৩) করুণরস— ইষ্টনাশ ও অনিষ্টপাত জন্য এই রস জন্মিয়া থাকে। ইহাতে শোক স্থায়িভাব। শোচ্য ব্যক্তি বা বস্তু আলম্বন বিভাব এবং দৈবনিন্দা, ভূমিপতন, ক্রন্দন প্রভৃতি অনুভাব (পৃ. ৯৭-৯৮)	৩) ইষ্টনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি হেতু 'করুণ' নামক নামক রস হয়। ... এখানে স্থায়িভাব হইতেছে শোক এবং শোচ্য বিষয় হইতেছে আলম্বন ...

17 "সাহিত্যদর্পণ", "কাব্যপ্রকাশ", "কাব্যাদর্শ", "অলঙ্কারকৌস্তুভ" ও সহৃদয় শিরোমণি কবিচণ্ডীদাসপ্রণীত "কাব্যপ্রকাশদীপিকা" প্রভৃতি কএকখানি অলঙ্কারের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। [উৎস: গোস্বামী, *কাব্যদর্পণ*, ৵০।]

18 গোস্বামী, *কাব্যদর্পণ*, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছকে উল্লিখিত।

	অনুভাব হইতেছে দৈবের নিন্দা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন প্রভৃতি। (পৃ. ১৬৫)
৪) বীররস— বীররসে উৎসাহ স্থায়িভাব। বিজেতব্য আলম্বন বিভাব, উক্ত ...এই বীররস চারি প্রকার। যথা দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর। (পৃ. ১০১)	৪) বীররস হইতেছে উত্তমপ্রকৃতির, ইহার স্থায়িভাব হইতেছে উৎসাহ; ... ইহার আলম্বন বিভাব হইতেছে— বিজেতব্য প্রভৃতি।...বীররস— দান, ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সহিত সমন্বিত হইয়া চারি প্রকারের হইয়া থাকে। (পৃ. ১৬৮)

এই চারটি তো বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তমাত্র। গোটা বই জুড়েই কাব্যতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা পরিভাষা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জয়গোপাল গোস্বামী, তা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই অনুবাদ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই বইতেও দশম রস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে 'মুনীন্দ্রসম্মত বৎসল রস', তার একমাত্র কারণ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর টেক্সট। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রতিটি রসের বিরোধী কয়েকটি রসের উল্লেখ করেছিলেন, জয়গোপাল গোস্বামী যে কেবল বিরোধী রসের ধারণাটি গ্রহণ করলেন তাই-ই নয়, *সাহিত্যদর্পণঃ* বিভিন্ন রস ও তার বিরোধী রসের যে তালিকা দিয়েছিল, তিনি সেটিরই উল্লেখ করলেন নিজের বইতে, কোনওরকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন ছাড়াই।

জয়গোপাল গোস্বামীর আরেকটি বই *সাহিত্যমুক্তাবলী*-কে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'অনুবাদ-প্রচেষ্টা' বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ বইয়ের বিজ্ঞাপন অংশে লেখক নিজেই লিখেছেন—

> স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এই রূপ প্রস্তাব করিয়া পশ্চাৎ আমাকে এই আদেশ করেন যে, তুমি অলঙ্কার বিষয়ক কোন একখানি পুস্তক প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি সম্মত হইয়া,

> *সংস্কৃত সাহিত্য দর্পণ অবলম্বনে এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া,* উক্ত মহাত্মাকে দেখাইলাম...[19]

সাহিত্যমুক্তাবলী-র অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই বইয়ের *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভরতার কথা জানান দেয়।

তবে এই তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রেই *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে যেটুকু পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে, তা মূলত শৃঙ্গার রস-সংক্রান্ত বয়ানে। বইগুলি ছাত্রপাঠ্য বলে, এবং উনিশ শতকের পিউরিটান মনোভাবের কারণেও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর শৃঙ্গার-আলোচনা থেকে পৃথক হয়ে গেছে বাঙালি লেখকদের শৃঙ্গার রসের ব্যাখ্যা।

কাব্যনির্ণয় ছাত্রপাঠ্য বই হওয়ায় 'অশ্লীলতাদোষ' যথাসম্ভব পরিহার করতে চেয়েছিলেন লালমোহন বিদ্যানিধি। সে কারণেই অন্যান্য রসের বিস্তৃত উদাহরণ ও সংজ্ঞা থাকলেও, শৃঙ্গারের আলোচনা যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখেছেন তিনি। এমনকি শৃঙ্গার নামটিও উল্লেখ করেননি। এই কারণেই পৃথক হয়ে গেছে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'শৃঙ্গার' ও *কাব্যনির্ণয়*-এর 'আদ্যরস'-এর সংজ্ঞা। জয়গোপাল গোস্বামীও *কাব্যদর্পণ*-এর ভূমিকায় জানিয়েছিলেন 'অশ্লীলতাদোষ' বর্জন করতেই আদ্যরসের 'একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ'[20] দিয়েছেন তিনি।

সাহিত্যমুক্তাবলী-র বিজ্ঞাপনেও তিনি বলেন "সাহিত্য-দর্পণের সকল অংশই যে অনুবাদিত হইয়াছে এরূপ নহে, যে সকল অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী

---

[19] গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী*, বিজ্ঞাপন। [নজরটান আরোপিত]

[20] ... অশ্লীলদোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যতদূর পারিয়াছি চেষ্টা করিয়াছি। সাঙ্গোপাঙ্গ আদ্যরস ইহাতে বিবৃত হয় নাই, কেবল আদ্যরসের লক্ষণ ও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। [উৎস: গোস্বামী, *কাব্যদর্পণ*, বিজ্ঞাপন।]

নহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।”[21] তবে, বাঙালির শৃঙ্গার-সংক্রান্ত এই দ্বিধা ও দোলাচল এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। এই অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪.১.২ উনিশ শতকীয় বাঙালি মননে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সমার্থক *সাহিত্যদর্পণঃ*

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় লেখা সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা সীমিত। কিন্তু কেবল সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত বইতেই নয়, সাহিত্য-সমালোচনামূলক একাধিক গ্রন্থেও বারবার উঠে এসেছে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর কথা। সব ক্ষেত্রে সরাসরি যে *সাহিত্যদর্পণঃ* বা বিশ্বনাথ কবিরাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এমনটা নয়। কখনও ‘আমাদের দেশের প্রচলিত বাক্য’, কখনও বা ‘আলঙ্কারিক’দের উক্তির আড়ালে যাঁর কথা বলা হয়েছে, তিনি সেই বিশ্বনাথ কবিরাজ। তেমনই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক—

পূর্ণচন্দ্র বসু তাঁর *সাহিত্য-চিন্তা* গ্রন্থের ‘আর্য্যসাহিত্যে আদিরস’ অংশে প্রধান রস বা সিদ্ধ রস সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ‘বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্’- এই বিখ্যাত উক্তির সাহায্য নিয়েছেন—

> কাব্য নানা রসের আধার হইলেও প্রধান রসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত। সেই প্রধান রস হৃদয়কে বরাবর অধিকার করিয়া কাব্যপাঠান্তে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান থাকে। *তাই, আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, ‘রসাত্মক বাক্যই কাব্য’*।[22]

আবার একই লেখকের *কাব্য-চিন্তা* নামক বইয়ের নিবেদন অংশে কাব্য কাকে বলা উচিত সেই আলোচনার সূত্রে বিশ্বনাথের নাম সরাসরি না করেও আবারও লেখক রেখে গেছেন তাঁর কাব্যভাবনার প্রতিধ্বনি—

---

[21] গোস্বামী, সাহিত্যমুক্তাবলী, বিজ্ঞাপন।

[22] পূর্ণচন্দ্র বসু, *সাহিত্য-চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ১১১। [নজরটান আরোপিত]

> ...*আলঙ্কারিক বলেন, যাহা রসাত্মক বাক্য, তাহাই কাব্য*। এ গ্রন্থে কাব্যের সেই লক্ষণ ও উপকরণ – তাহার রস, কল্পনা ও ছন্দাদির বিষয় আলোচনা করিয়াছি।[23]

> ... কোন কাব্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার অধ্যয়ন কিরূপ দেখিতে হইবে। *যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত, হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কাব্য।* সুতরাং যাহা রসাত্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যয়ন-ফল, আর যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে।[24]

বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুসরণে 'রসাত্মক বাক্যে'র প্রসঙ্গ আরও একবার এসেছিল 'দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য' রচিত 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' প্রবন্ধে—

> কোন কোন আলঙ্কারিক প্রহেলিকা অর্থাৎ হেঁয়ালীর কাব্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন রস না থাকিলে কাব্য বলা যায় না। *যেহেতু রসাত্মক বাক্যই কাব্য।*[25]

প্রমথনাথ চৌধুরী 'জয়দেব' প্রবন্ধে বিশ্বনাথের কাব্য-সংজ্ঞার প্রশংসা করে লিখেছেন—

> ...কোনও একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভিতর যাবতীয় কবিতা-পুস্তককে প্রবেশ করান যায় না। ... আমার বিবেচনায় *আমাদের দেশের প্রচলিত বাক্য "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"* কাব্যের এই সংজ্ঞায় সকল কাব্যের ভিতর যেটি সাধারণ অংশ অর্থাৎ যাহার অভাবে কোনও রচনা কাব্যই হইতে পারে না সেইটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।[26]

---

[23] পূর্ণচন্দ্র বসু, *কাব্য-চিন্তা* (কলিকাতা: ডন প্রেস্, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ), ৶০। [নজরটান আরোপিত]

[24] বসু, *কাব্য-চিন্তা,* ।০। [নজরটান আরোপিত]

[25] দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪০৫। [নজরটান আরোপিত]

[26] প্রমথনাথ চৌধুরী, "জয়দেব," *ভারতী ও বালক* ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ১০১-১০২। [নজরটান আরোপিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে একইভাবে বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞার যাথার্থ্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন—

> আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে *রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ* করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই।[27]

সুতরাং, 'আলঙ্কারিক'-এই সাধারণীকৃত বিশেষণের আড়ালে বিশ্বনাথ কবিরাজের মত তুলে আনা; 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং'-কে 'আমাদের দেশের প্রচলিত বাক্য' বলে উল্লেখ করা এবং 'আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে'র কাব্যসংজ্ঞা হিসেবে রসাত্মক বাক্যের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, এইসময়কার বাঙালি মানসে বিশ্বনাথ কবিরাজই ছিলেন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের সমার্থক। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর কিছু বাক্য ততদিনে প্রায় প্রবাদের মতোই বহুলচর্চিত হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের পণ্ডিত ও সমালোচক মহলে। *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের মধ্যে একজাতীয় অভেদ যেন বাঙালি স্থাপন করেছিল। সচেতনভাবে হয়তো নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটেছিল এই একীকরণ।

৪.১.৩ বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্

রসবাদকে গ্রহণ এবং প্রচার করার ব্যাপারে প্রচলিত অলংকারগ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। "...rasa alone constitutes the essence of poetry"– বিশ্বনাথের এই মতকে সুশীলকুমার দে

[27] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঐতিহাসিক উপন্যাস," 'সাহিত্য,' *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), ৪৪৮।

"somewhat extreme theory"[28] বলে অভিহিত করেছেন। তবে রসের ক্ষেত্রে এই আপসহীন মনোভাবই বিশ্বনাথের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রথম পরিচ্ছেদেই "বাক্য রসাত্মকং কাব্যম্"[29]– এই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। উনিশ শতকের অজস্র বাঙালি লেখকদের লেখায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই বাক্যবন্ধ। তার কিছু দৃষ্টান্ত আগে আলোচিত হয়েছে। এই অংশে রইল এমন আরও কিছু দৃষ্টান্ত, যেখানে বিশ্বনাথ বা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর নামোল্লেখসহ রসাত্মক বাক্যকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন বাঙালি লেখকেরা।

যেমন, পূর্ণচন্দ্র বসু *সাহিত্য-চিন্তা* গ্রন্থে কাব্যসংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথের পথেই হেঁটেছেন। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' বিশ্বনাথ কবিরাজের এই বহুচর্চিত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন, এবং বিশ্বনাথের নাম ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেননি—

> *বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: --*
>
> *"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"*
>
> রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। যাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না জন্মে তাহা রসই নহে। সহৃদয় জনগণের চিত্তে করুণাদি স্থায়ী ভাব, বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে, তাহাকেই রস বলে। কাব্যশরীরকে এরূপে গড়িতে হইবে, যদ্দ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার ফলোদয় ঘটে।[30]

---

[28] Sushil Kumar De, *Studies in the History of Sanskrit Poetics: Vol.II* (London: Luzac & Co., 1925), 211.

[29] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩), ১৭।

[30] বসু, *সাহিত্য-চিন্তা*, ৩০। [নজরটান আরোপিত]

জয়গোপাল গোস্বামীর *সাহিত্যমুক্তাবলী* তো প্রায় ঘোষিতভাবেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুবাদ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কাব্যের সংজ্ঞায় সেখানে বিশ্বনাথ কবিরাজেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

> রসাত্মক যে বাক্য তাহার নাম কাব্য। অর্থাৎ রস যাহাতে আত্মারূপে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম কাব্য।[31]

এইভাবেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই অনুকরণ ও অনুসরণ করে রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলার রীতি অতিপ্রচলিত হয়ে উঠছিল উনিশ শতকে। তাই নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় *বিদ্যাসুন্দর*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “অনেকেই কবিরাজের ধুয়া ধরিয়া বলেন, রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য”[32] কেবলমাত্র উনিশ শতকের গ্রন্থলেখক নন, উনিশ শতকের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধলেখকদের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এই প্রবণতা। এই প্রসঙ্গে *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে হয়।

১) ‘কাব্য, কবি ও কবিত্ব’, ‘শ্রীশিঃ’ রচিত (প্রথম বর্ষ, ১২৮১ বঙ্গাব্দ)

২) ‘কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা’, ‘দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য’ রচিত (পঞ্চম বর্ষ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)

৩) ‘নাটক-চন্দ্রিকা’, ‘জটিল সন্ন্যাসী’ রচিত (সপ্তম বর্ষ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)

---

31 গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী*, ২।

32 নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, “ভারতচন্দ্র,” *সাহিত্য* ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৭৫৫।

'কাব্য, কবি ও কবিত্ব' প্রবন্ধের লেখক জন স্টুয়ার্ট মিলের কাব্যভাবনার সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর কাব্যসংজ্ঞার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের একটা তুলনামূলক আলোচনার পরিসর নির্মিত হচ্ছিল এই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সূত্রেই—

> স্বাভাবিক নিয়মে দেখা যায় যে বক্তার ভাবের উত্তেজনা হইলে শ্রোতাদিগেরও ভাবের উত্তেজনা হয়, সুতরাং হৃদয়নিহিত ভাব সকল উত্তেজিত করাই কবিতার লক্ষ্য। জন্ ষ্টুয়াট মিল্ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-কারেরাও কাব্যের এই লক্ষণ দিয়াছেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"। রসাত্মক বাক্যই কাব্য।[33]

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে মিল ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকদের কাব্যবিষয়ক ধারণার সঙ্গে সাহিত্যদর্পণকারের কাব্যভাবনার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছিল—

> সাহিত্য-দর্পণ-কার বলিয়াছেন যে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু ... তিনি [মিল] বলিবেন যে, তাহা হইলে বক্তার বক্তৃিতা ও কবির কবিতা একই পদার্থ। সাহিত্য-দর্পণকার উত্তর কর্‌রিবেন যে যদি বক্তার বক্তৃতা রসাত্মক বাক্য হয় তাহা হইলে সেই বক্তৃতাও কাব্য। মিল প্রত্যুত্তর করিবেন যে, বক্তৃতাতে আর কবিতাতে এমন একটি মর্ম্মগত প্রভেদ আছে যে, সাহিত্য-দর্পণ-কার নিতান্ত বিকৃতমনা না হইলে সেই প্রভেদটি উপলব্ধি করিতেন।[34]

এর পরে লেখক সাহিত্যদর্পণকারের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তকদের মতের ফারাক বেশ বিস্তারিতভাবেই দেখিয়েছেন।[35] সেখানে দেখা যায়, কাব্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মিল-

---

[33] শ্রীশিঃ, "কাব্য, কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ২৭।

[34] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৯২।

[35] এবার সাহিত্য-দর্পণকারের মতটি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। *সাহিত্য-দর্পণকার বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য" – এই 'রস' শব্দ ব্যাবহারে তিনি ইংরেজ আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা কবিতার প্রকৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।* মিল বলেন যে, "আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি যে সকল চিন্তা ও বাক্যের আকারে আপনা আপনি প্রকাশ হয় তাহার নামই কবিতা", এবং রবার্টসন বলেন যে, "উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাবের ভাষার নামই কবিতা" – এইরূপ আরও অনেক আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করা যাইতে

রবার্টসনের তুলনায় বিশ্বনাথের প্রতিই লেখক ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট। একেবারে শেষে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর কাব্যসংজ্ঞার ভিত্তিতেই একটি প্রশ্ন তুলে প্রবন্ধে ইতি টেনেছেন লেখক—

> ...কে বলিতে পারে যে, যে সকল রসাত্মক বাক্য আমরা এক্ষণে "কিছুই নয়" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি – অন্য সময়ে আমরা তাহাকে প্রকৃত কবিতা নামের যোগ্য মনে করিব না; আবার এক্ষণে আমরা যে সকল কাব্যকে বাক্‌দেবীর পদ্মবনের এক একটি প্রকৃত পদ্ম ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে ধরিতেছি, সময়ে সেই সকল কাব্যকেই আমরা পদ দ্বারা দলিত করিব না? তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাহিত্য-দর্পণকারের কথার সার্থকতা কি? যদি রস-অনুভূতিরই এত বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা হইলে কোন নিয়ম দ্বারা আমরা কবিতার প্রকৃতি নিরূপণ করিব? [36]

এই অংশে আমরা প্রথম দেখলাম, *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে ও তার কাব্যসংজ্ঞাকে বিনাপ্রশ্নে মেনে না নিয়ে জরুরি কয়েকটি জিজ্ঞাসা তুলে দেওয়ার মনোভঙ্গি। এও কিন্তু উনিশ শতকের আরেক প্রবণতা। বহুপ্রচলিত ডিসকোর্সের দিকে ছুড়ে দেওয়া সংশয়ের তির। রসানুভূতি যে শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তিগত অনুভব, নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বজালে সর্বদা তাকে বেঁধে ফেলা যায় না; বা বাঁধলেও সেখানে আপেক্ষিকতার প্রশ্নটি থেকেই যায়— এই সচেতনতাই উনিশ শতকের প্রাচ্য-সাহিত্যতত্ত্বভাবনায় এক নতুন আলোকবৃত্ত রচনা করে। তৈরি হয় প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের আবহ। বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞাকে ঘিরে এমনই এক প্রতিপ্রশ্নের আভাস দিয়ে যায় পূর্বোল্লিখিত 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধের

পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কিনা সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। ... এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র যদি কবির হৃদয়ের তালে তালে নিনাদিত না হয় তাহা হইলে কবির কবিত্বই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। *এই যে লেখকের ও পাঠকের মধ্যে মমতা-ভাবটি, ইহা সাহিত্য-দর্পণকারের 'রস' শব্দেই নিহিত আছে।...* [উৎস: চ—, "বঙ্গসাহিত্য," ৯২।] (নজরটান আরোপিত)

[36] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," ২২৩-২৯।

লেখক বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞার একটি ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। রসব্যঞ্জক বাক্যকে কাব্য বললে অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন non-verbal অভিনয়ক্রিয়া কাব্যপরিধির বাইরে থেকে যায়। সেই সম্পর্কেই আপত্তি প্রকাশ করেন *আর্য্যদর্শন*-এর প্রবন্ধরচয়িতা।[37]

অর্থাৎ উনিশ শতকীয় বাঙালি সর্বদাই যে রসাত্মক বাক্যকে কাব্যরূপে গ্রহণের প্রকল্পে মুগ্ধ ও আপ্লুত হয়েছে, এমন নয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের দ্বারা পূর্বসূরিদের মতখণ্ডনের অনন্ত তার্কিক কসরতে তো রীতিমতো ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধের লেখক। তাঁর মতে ক্রমান্বয়িক এই বিবাদময় যুক্তি-প্রতিযুক্তির আড়ালে হারিয়ে গেছে কাব্যের স্বরূপসন্ধানের প্রকৃত প্রচেষ্টা। তাঁর এই ক্ষোভ থেকে অব্যাহতি পাননি বিশ্বনাথ কবিরাজও—

> বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন— "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" উক্ত দোষদাতা ইহাতেও এই দোষ দিয়াছেন, রসাত্মক বাক্য যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে "গোপীভিঃ সহ বিহরতি কৃষ্ণঃ" এ বাক্যটি কাব্য বলিয়া গণ্য না হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই

---

[37] এই মতে (মম্মটের মতে), বাক্যের যৎকিঞ্চিদ্দোষ থাকিলেও তাহা কাব্য হইতে পারে না— ইত্যাদি আপত্তি করিয়া বিশ্বনাথ কবি অন্য-প্রকার কাব্য লক্ষণ করিয়াছেন যথা—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"

আত্মা যেরূপ শরীরকে অধিষ্ঠান করিয়া আছে, অষ্টবিধ রসের মধ্যে কোন রস সেইরূপে বাক্যে অধিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ যে বাক্য শ্রবণ করিলে রস বোধ হয় তাহাই কাব্য! অন্যের লক্ষণে দোষ দেখাইয়া বিশ্বনাথ কবি এই লক্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেও একটি দোষ লক্ষিত হইতেছে ...তাঁহার লক্ষণ দ্বারা নাটকগুলিকে কাব্যরূপে সংগ্রহ করা যায় না। *রসব্যঞ্জক বাক্যই তাঁহার মতে কাব্য। নাটকের সর্ব্বত্র বাক্য প্রয়োগ হয় না। অনেক স্থলে নটেরা কেবল অভিনয় ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী নয়ন জল মোচন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারাই রসবোধ জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং সেই সেই স্থলে রসব্যঞ্জক বাক্য না থাকাতে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এ লক্ষণের সমন্বয় হওয়া কঠিন।* [উৎস: ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ," ৩৯০।] (নজরটান আরোপিত)

> রূপে কেবল বিবাদ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ যে কি, তাহা কেহই বিশদভাবে লেখেন নাই।[38]

আবার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বনাথের কাব্য সংজ্ঞাকে অগ্রাহ্য বা নস্যাৎ করেননি ঠিকই, তবে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে এই সংজ্ঞাকে আরও বেশি সুনির্দিষ্ট করতে চেয়ে তিনি বলেছেন—

> সাহিত্যদর্পণকারের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাটিকে আর একটু খানি বিস্তৃত করা আবশ্যক। আনন্দজনক রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কারণ, যে রসের অবতারণা ভাবুকদিগকে শেষ পর্যন্ত বিমুখ করিয়া রাখে তাহাকে কাব্য বলা যায় না।[39]

এইখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, উপরের উদ্ধৃত অংশটি *ভারতী*-র পত্রিকাপাঠে থাকলেও, বাদ গেছে *সাহিত্য* গ্রন্থের পাঠ[40] থেকে। কেন এই বিয়োজন? বাহুল্যবোধে? ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গের সাপেক্ষে বিশ্বনাথের কাব্যসংজ্ঞা খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়, এ কথা ভেবে অংশটি বর্জন করে থাকতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। নাকি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রত্যক্ষ সমালোচনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন সম্পাদনা-পরবর্তী সময়ে? রবীন্দ্রনাথ-প্রযুক্ত 'আনন্দজনক' ও 'রসাত্মক' শব্দদুটি রসতত্ত্বের নিরিখে কি সমার্থক নয়? রসই তো আনন্দজনক। অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে আনন্দাংশের আবরণ উন্মোচনের ফলেই রসের নিষ্পত্তি। 'ভাবুকদিগকে শেষ পর্যন্ত বিমুখ করিয়া রাখে' এমন রস কি আদৌ সম্ভব? এই তত্ত্বগত ত্রুটি পরবর্তীকালে বুঝতে পারাই কি অংশটি বর্জনের কারণ?

---

[38] জটিল সন্ন্যাসী, "নাট্য পরিশিষ্ট," 'নাটক-চন্দ্রিকা,' *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ৬০।

[39] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঐতিহাসিক উপন্যাস," *ভারতী* ২২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ৫১৩।

[40] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঐতিহাসিক উপন্যাস," *সাহিত্য* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৫৬-১৬২।

এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়তো সম্ভব না। তবে এটুকু বুঝে নেওয়া সম্ভব এইভাবেই কখনও মুগ্ধতায়, কখনও সংশয়ে, কখনও বিস্ময়ে, এমনকি কখনও বিতৃষ্ণায় উনিশ শতকের বাঙালি লেখক-সমালোচকদের কলমে বারবার ফিরে ফিরে এসেছিলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। অজস্রবার উল্লিখিত ও পুনরাবৃত্ত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত কাব্যসংজ্ঞা।

৪.২ উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ* চর্চার অন্যান্য দৃষ্টান্ত

বিশ্বনাথ কবিরাজের কাব্যসংজ্ঞা ছাড়াও *সাহিত্যদর্পণ*-এর অন্যান্য অংশ পাঠের যে প্রমাণ ছড়িয়ে আছে উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব-বিষয়ক ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনায়, এইবার সেইদিকে দৃষ্টি ফেলা প্রয়োজন।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে *ভারতী* পত্রিকায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সমালোচনাকালে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর 'দোষ-পরিচ্ছেদ'-এর উল্লেখ করেছিলেন। 'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা/ ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ/ মজাইছে লঙ্কা মোর'- এই বিশেষ উপমা সম্পর্কে তিনি বললেন—

> উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্য-দর্পণ কার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।[41]

নব্যভারত পত্রিকায় শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত 'শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য' প্রবন্ধে 'ধীরললিত' নায়কের লক্ষণ-বর্ণনায় *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে প্রাপ্ত সংজ্ঞাই ব্যবহৃত হয়েছে—

> নল এই বাক্যের নায়ক নল। অনেকে হয়তো ইঁহাকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলিবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধীরললিত নায়ক বলাই সঙ্গত। ধীরললিত

[41] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ১৩।

> নায়ক নিশ্চিন্ত, মৃদুপ্রকৃতি, সর্ব্বদা নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতিতে রত। * নলও রাজ্যাদির চিন্তায় আসক্ত নন।
>
> [ফুটনোট—] *নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃস্যাৎ।... সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ[42]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-য় 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' প্রবন্ধে প্রহেলিকা অলংকারের প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকারের মত উল্লেখ করেছেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এবং সেখানেই তিনি বিশ্বনাথ কবিরাজকে 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক রুচিবিশিষ্ট আলংকারিক' বলে অভিহিত করেছেন—

> অপেক্ষাকৃত আধুনিক রুচিবিশিষ্ট আলঙ্কারিক সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রহেলিকার বিরোধী। তিনি বলেন, যেহেতু প্রহেলিকা রসের পরিপন্থী, অতএব উহা অলঙ্কারই নহে[43]। যদি আধুনিক পাঠকগণের রুচি পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে সপ্তম খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্ব হইতে যে প্রহেলিকা অলঙ্কারের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল, বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি মাত্র হেতু দেখাইয়াই তাহাকে অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইতেন না।[44]

এই প্রসঙ্গে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'রামায়ণ' প্রবন্ধটিও উল্লেখ্য। এখানে, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচকদের দোষ ধরার মনোবৃত্তিকে সমালোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধকার দুটি বইয়ের প্রসঙ্গ এনেছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*—

> ভাষা যত বেশীকাল অনুশীলিত হয়, ততই লোকে তাহার 'খুঁটিনাটী' ধরিতে আরম্ভ করে। তখন ক্রমে ক্রমে লোকে ভাষার সেই সমস্ত দোষ ধরিতে শিখে, যাহা সাহিত্য-দর্পণ ও কাব্যপ্রকাশের সপ্তম পরিচ্ছেদে সবিস্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা, কাছাকাছি একটী শব্দ দুবার প্রয়োগ করিও না, (কথিত পদত্ব)। শুনিতে কঠোর এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিও

---

[42] শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, "শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য," *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ), ৫৩৬।

[43] রসস্য পরিপন্থিত্বান্নালঙ্কারঃ প্রহেলিকা। [ফুটনোট অংশে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর এই শ্লোকটি উল্লিখিত ছিল।]

[44] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার শাস্ত্র," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ২১৯।

> না, (শ্রুতিকটু)। যাহার শ্রবণে কুৎসিতভাব মনে আইসে এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিও না, (অশ্লীল)।[45]

এখানে যে দোষগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ উল্লিখিত দুঃশ্রবত্ব (শ্রুতিকটু), অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষের মিল পাওয়া যায়।[46] লেখক হয়তো খুব একটা ইতিবাচক অর্থে এখানে দোষ-পরিচ্ছেদের উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর এই উল্লেখ বুঝিয়ে দেয় সেই সময়কার বাঙালি সমালোচকদের প্রাচ্য পদ্ধতিতে সমালোচনার মূল অবলম্বন ছিল এই দুটি বই-ই। *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং *কাব্যপ্রকাশ*।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনায় ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র-নির্দেশিত মহাকাব্যের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সংজ্ঞাকেই আশ্রয় করেছেন[47]। মাইকেল মধুসূদন দত্ত *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর সূচনায় *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে যে শ্লোকটি গ্রহণ করেছিলেন, সেই উদ্ধৃতিও উনিশ শতকীয় আলোচনা-সমালোচনার পরিধিকে ছুঁয়ে ছিল। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রবন্ধে মহাকাব্যিক সময়ের

---

[45] অজ্ঞাত, "রামায়ণ," *ভারতী* ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ): ৩৭৫।

[46] কর্কশ বর্ণনার ফলে শ্রবণকষ্ট হইলে দুঃশ্রবত্ব হয়। দুঃশ্রবতা তিনপ্রকার অশ্লীলতা, অনুচিতার্থতা, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা, অপ্রীততা, সন্দিগ্ধতা, নেয়ার্থতা, নিহতার্থতা, অবাচকত্ব, ক্লিষ্টত্ব, বিরুদ্ধমতিকারিতা ও অবিমৃষ্টবিধেয়াংশতা— এইগুলি হইতেছে দোষ।... লজ্জা, ঘৃণা ও অমঙ্গলের ব্যঞ্জনা ভেদে অশ্লীলতা তিন প্রকার।... [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ৩৫৩-৫৫।]

[47] সাহিত্য দর্পণে আছে:— "কাণ্ড-বিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক, হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্তগুণান্বিত কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে...। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তি এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। বৃত্তান্তটি ইতিহাসোদ্ভব বা সজ্জনাশ্রয় হইবে। উহাতে সমস্ত চতুর্ব্বর্গ ফল কিংবা কোন একটি ফল থাকিবে...।" [উৎস: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য," *ভারতী* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ২৬৬।]

সংঘটনকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ এনেছিলেন বীরেশ্বর গোস্বামী—

> অভিজ্ঞানশকুন্তল ও মালতীমাধব ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে— যে সাহিত্য হইতেও যে সব চরিত্রের অনুকরণে কবি বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন, সে সাহিত্যে কোন নায়িকা পত্র লেখে, এরূপ বোধ হয় না। কাব্যের শীর্ষদেশে সাহিত্য-দর্পণ হইতে কবি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থিত হয় না। কারণ যে "সময়" কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়, সে সময়ের তুলনায় সাহিত্যদর্পণ সম্পূর্ণ আধুনিক বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না।[48]

প্রাচ্য-সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত *সাহিত্যমুক্তাবলী* বইটির নামও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুসরণেই বইটির কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এর একাধিক স্থানে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রভাব, এমনকি অনুকরণ দেখা গেছে। যেমন, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ মম্মটের "তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি" এই কাব্যলক্ষণটি উদ্ধৃত ছিল। দোষহীন গুণযুক্ত বাক্য হলে তবেই তা কাব্যনামের উপযুক্ত মম্মটের এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে "নহি কীটানুবেধাদয়ো রত্নস্য রত্নত্বং ব্যাহন্তুমীশাঃ, কিন্তু উপাদেয়তারতম্যমেব কর্তুম্"— এই দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করেছিলেন সাহিত্যদর্পণকার।[49] *সাহিত্যমুক্তাবলী*-তেও হুবহু এই যুক্তিক্রমকে অনুসরণ করলেন লেখক জয়গোপাল গোস্বামী—

> কেহ কেহ বলেন যে, "যে বাক্য দোষ রহিত, সগুণ, ও সালঙ্কার তাহার নাম কাব্য" কিন্তু একথা সম্ভবপর নহে, কারণ, যে সকল বাক্যের কোন কোন অংশে দোষ আছে, কোনরূপেই তাহার কাব্যত্বের হানি হইতে পারে না; তবে উপাদেয় পক্ষে কিছু তারতম্য হইতে পারে। যেমন

[48] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ১৫২।

[49] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ৭-৮।

> কীটানুবিদ্ধ-রত্নের উপাদেয়তার তারতম্য ব্যতীত রত্নত্বের হানি হয় না, কাব্যেরও অবিকল সেইরূপ।[50]

উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রাচ্য-সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক যে স্বল্পসংখ্যক প্রবন্ধ পাওয়া যায়, তাদের প্রায় সবকটিতেই আছে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অমোঘ উল্লেখ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রস' নামক প্রবন্ধ। সেখানেও রসতত্ত্ব সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনার সঙ্গে যে কাব্যতাত্ত্বিকের নাম এসেছে তিনি হলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। লেখক অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর তুলনা টেনেছেন—

> এই মতেও [অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ] ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে ব্যাপারদ্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভট্টনায়কের মতের উপর কিছু উন্নতি মাত্র। ইঁহার মতে অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রসনিষ্পত্তি হয়। সাহিত্য-দর্পণ কার বিশ্বনাথ কবিরাজও মুখ্যকল্পে এই মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[51]

১৩০৬ বঙ্গাব্দের *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রচিত 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' প্রবন্ধ। এখানে ভারতীয় আলংকারিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এ বাবদে *সাহিত্যদর্পণঃ*-ই যে তাঁর একমাত্র অবলম্বন এমন নয়। যেমন, রীতি সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দণ্ডী উল্লিখিত দুটি (বৈদর্ভী ও গৌড়ী), বামন উল্লিখিত তিনটি (বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী) এবং ভোজ উল্লিখিত ছটি (বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, আবন্তী, লাটী, মাগধী) রীতির নাম উল্লেখ করেছেন। শেষে বলেছেন—

> সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রীতি চারি প্রকার যথা, বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটিকা। আমরা এ স্থলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের

---

[50] গোস্বামী, *সাহিত্যমুক্তাবলী,* ২।

[51] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭৫।

> মত অনুসরণ করিয়া যথাক্রমে ছয় প্রকার রীতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।[52]

এই একটি ক্ষেত্রে ভোজকে বেশি গুরুত্ব দিলেও ভাব-রস-গুণ-ভাবাভাস-রসাভাস প্রভৃতি একাধিক বিষয় বোঝাতে গিয়ে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ভাষা ও রূপরেখাকেই অনেকাংশে অনুসরণ করেছেন। একটি ছকের মাধ্যমে 'অলঙ্কারশাস্ত্র' এবং *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সাদৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল[53]—

অলঙ্কারশাস্ত্র '	সাহিত্যদর্পণ '
১) যে গুণ থাকিলে কাব্যের শ্রবণ বা পাঠমাত্র হৃদয় বিস্তৃত হয় অর্থাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্ররসে ইহার আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। (পৃষ্ঠা ২১৬)	১) চিত্তবিস্তাররূপ দীপ্তত্বকে ওজঃ বলে। বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসে ক্রমানুসারে ইহার আধিক্য হয়। (পৃষ্ঠা ৬৬৯)
২) যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহাকে মাধুর্য গুণ বলে। আদিরস, করুণরস ও শান্তরসে এই গুণের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। (পৃষ্ঠা ২১৫-১৬)	২) চিত্তের দ্রবীভাবস্বরূপ আনন্দকে মাধুর্য বলে...(পৃষ্ঠা ৬৬৬)
৩) রসাভাস ও ভাবাভাস। অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণনা করিলে রসাভাস হয় এবং ভাবের বর্ণনা করিলে ভাবাভাস হয়। অনুচিত বিষয় যথা; -- (১) উপনায়কে, গুরুপত্নীতে, বহুনায়কে এবং প্রতিনায়কে রতির বর্ণনা (২) অধম পাত্র তির্যকজাতি প্রভৃতিতে আদি রসের বর্ণনা (৩) গুরুজনকে লক্ষ্য করিয়া রৌদ্ররসের বর্ণনা (৪) দীন ব্যক্তিতে শান্তরসের বর্ণনা (পৃষ্ঠা ২০৯)	৩) অনন্তর, রসাভাস, ভাবাভাস -- অনৌচিত্যসত্ত্বেও (রস ও ভাব) বর্ত্তমান থাকিলে, রস ও ভাবের আভাস হয়। রতি উপনায়কসংস্থিত, মুনি ও গুরুপত্নীগত, বহু নায়ককে আশ্রিত হইলে, (নায়ক-নায়িকা) উভয়ের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন না হইলে, প্রতিনায়কের প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং অধমপাত্র ও তির্যক প্রাণীগত হইলে শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রে অনৌচিত্য ঘটে; গুরু প্রভৃতির প্রতি কোপ হইলে রৌদ্ররসের ক্ষেত্রে, হীনের প্রতি নিষ্ঠায় শান্তরসের ক্ষেত্রে... (পৃষ্ঠা ২৭৭-৭৮)
৪) ভাবশান্তি (পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি), ভাবোদয় (এক ভাবের পর অন্য ভাবের উদয়), ভাবসন্ধি (দুই ভাবের পরস্পর মিলন), ভাবশবলতা (বহু ভাবের একত্র মিলন) (পৃষ্ঠা ২০৯)	৪) ভাবের উপশম, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণ হইলে যথাক্রমে ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা হয় (ইহাই আলংকারিকগণের) অভিমত। (পৃষ্ঠা ২৮৪)

---

[52] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," *সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ২০৯-১০।

[53] শাস্ত্রী, "অলঙ্কার-শাস্ত্র," পৃষ্ঠাসংখ্যা মূল প্রবন্ধের ছকে উল্লিখিত।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), পৃষ্ঠাসংখ্যা মূল প্রবন্ধের ছকে উল্লিখিত।

বলা বাহুল্য, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর নিবিড় পাঠ ব্যতীত, তার সমস্ত উদাহরণ-উপমা-দৃষ্টান্তসমেত তাকে এইভাবে আলোচনার বৃত্তে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা কতখানি গভীর ছিল, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে; কিন্তু *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্পর্কে বাঙালির আগ্রহ তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

৪.৩ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর জনপ্রিয়তা: পরিসংখ্যানগত সাক্ষ্য

উনিশ শতকে *সাহিত্যদর্পণঃ* ছাড়া কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক আর কোনও বইয়েরই যে উল্লেখ পাওয়া যায়নি, এমন নয়। উনিশ শতকের বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত যে সব প্রবন্ধ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে কোন কোন আলংকারিকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তার একটি তালিকা করলে বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভরতার মিথকে যাচাই করা সম্ভব। নিচে *বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নব্যভারত ও আৰ্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোন কোন আলংকারিকদের নাম এসেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল। যাঁদের নাম একই প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে, এ তালিকায় তাঁরা একবার করেই স্থান পেয়েছেন। এখান থেকে উনিশ শতকের সমস্ত সাহিত্য-বিষয়ক-পত্রিকার সামগ্রিক ধারণা পাওয়া না গেলেও, বাংলা সাহিত্যচর্চার মূলধারায় কোন কোন আলংকারিক সবচেয়ে বেশি চর্চিত হতেন, তার একটা পরিসংখ্যানগত হদিশ পাওয়া সম্ভব।

উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্রিকায় সংস্কৃত আলংকারিকদের উল্লেখ

পত্রিকার নাম	বর্ষ	সংখ্যা (মাস)	প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের নাম	প্রবন্ধে উল্লিখিত আলংকারিক/অলংকার-গ্রন্থের নাম
বঙ্গদর্শন	প্রথম (১২৭৯ বঙ্গাব্দ)	ফাল্গুন	শ্রীহর্ষ - রামদাস সেন	মম্মটভট্ট - *কাব্যপ্রকাশ*
				ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*
				ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*
	তৃতীয় (১২৮১ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	শ্রীহর্ষ – রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (রামদাস সেনের প্রবন্ধের বিরোধিতা)	ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*
				ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*
	চতুর্থ (১২৮২ বঙ্গাব্দ)	শ্রাবণ	নাটক পরিচ্ছেদ	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর নাম উল্লেখ না থাকলেও বাংলা নাটকের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই অনুসরণ করা হয়েছে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবও সেভাবে দেখা যায় না।
	ষষ্ঠ (১২৮৫ বঙ্গাব্দ)	পৌষ	বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	কাব্যের উপদেশ কান্তার উপদেশের ন্যায় (প্রবন্ধে বিশেষ কোনও আলংকারিকের নাম না থাকলেও এটি মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর প্রথম উল্লাসে উল্লিখিত কাব্যের ছটি প্রয়োজনের অন্তর্গত)
	সপ্তম (১২৮৭ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	নৈষধ সমালোচন	মম্মটভট্ট - *কাব্যপ্রকাশ*
	অষ্টম (১২৮৬ বঙ্গাব্দ)		রস	ভট্টলোল্লট
				ভট্টশঙ্কুক
				ভট্টনায়ক
				নারায়ণ
				বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*

ভারতী	প্রথম (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)	আষাঢ়	মেঘনাদবধ কাব্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
	প্রথম (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)	অগ্রহায়ণ	বঙ্গসাহিত্য	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
	প্রথম (১২৮৫ বঙ্গাব্দ)	জ্যৈষ্ঠ	বঙ্গসাহিত্য	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
	ষষ্ঠ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)	আষাঢ়	মেঘনাদবধ কাব্য - জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	মহাকাব্যের আদর্শ নায়কের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই অনুসরণ করেছেন।
	একাদশ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	মহাকবি রাজশেখর	ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* *ঔচিত্যবিচারচর্য্যা* *শার্ঙ্গরব পদ্ধতি*
সাহিত্য	অষ্টম (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)	চৈত্র	রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ - সতীশচন্দ্র রায়	ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা	পঞ্চম (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল - শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	*সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুসরণ করে চার শ্রেণির নায়কের উল্লেখ
	ষষ্ঠ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	ভবভূতি - সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*
	ষষ্ঠ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)	কার্তিক	অলঙ্কারশাস্ত্র - শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	ভরত - *নাট্যশাস্ত্র* দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* রুদ্রটের *কাব্যালঙ্কার* বামনের *কাব্যালঙ্কারবৃত্তি* ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* মহিমভট্টের *ব্যক্তিবিবেক*

				শৌদ্ধদনিসূত্র
				বাভটালঙ্কার
				অভিনবগুপ্ত (*অভিনবভারতী, লোচনটীকা*)
				বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
				পীযূষবর্ষকৃত *চন্দ্রালোক*
				অপ্যদীক্ষিতকৃত *চিত্রমীমাংসা* এবং *কুবলয়ানন্দ*
				গোবিন্দ ঠক্কুরের *কাব্যপ্রদীপ*
				জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর*
				কেশবমিশ্রের *অলঙ্কারশেখর*
				প্রভাকরের *অলঙ্কাররহস্য*
	তৃতীয় (১২৯১ বঙ্গাব্দ)	ফাল্গুন	ভবভূতি - যোগীন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
				ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*
	চতুর্থ (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)	অগ্রহায়ণ	বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা - ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*
				ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*
				বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
	পঞ্চম (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)	ফাল্গুন	বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা - ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*
নব্যভারত	ষষ্ঠ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)	আশ্বিন	বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা - ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	ন্যায়বাগীশ - *কাব্যচন্দ্রিকা*
	সপ্তম (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)	শ্রাবণ	বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা - ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার - *সাহিত্যবিচার*
	অষ্টম(১২৯৭ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব - সুরেশচন্দ্র বল	ভরত - *নাট্যশাস্ত্র*
	নবম (১২৯৮ বঙ্গাব্দ)	মাঘ, চৈত্র	শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য - শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
				মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*

	একাদশ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)	জ্যৈষ্ঠ	মেঘনাদবধ-চিত্র (পঞ্চম প্রস্তাব) - যোগীন্দ্রনাথ বসু	মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*
		আষাঢ়	বীরাঙ্গনা কাব্য - বীরেশ্বর গোস্বামী	বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*
				মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*
	দ্বাদশ (১৩০১ বঙ্গাব্দ)	কার্তিক	বঙ্গের আদি কবি শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর	ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী*
	ষোড়শ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)	পৌষ	দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল - শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*
				ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*
				মম্মট - *কাব্যপ্রকাশ*
	সপ্তদশ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)	জ্যৈষ্ঠ	শূলপাণি ভট্টাচার্য্য - ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	মম্মট - *কাব্যপ্রকাশ*
আর্য্যদর্শন	প্রথম (১২৮১ বঙ্গাব্দ)	বৈশাখ	কাব্য, কবি ও কবিত্ব - শ্রীশিঃ	*সাহিত্যদর্পণঃ*-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।
	পঞ্চম (১২৮৫ বঙ্গাব্দ)	পৌষ	কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা - দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য	*সাহিত্যদর্পণঃ*-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।
				মম্মট - *কাব্যপ্রকাশ*
				দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*
				কুন্তক
				ভরত - *নাট্যশাস্ত্র*
	ষষ্ঠ (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) ও সপ্তম (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)	ধারাবাহিক	নাটক-চন্দ্রিকা - জটিল সন্ন্যাসী	ভরত - *নাট্যশাস্ত্র*
				অগ্নিপুরাণ
				বিশ্বনাথ কবিরাজ - *সাহিত্যদর্পণঃ*
				মাতৃগুপ্ত - *নাটক-দীপিকা*
				নাটক-দর্পণ
				ভানুদত্ত - *রসতরঙ্গিণী*
				নালকান্তদীক্ষিত - *অর্থদ্যোতনিকা*

				রঙ্গনাথ আচার্য্য - *নাট্যদর্পণ, নাট্যলোচন, রূপচিন্তামণি*
				রায়মুকুট, ভানুজীদীক্ষিত ও মহাদেব বেদান্তী - *নাটক রত্নকোষ*

এই ছকে যেসব আলংকারিকের নাম (বা তাঁদের গ্রন্থের নাম) একাধিক প্রবন্ধে এসেছে তাঁরা হলেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ (তেরোটি প্রবন্ধে সরাসরি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তিনটি প্রবন্ধে তাঁর গ্রন্থের প্রভাব আছে), মম্মটভট্ট (তেরোটি প্রবন্ধে সরাসরি নামের উল্লেখ আছে, একটি প্রবন্ধে তাঁর নাম না দিয়ে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে), ধনঞ্জয় (সাতটি প্রবন্ধে উল্লেখ), দণ্ডী (পাঁচটি প্রবন্ধে উল্লেখ), ভোজ (পাঁচটি প্রবন্ধে উল্লেখ), ভরত (চারটি প্রবন্ধে উল্লেখ) এবং অভিনবগুপ্ত (একটি প্রবন্ধে উল্লেখ)।

দেখা যাচ্ছে এই তালিকাতেও এগিয়ে রয়েছেন সেই বিশ্বনাথ এবং মম্মট। আরও আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের জনক বলে পরিচিত ভরতের নাম এই তালিকায় এল মাত্র চারবার! নিঃসন্দেহে এই তালিকা অসম্পূর্ণ এবং এখান থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। যেহেতু উনিশ শতকের নির্বাচিত সাহিত্য-বিষয়ক-পত্রিকাগুলিকে এই পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই পত্রিকার সংখ্যা ও প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়িয়ে এই পরিসংখ্যানকে আরও নির্ভুল করে তোলা সম্ভব ঠিকই। তবে বর্তমান তালিকাও বাঙালির প্রাচ্য-সাহিত্যতত্ত্ব পাঠের মূল প্রবণতা চিহ্নিতকরণের দিশা দেখানোর জন্য অনুপযুক্ত নয়। সুতরাং এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় উনিশ শতকের বাঙালির সাহিত্যতাত্ত্বিক জ্ঞান কেবল *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভর না হলেও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতি বাঙালির কিছুটা পক্ষপাত ছিলই। উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের অন্যান্য তাত্ত্বিক বইগুলিকে

উপেক্ষা করেছিল বলে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য যে আক্ষেপ ব্যক্ত করেছিলেন তা নেহাত অমূলক নয়।

৪.৪ প্রসঙ্গ: পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থ

পরিসংখ্যানগত দিক থেকে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর জনপ্রিয়তা প্রমাণের আরও একটি উপায় হল এর প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য। *নব্যভারত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধটি উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃত চর্চার এক অনুপুঙ্খ ইতিহাস। এই প্রবন্ধ থেকে *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রথম মুদ্রণের যে সাল পাওয়া যায়, তা হল ১৮২৮। এটি মুদ্রিত হয়েছিল 'সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ১৮৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সংস্কৃত শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে *সাহিত্যদর্পণঃ* এবং *কাব্যপ্রকাশ* পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন[54]। অনুমান করা যায় তাঁর প্রাপ্ত *সাহিত্যদর্পণঃ*-টি ১৮২৮-এরই সংস্করণ। এই তথ্যও জানা যায় যে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর এই সংস্করণটি 'নিঃশেষিতরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। এই জন্যই নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হয়।' এরপর *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রকাশিত হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশক ছিলেন ড. রোয়ার।

তার পনেরো বছর পর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করেন বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ড. বেলেন্টাইন্। তাঁর মৃত্যুর পর তা শেষ করেন

[54] কুমার মদনমোহন, "প্রবেশক," সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১৯।

প্রমদাদাস মিত্র।[55] একই প্রবন্ধের অন্য আরেক স্থানে বলা হয়েছে, ড. বেলেন্টাইন্ ১৮৬১ সালে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রথমাংশ প্রকাশ করেন।[56]

সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে *সাহিত্যদর্পণঃ* কেবল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে তা ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালিদেরও পাঠযোগ্য হয়ে ওঠে। সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজি শিক্ষিত— উভয় মহলে চাহিদা না থাকলে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর এতগুলি সংস্করণ সম্ভবপর হত না। তাছাড়া *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর রামচরণ তর্কবাগীশকৃত-টীকা হাতেলেখা পুথি থেকে পড়ার রীতি যে সংস্কৃত কলেজে ছিল সে কথা জানা যায় *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিত্ব* বই থেকে। এই বইয়ের প্রকাশকাল অর্থাৎ ১৮৯২-এর কাছাকাছি সময়ে ভুবনমোহন বসাক যে সেই টীকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সে কথাও জানা যায়[57]—

> সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রামচরণকৃত টীকা মুদ্রিত হয় নাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তর্কবাগীশের নিজের যে একখানি হস্তলিখিত টীকা ছিল তাহা ছাত্রদের ব্যবহার নিমিত্ত অলঙ্কারশ্রেণীতে রাখিতেন। ছাত্রেরা পুথির এখানকার সেখানকার পাতা বাহির করিয়া আপন আপন বাসায়

---

[55] ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর রোয়ার প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্য-দর্পণ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত সাহিত্য-দর্পণ নিঃশেষিতরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। এই জন্যই নতুন সংস্করণের প্রয়োজন হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কালেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ডাক্তর বেলেন্টাইন্ সাহিত্যদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু প্রমদাদাস মিত্র উহা সমাপ্ত করেন। [উৎস: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩১৫।]

[56] ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রথমাংশের ও কপিলসূত্রের (১৮৬২) অনুবাদক ডাক্তর বেলেন্টাইন স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্য সহ শাণ্ডিল্য মুনি-প্রণীত ভক্তিসূত্র প্রকাশিত করেন। [উৎস: ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," ৩১৮।]

[57] রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিত্ব* (কলকাতা: রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২), ৫৩। [ফুটনোট – শুনিলাম ঐ টীকা শ্রীভুবনমোহন বসাক সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন।]

> লইয়া যাইতেন। অধ্যাপনা সময়ে কখন কখন দেখিবার আবশ্যক হইলে পত্র মিলিত না। এই নিমিত্ত পুথির পাতা সকল কেহ আপন বাসায় লইয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তর্কবাগীশ নিষেধ করিয়াছিলেন।[58]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা*-র ভূমিকা থেকে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। সুশীল কুমার দে ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দকে *সাহিত্যদর্পণঃ* রচনার সম্ভাব্য সময়কাল বলে নির্দেশ করেছেন।[59] অন্যদিকে পি ভি কানে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সম্ভাব্য সময়কাল বলে চিহ্নিত করেছেন ১৩০০-১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ– এই সময়পর্বকে।[60] মনিয়র উইলিয়ামস সংস্কৃত সাহিত্যের দুই প্রকার পাণ্ডুলিপি (পাণ্ডুলিপির উত্তর ভারতীয় সংস্করণ এবং গৌড়ীয় সংস্করণ)-র পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর একটি পাণ্ডুলিপি যেহেতু ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দের সময়চিহ্ন বহন করে, তাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির গৌড়ীয় (বাঙালি) সংস্করণও যে নিতান্ত অর্বাচীন নয়, তা প্রমাণিত।[61] অর্থাৎ উনিশ শতকে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পাণ্ডুলিপি-চর্চাও দুর্লভ ছিল না।

---

[58] চট্টোপাধ্যায়, *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিত্ব*, ৫৩।

[59] ... we may assign Visvanatha to a period between 1300 and 1350 A.D. [Source: S. K. De, *History of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1960), 214.]

[60] From these two circumstances it follows that the Sahityadarpana was composed at some time between 1300 A.D and 1384 A.D [Source: P. V. Kane, *History of Sanskrit Poetics* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971), 302.]

[61] German scholars distinguish these two classes of manuscripts by the names “Devanagari recension” and “Bengali recension” ...The Devanagari recension is older and purer: the Bengali, however, must have existed atleast 400 years, since it is followed by the “Sahitya-darpan”, one MS of which bears the date 1504 of our era. [উৎস: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *শকুন্তলা*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০১৯), ভূমিকা অংশ]

৪.৫ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান

কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতি এই মনোযোগের কারণ কী? যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের অধিকাংশ টেক্সটই পড়ে থাকছে উপেক্ষার অন্ধকারে, সেখানে কেনই বা *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্পর্কে আগ্রহ দেখাল উনিশ শতকের বাঙালি? *সাহিত্যদর্পণঃ*-লেখক বিশ্বনাথ কবিরাজের জীবনবৃত্তের দিকে দৃষ্টি ফেললে দেখা যায় বিশ্বনাথ ছিলেন উড়িষ্যার অধিবাসী। বিখ্যাত ভারতীয় আলংকারিকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। মম্মটভট্ট, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, লোল্লট, শঙ্কুক, আনন্দবর্ধন, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, কুন্তক, মহিমভট্ট, ক্ষেমেন্দ্র— এঁরা সকলেই ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী, রাজশেখর দাক্ষিণাত্যের, ধনঞ্জয়-ধনিক-ভোজ ছিলেন মালবের অধিবাসী।

বিশ্বনাথের ছিল বংশানুক্রমিক পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের খ্যাতি। কবিরাজ উপাধিই বুঝিয়ে দেয় তিনি নিজেও কবিত্বগুণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। যিনি নিজে কবি, তাঁর লেখাই কাব্যতত্ত্ব হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য, এরকম কোনও ধারণা কি জন্ম নিয়েছিল সেকালের বাংলা-সাহিত্যচর্চার পরিসরে? উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— যাঁরাই সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করেছেন, তাঁরা নিজেরাও অনেকেই ছিলেন রসসাহিত্য-রচয়িতা। রসসাহিত্য-রচয়িতাদের কাব্যতত্ত্বকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রণোদনা কি বাঙালির মধ্যে কাজ করেছিল? নাকি উড়িষ্যায় সঙ্গে বাংলার স্থানগত নৈকট্যের কারণে বিশ্বনাথকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল বাঙালির?

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের মতোই অবন্তীকুমার সান্যালও যথেষ্ট আক্ষেপের সুরে বলেছেন, "বাংলাদেশে বহুকাল পর্যন্ত 'সাহিত্য-দর্পণে'র যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তাতে

বাঙালীর রসবোধ মোটেই প্রশংসিত হয় না।”[62] এখন, মনে রাখা দরকার, কাব্যতত্ত্ব যত না রসবোধ দ্বারা উপলব্ধি করার, তার চেয়ে ঢের বেশি বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে যাচাই করার বিষয়। তাছাড়া *সাহিত্যদর্পণঃ* কি কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে এতটাই উপেক্ষণীয়?

সাহিত্যদর্পণঃ-এর একটি ইতিবাচক দিক ছিল, এর সম্পূর্ণতা। সুশীল কুমার দে *History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে ‘suitable and complete manual of Poetics, including a treatment of the dramatic art’[63] হিসেবে এর জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন। দণ্ডী, মম্মট, জগন্নাথের মতো কাব্যতাত্ত্বিকরা তাঁদের আলোচনায় নাট্যতত্ত্বকে একেবারে উপেক্ষা করে গেছেন। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সূচনাবিন্দুই যেখানে নাট্যতত্ত্ব, সেখানে নাট্যতত্ত্বের উল্লেখ একেবারে এড়িয়ে গেলে গ্রন্থে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অবন্তীকুমার সান্যাল নিজেও স্বীকার করেছেন—

> ‘সাহিত্য-দর্পণ’ গ্রন্থে অলঙ্কারসহ সমগ্র দৃশ্যকাব্য ও নাট্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এদিক থেকে সাহিত্য-দর্পণ সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সম্পূর্ণ গ্রন্থ।[64]

মম্মটভট্ট রচিত *কাব্যপ্রকাশ*-এর ভূমিকায় এ বি গজেন্দ্রগডকার এই কারণেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে *কাব্যপ্রকাশ*-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছেন—

> The Sahitya Darpana is really superior to the Kavya Prakasha because of the treatment of the science of rhetoric in all its branches…[65]

---

[62] সান্যাল, “ভূমিকা,” কুড়ি।

[63] S. K. De, *History of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1960), 228.

[64] সান্যাল, “ভূমিকা,” পনের।

[65] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, “উপক্রমণিকা,” *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ,* অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ঊ।

পি ভি কানেও স্বয়ংসম্পূর্ণতাকেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সবচেয়ে তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন—

> …the greatest merit of the Sahitya Darpana is that it presents in the compass of a single work a full and complete treatment of the science of rhetoric in all its branches. … The Sahitya Darpana… contains a thorough disquisition on the technicalities of the Dramatic art and forms, together with the Natya-sastra of Bharata and and Dasarupa of Dhananjaya… Another merit of the work is that it is written in simple and flowing style.[66]

এই ‘simple and flowing style’ অর্থাৎ সাবলীলতা ও সহজবোধ্যতা *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর আরেকটি ইতিবাচক দিক যা বাঙালিকে বইটির দিকে আকৃষ্ট করেছিল। গজেন্দ্রগডকারও এর ‘easy and flowing style’, ‘clear and precise definitions’ এবং ‘systematic exposition of the topics’[67] -এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার সুশীল কুমার দে বলেছেন—

> The Sahitya-darpana, written like the Kavya-prakasha in the form of Karika and Vritti, has also the great merit of being written in a more simple and less controversial style than the treatise of Mammata and Jagannatha respectively.[68]

উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে *সাহিত্যদর্পণঃ* জনপ্রিয় হওয়ার আরও একটি কারণ অনুমান করা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে ধ্বনিবাদের বিকাশের প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন।[69] আসলে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণভাবে রসতত্ত্বনির্ভর। বিশ্বনাথ ছিলেন অভিনবগুপ্তের গোঁড়া অনুবর্তী। দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, বামন

---

[66] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, “কথামুখ,” *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ*, গ।

[67] মুখোপাধ্যায়, “উপক্রমণিকা,” ঊ।

[68] S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, 228.

[69] ...his work is interesting in the history of Sanskrit Poetics as an attempt at a further development of the Dhvani theory. [Source: De, *History of Sanskrit Poetics*, 227.]

এঁরা কাব্যের দোষ-রীতি-অলংকার এই সবকিছুকে রস থেকে পৃথক করে আলোচনা করেছেন। বিশ্বনাথ অলংকার-দোষ-গুণ-রীতি-ধ্বনি ইত্যাদির আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু এ সবেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন রসের সাপেক্ষে। এমনকি অভিনবগুপ্তের থেকে আরও একধাপ এগিয়ে রসের সঙ্গে সম্পর্কহীন বস্তু ও অলংকারধ্বনিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন তিনি। আনন্দবর্ধনের মতো ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা না বলে তিনি কাব্যের আত্মা বললেন সোজাসুজি রসকেই। ধ্বনি তাঁর কাছে রসেরই সমার্থক। এখন, ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদই ছিল সবচেয়ে আধুনিক মত। পূর্বাচার্যদের মত অসামান্য নৈপুণ্যে খণ্ডন করে অভিব্যক্তিবাদ তথা রসের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন অভিনবগুপ্ত। সেই মত পরবর্তী কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে এমনই সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তেমন কোনও প্রতিবাদী মতই পরবর্তীকালে খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি। সমকালীন কুন্তক এবং মহিমভট্ট অভিনবগুপ্তের মতকে অনুসরণ করেননি। তাঁরা প্রায় উপেক্ষিতই হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্র ও ভোজরাজ অভিনবগুপ্তের মত থেকে সরে এলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে রসবাদ ও অভিনবগুপ্তের জনপ্রিয়তা ছিল অবিসংবাদিত। মাণিক্য চন্দ্রসূরি রসতত্ত্ব সম্বন্ধে ভট্টলোল্লট, ভট্টনায়কের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেছেন, “রসতত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু তার সবই গুপ্তপাদের জানা”[70]। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে রসবাদের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে অলংকারশাস্ত্রের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায় রসশাস্ত্র। আর এই রসতত্ত্বকে অবলম্বন করেছিলেন বলেই উনিশ শতকীয় বাঙালির কাছে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের সমার্থক হয়ে উঠলেন সাহিত্যদর্পণকার।

---

[70] সান্যাল, “ভূমিকা,” ষোলো।

সাহিত্যদর্পণঃ-এ মৌলিকতার অভাব থাকলেও এর বিশ্লেষণীশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং সুসংহত যুক্তিপরম্পরার পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি প্রায় কেউই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে ‘most remarkable work on Sanskrit Rhetoric’[71] বলে উল্লেখ করেছেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর মুখবন্ধে বিশ্বনাথ কবিরাজকে ‘one of the greatest authorities of Indian Poetics’[72]-এর মর্যাদা দিয়েছেন। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর উপক্রমণিকায় বলেছেন—

> অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশ্বনাথের মৌলিক অবদান না থাকিলেও পরবর্ত্তী আলংকারিকদের ওপর তাহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। বিশ্বনাথের অভিমতের যেমন সমালোচনা হইয়াছে— তেমনি অনেকক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত ও পদ্ধতি গ্রহণ করাও হইয়াছে।[73]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্পর্কে লেখেন—

> Being such an important and valuable work, it naturally *obtained the highest esteem from interested scholars* for all these centuries after it first came out; and Sahitya-Darpana is *one of the most widely read treaties on Indian Poetics and Aesthetics.*[74]

সাহিত্যদর্পণঃ-এ যেভাবে ভারতীয় নাট্য ও কাব্যতত্ত্বের এক পূর্ণাঙ্গ ও সাবলীল পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল, কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক আর কোনও বই-ই তা করতে পারেনি। অবন্তীকুমার সান্যাল তাই *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্পর্কে খুব একটা অনুকূল মনোভাব দেখাতে

---

[71] চট্টোপাধ্যায়, “কথামুখ,” খ-গ।

[72] চট্টোপাধ্যায়, “কথামুখ,” খ।

[73] মুখোপাধ্যায়, “উপক্রমণিকা,” উ।

[74] চট্টোপাধ্যায়, “কথামুখ,” গ। [নজরটান আরোপিত]

না পারলেও এ কথা অস্বীকার করতে পারেননি যে “প্রাথমিক প্রবেশার্থীর জন্য এই গ্রন্থ অপরিহার্য।”[75] সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ভূমিকায় বলেছেন—

> সাহিত্য-দর্পণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার পূর্ণাঙ্গত্ব।... অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলিপ্সু বিদ্যার্থী সাহিত্য-দর্পণ প্রথমে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।[76]

আসলে, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় সদ্যোস্নাত উনিশ শতকীয় বাঙালির ভূমিকা ছিল ‘প্রবেশার্থী’র বা ‘ব্যুৎপত্তিলিপ্সু বিদ্যার্থী’র। আর কাব্যতত্ত্বের ‘টেক্সট বুক’ হিসেবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-ই ছিল সবচেয়ে সহজবোধ্য এবং সুবিধেজনক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই মেকলে মিনিট (১৮৩৫)-এর প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাই গৃহীত হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষানীতি হিসেবে। ততদিনে ইংরাজি মাধ্যমই হয়ে উঠছে শিক্ষিত বাঙালির বিদ্যায়তনিক চর্চার মাধ্যম। যোগসূত্র ক্ষীণ হচ্ছে বাংলা-সংস্কৃতের পূর্বপরম্পরার সঙ্গে। মিল-বেন্থাম প্রমুখের দর্শন, শেক্সপিয়ার, মিলটন, স্কট, শেলি, কিটস, বায়রন প্রমুখের রসসাহিত্য তখন আলোড়িত করছে তাদের মনোজগৎ। বিপুলভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত সেই মন ও মননে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত নতুন এক পরিসর। টোল-চতুষ্পাঠীর সনাতন বাতাবরণের বাইরে যার চর্চা বাঙালি নতুন করে শুরু করেছে, প্রধানত ম্যাক্সমুলার, উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদের প্রেরণায়। এ ছিল জাতীয়তাবাদের ধারণায় প্রাণিত বাঙালির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার-প্রয়াসের অংশমাত্র। সেই কারণেই তাদের প্রয়োজন ছিল কাঠিন্য, অস্পষ্টতা ও জটিলতাহীন এক প্রকল্প যা তাঁদের সহজে পৌঁছে দেবে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পৃথিবীতে। যা তাঁদের দেবে দ্বিধা-উভবলতাহীন (unambiguous) একমুখী এবং পূর্ণাঙ্গ এক বয়ান। যা সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ঐশ্বর্যময় ও

---

[75] সান্যাল, “ভূমিকা,” কুড়ি।

[76] সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, “ভূমিকা,” *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ,* ।।৮০।

ব্যাপ্ত পরিসরের সঙ্গে তাঁদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়ে দেবে। সে কারণে *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। *সাহিত্যদর্পণঃ* হয়ে উঠেছিল তাঁদের দ্বারা সর্বাধিক আদৃত কাব্যতত্ত্বগ্রন্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য

উনিশ শতকের বাংলায় ধ্বনিবাদ বা রসবাদের চর্চা তেমন গুরুত্ব পায়নি— এমন একটি মত সমালোচকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নন্দিতা বসু রচিত *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক* বইতে বাঙালির ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে আলোচনায় এই দিকটিই উঠে এসেছিল। উনিশ শতকে প্রকাশিত লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

> কাব্যনির্ণয়-এ সংস্কৃত শব্দ ও অর্থ অলংকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাব্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শ্রেণীবিভাগ এবং উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে যে বৃহৎ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার আলোচনা হয়নি। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ঐশ্বর্যময় দিক অর্থাৎ ধ্বনিবাদ বা রসবাদের উল্লেখও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় দেখা যায় না।[1]

কিন্তু উনিশ শতকে প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকাগুলির নিবিড় পাঠে উপরোক্ত বক্তব্যের অসম্পূর্ণতাই ধরা পড়ে যায়। সত্যিই কি উনিশ শতক ধ্বনিবাদ ও রসবাদের আলোচনা-বর্জিত এক সময়খণ্ড?

উনিশ শতকের নানা গ্রন্থে বা পত্রপত্রিকায় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা এবং রসসাহিত্যের সমালোচনায় ধ্বনি, ব্যঙ্গ বা ধ্বনিবাদের উল্লেখ খুবই বিরল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় জটিল সন্ন্যাসী ছদ্মনামে 'নাটক-চন্দ্রিকা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে ধ্বনিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়—

---

[1] নন্দিতা বসু, *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক* (কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৬), ১১১।

> ইনিও [বিশ্বনাথ] ব্যাঙ্গোক্তিকে উত্তম কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা–
>
> ‘উত্তমং ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে
> মধ্যমে তত্র মধ্যমং।
> অবরং তত্র নিস্পন্দ
> ইতি ত্রিবিধমাদিতঃ।।
>
> ধ্বনি শব্দের অর্থ ব্যঙ্গ। ইনি ব্যঙ্গোক্তিকে উত্তম কাব্য বলিয়া, শেষে আবার উত্তমোত্তম কাব্য বলিয়া আর একটী শাখা বাহির করিয়াছেন। ইনি বলেন— ধ্বনি হইতে আর একটী হইলে, তাহাকে উত্তমোত্তম কাব্য বলা যায়।...
>
> অধিক আর কি বলিব, প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি লইয়া এত আলোচনা করিয়াছেন যে, মহাত্মা অভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য কেবল ধ্বনি সম্বন্ধে বিচার করিবার নিমিত্ত ধ্বন্যালোক নামে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেবল ধ্বনিসম্বন্ধে অত কথা লিখিবার তত প্রয়োজন ছিল কি না তাহা ধ্বন্যালোক গ্রন্থ পাঠ না করিলে এক জনকে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার।[2]

এই উদ্ধৃতি থেকে উনিশ শতকে ধ্বনিবাদ-চর্চার পরিসর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। এখানে *ধ্বন্যালোক*-রচয়িতা হিসেবে অভিনবগুপ্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আনন্দবর্ধনকে নয়। ‘ধ্বনি’ সম্পর্কে তেমন কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। তবে উদ্ধৃতির ভাষা দেখে মনে হয় প্রাবন্ধিকের নিজের *ধ্বন্যালোক* পাঠ করার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং ধ্বনিবাদের চর্চা উনিশ শতকে ছিল না— এই তথ্য সম্পূর্ণভাবে সত্যি নয়।

তবে, উনিশ শতকে ধ্বনিবাদ-চর্চার অভাব-সংক্রান্ত অভিযোগের কিছু তথ্যগত ভিত্তি থাকলেও রসবাদের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। উনিশ শতকের

[2] জটিল সন্ন্যাসী, “নাটক-চন্দ্রিকা: নাট্য পরিশিষ্ট,” *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ৬০-৬১।

অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা এবং সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল রস প্রসঙ্গের আনাগোনা। তর্ক উঠতে পারে এই নিয়ে যে রস-প্রসঙ্গ এবং রসবাদ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা— এ দুই তো এক নয়!

এর উত্তরে বলা যায়, উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন রসের প্রসঙ্গ এতবার চর্চিত হয়েছে যে, তার পরেও, রসবাদ সম্পর্কে বাঙালি অজ্ঞ ছিল– এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। রসের উল্লেখ ও তার নানা প্রায়োগিক দিকের পাশাপাশি তাত্ত্বিক দিকগুলি যে একেবারেই উল্লিখিত হয়নি— এ কথাও বলা চলে না।

সর্বোপরি, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উনিশ শতকের বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*-নির্ভরতা। *সাহিত্যদর্পণঃ* গ্রন্থের ভিত্তিই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত রসবাদের ওপর। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় যে বাঙালি এতখানি নির্ভরশীল *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ওপর, সেই বাঙালি কীভাবে রসবাদ থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখবে?

কার্যক্ষেত্রে তা হয়ওনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'রস' কাকে বলে? সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসের সংখ্যা নয়টি কেন?— এই সব প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার অষ্টম বর্ষে প্রকাশিত 'রস' নামক প্রবন্ধে (লেখক অজ্ঞাত)[3]। রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হিসেবে ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং

[3] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭১-৭৬। [সম্পা. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদকে[4] সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজে বোঝানোর প্রয়াস আছে এই প্রবন্ধেই, রয়েছে ভাবকত্ব ও ভোজকত্বের[5] আলোচনাও।

আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ। এখানে বিশ্বনাথ কবিরাজের "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"— এই কাব্যসংজ্ঞার ত্রুটিনির্দেশ করতে গিয়েও সেই রস তথা রসবাদের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রাবন্ধিক। বলেছেন—

> রসব্যঞ্জক বাক্যই তাঁহার মতে কাব্য। নাটকের সর্ব্বত্র বাক্য প্রয়োগ হয় না। অনেক স্থলে নটেরা কেবল অভিনয় ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গী নয়ন জল মোচন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারাই রসবোধ জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং সেই সেই স্থলে রসব্যঞ্জক বাক্য না থাকাতে "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এ লক্ষণের সমন্বয় হওয়া কঠিন।
>
> ... কিন্তু মম্মটভট্ট বা আচার্য্য দণ্ডীর কাব্য লক্ষণকে এ দোষ স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহারা বাক্য অর্থাৎ পদ-সমূহের যেরূপ কাব্যত্ব স্বীকার করেন, অর্থ অর্থাৎ পদার্থ সকলেরও সেইরূপ কাব্যত্ব মানিয়া থাকেন। সুতরাং নটদিগের অভিনয় ক্রিয়াগুলিও তাঁহাদের মতে কাব্য

---

[4] "যাহারা সর্ব্বদা প্রমদাদিসহকারে অনুরাগাদির অনুমান করিতে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, এরূপ সামাজিকেরা কাব্য বা নাটক পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব কারণ কার্য্য, এবং সহকারিতা পরিহার করিয়া অলৌকিক বিভাবাদিরূপে পরিণত হয়...সম্বন্ধশূন্য সাধারণভাবে উহা অভিব্যক্ত হইয়া সামাজিকদিগের মনে অবস্থিত হয়। ... যেমন পানক রস নামক মোদকে মরীচ থাকিলেও তাহার আস্বাদ নষ্ট হয় না, অনুরাগাদির আস্বাদও তদ্রূপ বিরোধী কারণে বিকৃত হয় না। উহা যেন সম্মুখে স্ফুর্ত্তি পাইতে থাকে, হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতে থাকে, অন্য সমস্ত তিরোহিত করে। যেন ব্রহ্মস্বাদ অনুভব করাইয়া দেয়। ভূলোকদুর্ল্লভ চমৎকার উৎপন্ন করে। তখন উহার নাম রস হয়।" [উৎস: অজ্ঞাত, "রস," ৭৪]

[5] ভাবকত্ব মনের কার্য্য, এই কার্য্য দ্বারা পরিমিত ব্যক্তিগত শোকাদি সাধারণরূপে প্রতীত হয়। ... মনের যে কার্য্যদ্বারা কাব্যরসের আস্বাদগ্রহ হয়, যাহাতে চিত্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ভোজকত্ব ব্যাপার। [উৎস: অজ্ঞাত, "রস," ৭৪]

> হইল। কেন না সে গুলিও বীর করুণ প্রভৃতি রসের ব্যঞ্জক পদার্থ
> বটে।[6]

মম্মট এবং দণ্ডীর কাব্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ রসবাদী নয়। মম্মট যদিও রসের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই 'রস'-কে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে কাব্যসংজ্ঞা স্থির করেননি। 'কেন না সে গুলিও বীর করুণ প্রভৃতি রসের ব্যঞ্জক পদার্থ বটে'– রসকেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গি মম্মটের বা দণ্ডীর নয়, একান্তভাবে উনিশ শতকেরই আরোপ।

এবার দেখে নেওয়া হবে উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন রসের প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে। প্রয়োগগত এবং তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকে 'রস' নামক ধারণার উনিশ শতকীয় ব্যাখ্যা খুঁজে নেওয়াই হবে পরবর্তী অংশের অভীষ্ট। মূলত ভরতের পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত নবরসের নয়টি রস কীভাবে উনিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত থাকবে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের বর্তমান অধ্যায়।

৫.১ উনিশ শতকের সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় এবং সমালোচনায় শৃঙ্গার ও বীররস

সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে শৃঙ্গার বা আদিরস-সম্পর্কিত বিবিধ বিতর্ককে ধারণ করা হয়ে উঠেছিল সমগ্র উনিশ শতকের অনিবার্য নিয়তি। উনিশ শতকের বাঙালি শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে কখনও গ্রহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে, কখনও আবার প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে প্রথাগত রসভাবনাকে। কখনও বিতৃষ্ণা ও বিকর্ষণ প্রকাশ করেছে, কখনও বা শৃঙ্গার সম্পর্কে দোলাচলের মনোভাব লক্ষ করা গেছে। সব মিলিয়ে শৃঙ্গার রস উনিশ

[6] অজ্ঞাত, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৩৯০।

শতক জুড়ে যে দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছে তার গভীরে প্রবেশের আগে দেখে নেওয়া যাক, উনিশ শতকের বিভিন্ন টেক্সটে শৃঙ্গারের উল্লেখ কীভাবে এসেছে।

৫.১.১ শৃঙ্গাররসের সাধারণ উল্লেখ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে শৃঙ্গার রসের শুধু উল্লেখমাত্র আছে। শৃঙ্গার বা আদিরসের এমন অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এই রসের ওপর, কোনও ইতিবাচক বা নেতিবাচক ব্যঞ্জনাই আরোপিত হয়নি। ভালোমন্দের বাইনারি ছাড়াই শৃঙ্গার সে সব ক্ষেত্রে এসেছে নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনার অংশ হিসেবে। মূলত নৈষধকার, ভারবি প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে, বিদ্যাসাগরের রচনায়, *নব্যভারত* ও *বিভা* পত্রিকায় এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

1. *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা অংশে ‘গীতহার’ নামক একটি বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “অধিকাংশই বাঙ্গালা গীত আদিরস ঘটিত”[7]।
2. *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন রচিত ‘শ্রীহর্ষের নৈষধ-কাব্য’ প্রবন্ধে নৈষধচরিতকে ‘শৃঙ্গাররস প্রধান’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে[8]।
3. একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, “প্রাচীন পণ্ডিতরা মাঘ ও ভারবি অপেক্ষা নৈষধচরিতকেই অধিক ভালোবাসিতেন, নৈষধ কাব্যের কোন্ গুণে তাঁহাদের হৃদয়কে এত বিমোহিত করিয়াছিল, বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, আদিরসের বাহুল্যই চিত্ত বিমোহনের হেতু।[9]”
4. *নব্যভারত* পত্রিকাতেই প্রকাশিত ‘চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম’ প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ‘যঃ কৌমারহরঃ’ শ্লোকটি সম্বন্ধে জগদীশ্বর গুপ্ত বলেছেন, “এই শ্লোক সামান্য নায়ক নায়িকা সম্বন্ধীয় আদিরসের হইলেও, স্বরূপ ব্যতীত মহাপ্রভুর মনের গভীরভাব ভক্তমণ্ডলীর কেহই বুঝিতে পারিল না।”[10]

---

[7] অজ্ঞাত, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: গীতহার— গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়,” *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৩৩৩।

[8] নৈষধচরিত আদিরস প্রধান মহাকাব্য, আদ্যোপান্তই প্রায় ইহার আদিরসে অভিষিক্ত...। [উৎস: শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন, “শ্রীহর্ষের নৈষধ-কাব্য (১),” *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৬৫৩।]

[9] শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন, “শ্রীহর্ষের নৈষধ-কাব্য (২),” *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৫৩২।

[10] জগদীশ্বর গুপ্ত, “চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম” *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৭।

5. শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা রচিত 'ভারবি' প্রবন্ধে ভারবির কলমে "আদিরসের কুসুম-সৌরভ বিতরণ করিয়া যুবজনের চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন"[11]-এর কথা আছে।
6. *বিভা* পত্রিকায় পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী 'মৃচ্ছকটিক'-এর সমালোচনাতে প্রকরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন "ইহাতে একমাত্র শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য থাকে," এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, "ইহাতে শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য"[12]।
7. জটিল সন্ন্যাসী ছদ্মনামে রচিত 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "বোধ হয়, কুসুম ও বসন্ত-নামে বিদূষকের নামকরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কুসুম, বসন্ত প্রভৃতি শুচিমেধ্য বিষয়গুলি আদ্য রসের উদ্দীপক..."[13]
8. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-য় দ্বিজ রামচন্দ্রের *দুর্গামঙ্গল* কাব্য সম্পর্কে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেছেন "বলা বাহুল্য এই কাব্য আদিরস-প্রধান।"[14]

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে অতিরিক্ত কোনও অস্ত্যর্থক বা নঞর্থক ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে নেই। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার তৃতীয় বর্ষে রসিকচন্দ্র রায় রচিত রস-সংক্রান্ত একটি গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতার নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত এই বইটির নাম *নবরসাঙ্কুর*। এই নামের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছিল, 'আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন'[15]। *নব্যভারত* পত্রিকার 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রবন্ধের দ্বাদশ প্রস্তাবে কবিরাজচন্দ্র কর্তৃক কালিদাস নামক কবির রচিত শৃঙ্গাররস-বিষয়ক গ্রন্থ *শৃঙ্গারতিলক*-এর টীকা রচনার কথা পাওয়া যায়[16]।

---

[11] শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, "ভারবি," *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৫১৫।

[12] হৃষীকেশ শাস্ত্রী, "মৃচ্ছকটিক," *বিভা* ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ২৭৪।

[13] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৫৫৫।

[14] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "দ্বিজ রামদাসের দুর্গামঙ্গল কাব্য," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ১১।

[15] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৯।

[16] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা: দ্বাদশ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১৭৭।

উপরের উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে শৃঙ্গার বা আদিরস সম্পর্কে লেখকদের কোনোরকম দ্বিধার মনোভাব দেখা যায় না। বরং তাঁরা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে অসংকোচেই আদিরসের উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। তবে শৃঙ্গারের এই বহুস্বরিক উপস্থাপন সত্ত্বেও মোটের ওপর উনিশ শতক যেভাবে আদিরসকে দেখেছে, তাতে অনিবার্যভাবে খানিক নেতিবাচক সমালোচনার মনোভাব লগ্ন হয়েই গেছে। উনিশ শতকের তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি মনন অনিবার্যভাবেই ইংরাজি তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে আলোড়িত হয়েছিল। সেই মানস-পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল ভিক্টোরীয় পিউরিটানিজমের ছায়া। ফলে শৃঙ্গার বা আদিরসকে সাহিত্য-পরিসরে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে নঞর্থক মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন অনেকেই। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে শৃঙ্গারের অনায়াস প্রবেশাধিকার অনেককেই অস্বস্তির সম্মুখীন করেছে, সন্দেহ নেই। সেই অস্বস্তির প্রতিক্রিয়াতেই শৃঙ্গারকে বর্জন, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের বয়ান নির্মিত হচ্ছিল উনিশ শতকে। তাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হল এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অংশে।

৫.১.২ আদিরসের নেতিবাচক উপস্থাপনা

সাহিত্যদর্পণঃ-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুসারে, পুরুষের নারীর প্রতি ও নারীর পুরুষের প্রতি যে সম্ভোগ-স্পৃহা, তাই-ই 'শৃঙ্গার' নামে খ্যাত[17]। *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুসারে, 'শৃঙ্গ' শব্দের অর্থ মন্মথের উদ্ভেদ[18] অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছার উদ্বোধ। যা শৃঙ্গের কারণস্বরূপ তাই-ই হল শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের আশ্রয় উত্তম প্রকৃতির নায়ক নায়িকা। সমগ্র সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বে শৃঙ্গারের গুরুত্ব কম ছিল না, রসের আলোচনায় শৃঙ্গার-প্রসঙ্গই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। রুদ্রভট্টের *শৃঙ্গারতিলক*, ভোজের *শৃঙ্গারতিলক*– প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ থেকেই স্পষ্ট

---

[17] পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগং প্রতি যা স্পৃহা। / স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতঃ ক্রীড়ারত্যাদিকারকঃ।।

[18] শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। / উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে।।

শৃঙ্গাররস ছিল অন্য সব রসের তুলনায় বিশেষ তাৎপর্যবাহী। এ ছাড়া শারদাতনয়ের *ভাবপ্রকাশ,* শিঙ্গভূপালের *রসার্ণবসুধাকর,* ভানুদত্তের *রসতরঙ্গিণী,* অগ্নিপুরাণের 'অলংকারপ্রকরণ'— প্রভৃতি বইতেও শৃঙ্গারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালি যে সবসময় শৃঙ্গারকে মর্যাদার স্থানে রেখেছে, এমন নয়। এই প্রসঙ্গে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের বিখ্যাত উক্তিটি প্রথমেই স্মরণীয়—

> এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ্ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;— না স্থায়ী, না ব্যভিচারী– কিন্তু একটি *কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।*[19]

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র 'শৃঙ্গার'কে 'কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি' রূপে বর্ণনা করলেন। উনিশ শতকের অনেক লেখক-সমালোচক বঙ্কিমের পথেরই পথিক হয়েছেন। 'শ্রীলক্ষ্মী' ছদ্মনামে রচিত *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালা গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দরকে যে কেবল 'শৃঙ্গাররসপ্লাবিত' বলা হয়েছে তা নয়, সঙ্গে 'অশ্লীলতাময়' বলেও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে—

> শ্রীধরের টপ্পা ও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কিঞ্চিৎ কবিত্ব ও লালিত্য থাকিলেও কুৎসিত ভাবদ্যোতক বলিয়া শিক্ষিত মাত্রেই তাঁহাদের রচনা সর্ব্বান্তকরণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন...। *অশ্লীলতাময়, শৃঙ্গার-রসপ্লাবিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য যে ধর্ম্মভাববিরহিত*

---

[19] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," 'বিবিধ প্রবন্ধ,' *বঙ্কিম-রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ): ১৬২-৬৩। [নজরটান আরোপিত]

> *কদর্য্য সময়ের ফল,* সেই কদর্য্য সময়েই ঐ সকল নারকী গীতি বাঙ্গালী সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছিল।[20]

একইরকম ভাবে *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী রচিত 'মুসলমান সাহিত্য' প্রবন্ধে আদিরসকে যে শুধু অশ্লীল বলে অভিহিত করা হয়েছে তাই-ই নয়, একে 'মহাদোষরূপ কীট' বলে গণ্য করা হয়েছে।[21]

আসলে ইংরেজদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সূত্র ধরে সেইসময়ের শিক্ষিত বাঙালিও গ্রস্ত হয়েছিল ভিক্টোরীয় পিউরিটান প্রবণতায়। আর সেই কারণেই শৃঙ্গার নিয়ে তার মনে তৈরি হয়েছিল এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বোধেন্দু চক্রবর্তী 'বঙ্গীয় কবি' প্রবন্ধে কালিদাসের মতো কবির রচনাকেও একপ্রকার নস্যাৎ করেছেন এই অশ্লীলতা দোষের জন্য—

> কবি বলিতে পারেন ইহাতে দোষ কি— যখন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস অধরকে "রতি স্বর্ব্বস্ব" [য] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (শকুন্তলা)* কিন্তু তিনি অধরকে রতি স্বর্ব্বস্ব বলিয়াছেন প্রণয় স্বর্ব্বস্ব [য] বলেন নাই, আর কালিদাস যদিও মহাকবি, কিন্তু যিনি দেবদেবীর বর্ণনা করিতে এমন অশ্লীল ভাবের অবতারণা করিয়াছেন যে সেই কারণে তাঁহার একখানি পুস্তকের অর্দ্ধাধিক লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, তিনি কখন রুচির আদর্শ হইতে পারেন না।[22]

---

[20] শ্রীলক্ষ্মী, "বাঙ্গালা গীতিকাব্য: সমালোচনা: কবিকাহিনী। দীনেশচরণ বসু প্রণীত; কবিতামালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্ বিরচিত," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ২৭৯। [নজরটান আরোপিত]

[21] মুসলমান-সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে এই সাহিত্য-তরুর অভ্যন্তরে কতকগুলি মহাদোষরূপ কীট দেখিতে পাওয়া যায়; যথা- (ক) অশ্লীল আদিরসের ছড়াছড়ি। [উৎস: গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, "মুসলমান সাহিত্য," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৮৮-৮৯।]

[22] বোধেন্দু চক্রবর্তী, "বঙ্গীয় কবি," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৩৬৪।

যেখানে স্বয়ং কালিদাসই 'রুচির আদর্শ' বলে গণ্য হতে পারেন না, সেখানে শৃঙ্গার-লগ্ন সমস্ত ডিসকোর্সই যে প্রত্যাখ্যাত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*-ও তার ব্যতিক্রম নয়। *কুমারসম্ভব* কাব্য সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন—

> এই দশসর্গ [প্রথম সাত সর্গের পরের দশ সর্গ] কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয় অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার বর্ণনা আছে। তাহাও অত্যন্ত অশ্লীল এবং সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ...এই দুই সর্গেও [নবম এবং দশম] হরগৌরীঘটিত অনেক অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ... জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমার সম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরী-বিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[23]

'অশ্লীলতার ভূত' উনিশ শতককে কতখানি বিচলিত করেছিল তার আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 'নীতি ও কবিত্ব' প্রবন্ধ থেকে[24]। এখানেই বলা হয়েছিল—

> ... কবির সঙ্গীত নীতিপূর্ণ হইবে, অন্ততঃ কখন নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না, কবি জগতের সুনীতি-শিক্ষক, কবি দেশের ত্রাণকর্ত্তা...।
> এখন সাময়িক পত্রিকা, বাহক হইয়া দূষিত কবিত্বের বিপদ্জনক বিষ বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে আনিয়া দিতেছে। সেই কলুষিত বিষ

[23] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব," *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১* (কলকাতা: দে'জ, ২০২০), ৩৯৭।

[24] এই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, "গরলময় কবিতা পাঠে হৃদয় ক্রমে ক্রমে দূষিত হইয়া যায়, ক্রমশঃ বিষময়ী চিন্তা অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকে কুপথে লইয়া যায়। আধুনিক অনেক কবির রুচি অপূর্ব্ব। নরনারী প্রেম ব্যতীত আর কিছু লিখিবার দ্রব্য যে জগতে আছে, তাহা তাঁহাদের সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারে না। *অপবিত্র ও কুরুচি সম্পন্ন ভাষায়, অপবিত্র ও নীচ প্রকৃতি প্রণয় গাইয়া,* আপনদিগের মহিমা প্রকাশ করা অনেক মহাপুরুষদিগের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। পাপ-পরিণত কবিত্ব সাধুজনহৃদয়ে নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক।"

> আমরা... অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া গৃহে আনিতেছি...। অধঃপতিত সমাজ, হতভাগ্য বঙ্গবাসী, আপনার ও পরিবারের মঙ্গলচিন্তা না করিয়া যে সর্ব্বনাশকর কুনীতির বীজ গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপণ করিতেছে, তাহার বিষাক্ত ফল ভবিষ্যতে কি ভয়ানক না হইতে পারে?[25]

বঙ্গদর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত 'অশ্লীলতা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উনিশ শতকীয় অশ্লীলতা-সম্পর্কিত ট্যাবুর চেহারাটি আরও স্পষ্ট হয়। প্রবন্ধটি থেকে কলকাতায় 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—

> অশ্লীলতা বঙ্গদেশীয় দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।... জ্ঞানালোক সহকারে অশ্লীলতার দিন দিন হ্রাস দূরে থাকুক, বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন, এমন অনেক সম্বাদপত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই, যে তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে কোথাও দেখা যাইত না। এসকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত। অতএব অশ্লীলতাপ্রিয় পাঠকের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সংশয় নাই।[26]

অশ্লীলতা নিয়ে এ জাতীয় ছুঁতমার্গের সঙ্গে অনেক সময়েই জুড়ে গেছে আদিরস প্রসঙ্গ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদিরস মাত্রেই অশ্লীল এবং অনুচিত— এমন এক ব্যঞ্জনা যেন আপনা থেকেই নির্মিত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে জয়গোপাল গোস্বামী রচিত *কাব্য-দর্পণ* গ্রন্থের ভূমিকা অংশটি স্মরণযোগ্য। এখানে জয়গোপাল গোস্বামী বইয়ের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অশ্লীলদোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যতদূর পারিয়াছি চেষ্টা

[25] প্রভাতরবি ভাদুড়ি, "নীতি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪৮৮-৪৯১।

[26] অজ্ঞাত, "অশ্লীলতা," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮০ বঙ্গাব্দ): ৪২০-৪২১।

> করিয়াছি। সাঙ্গোপাঙ্গ আদ্যরস ইহাতে বিবৃত হয় নাই, কেবল আদ্যরসের লক্ষণ ও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[27]

এভাবেই আদ্যরসের সঙ্গে অশ্লীলতাদোষের যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকে। জয়গোপাল গোস্বামী দৈহিক কামনার অনুষঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বাদ রাখতে চেয়ে 'অনুরাগ'-কে আদ্যরসের স্থায়িভাব[28] হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'রতি'কে নয়।[29] অন্যদিকে লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থে সংস্কৃত রসতত্ত্ব নির্দেশিত 'রতি' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও 'আদ্যরস (Love)'-এর সংজ্ঞায় বলা হল— "মনোভবের উদ্রেক হেতু নায়ক ও নায়িকার অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি স্বসম্বেদ্য যে এক অপূর্ব্ব অনুরাগ (রতি) জন্মে ও স্থায়ী হয় তাহাকেই শৃঙ্গার (আদ্য বা মধুর) রস বলে।"[30]

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রবন্ধেও কালিদাস নিন্দিত হয়েছেন প্রায় একই কারণে—

> তাঁহার নায়ক ও নায়িকা সকল মন্মথ-বাণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে। তাহাদের মনে তখন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না। কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করণেচ্ছাই তাহাদের হৃদয়কে গ্রাস করে।...যেমন একজন অশিক্ষিত ও অশিষ্ট লোকের হওয়া সম্ভব কালিদাসের প্রধান ব্যক্তিদিগের সেইরূপ দেখা যায়।...সকলেই

---

[27] জয়গোপাল গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ষ্ট্যাণহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ।০।

[28] "অনুরাগ যাহাতে স্থায়ীভাব।"

[29] জয়গোপাল গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ষ্ট্যাণহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ৯৫।

[30] লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৯৮), ৪২।

> কেবল ইন্দ্রিয়ের বশ। ইহাদের প্রেমের ফল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, মনস্তৃপ্তি নহে। ... নির্ম্মল ভাব ইহাদের মনে আদৌ উদিত হয় না।[31]

অন্যত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পুরুবিক্রম’ নাটকের প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

> বঙ্গভাষার প্রায় অধিকাংশ নাটক স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট।[32]

তবে আদিরসকে ঘিরে উনিশ শতকের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এইধরনের নেতিবাচকতাকেই আশ্রয় করে ছিল। *ভারতী* পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশিত ‘দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি’ প্রবন্ধের প্রবন্ধকার ‘শ্রী অঃ’ আধুনিক যুগের ‘একজন কৃতবিদ্য পয়ার রচয়িতা’ আদিরসের অবতারণাতে কীভাবে ‘Byron প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সাধন’[33] করেছেন সেই বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনার পৃষ্ঠা থেকে আরও এমন অনেক দৃষ্টান্তই উদ্ধৃত করা যায় যেখানে আদিরসকে মোটেই ইতিবাচক আলোয় উপস্থাপিত করা হয়নি। যেমন—

> ১) ...শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হিন্দিতে অনুবাদিত হইয়া “প্রেম-সাগর” নামে আখ্যাত হইল, এবং শিথিলমনা বঙ্গ-রাজ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিরা সেই দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া আদি রসের তুফান তুলিতে লাগিলেন।
>
> ...আদি-রসময় তরল তরঙ্গে বঙ্গদেশ আপ্লুত হইতে না হইতেই চৈতন্য-দেব নিজ বিশ্বাস ও বুদ্ধি বলে বিশেষ রূপে সে তরঙ্গের গতি রোধ করিতে পারিয়াছিলেন।[34]

---

[31] কালীপদ ঘোষ, “কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল,” *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৩৮৮।

[32] অজ্ঞাত, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: পুরুবিক্রম,” *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৪৪।

[33] শ্রীঅঃ, “দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি,” *ভারতী* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ২০১।

[34] চ—, “বঙ্গসাহিত্য,” *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ১৭৫-৭৬। [এটি রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত *বঙ্গসাহিত্য*-এর সমালোচনা।]

> ২) রামায়ণ গ্রন্থ খানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি ', কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত আদিরস ঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ, এ সকল আদিরস ঘটিত না ত কি?[35]

শেষ উদাহরণটি যদিও ব্যঙ্গাত্মক রচনা, কিন্তু কাব্যে 'আদিরস'-এর আধিপত্যকে গুরুতর দোষ হিসেবে গণ্য করাই যে তৎকালীন সময়ে স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল, তা রচনার ভঙ্গিমা থেকে স্পষ্ট। আবার, *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম বর্ষে 'যাত্রা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের প্রবন্ধকার আদিরসের তীব্রতা কম বলে অভিযোগ তুলেছিলেন—

> আদিরসের তীব্রতা নাই। রস মধ্যে করুণ রসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণ রসে যাদৃশ মনুষ্য চিত্তকে আলোড়িত করা যায়, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জনসাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করুণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন।[36]

ভারতী পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির 'এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ' পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> কেহ কেহ বলেন এই পদটির আদি-রস-ঘটিত গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তাহা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। সহজে ইহার যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহার মধ্য হইতে অশ্লীল আদিরসঘটিত অর্থ বাহির করা নিতান্ত কষ্ট কল্পনা ও অরসিকের কাজ।[37]

লক্ষণীয় বিদ্যাপতির পদটিতে আদিরস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এখানে দু-বার দু-ধরনের শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেন। একবার বললেন, 'আদি-রস-ঘটিত গূঢ় অর্থ' এবং আরেকবার

---

[35] শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজাত শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত, "রামায়ণের সমালোচনা (ব্যঙ্গরচনা)," বঙ্গদর্শন ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৭২।

[36] অজ্ঞাত, "যাত্রা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৫৯।

[37] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট," *ভারতী* ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ৩৪০।

বললেন 'অশ্লীল আদিরসঘটিত অর্থ'। দ্বিতীয় শব্দবন্ধ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, এখানে 'অশ্লীল' শব্দটি কীসের বিশেষণ? 'অর্থ'টিকে অশ্লীল বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নাকি 'আদিরস'কেই? 'অশ্লীল' শব্দটি 'আদিরস'-এর বিশেষণ হলে ধরে নিতে হয় 'আদিরসঘটিত' যে কোনও অর্থকেই রবীন্দ্রনাথ অশ্লীল বলে ধরছেন। যে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ *পদরত্নাবলী*-র দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপিতে 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ'-এর 'কাম' শব্দকে 'নিম্নরেখাঙ্কিত' করে তার ওপরে পেনসিল দিয়ে 'বিরহ' শব্দটি লিখে দেন,[38] কিংবা যে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির এই পদটির ইংরাজি অনুবাদে 'কাম দারুণ'-এর ভাষান্তর হিসেবে 'কামগন্ধহীন' 'anguish'[39] শব্দটি ব্যবহার করেন, তাঁর পক্ষে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'আদিরস'কে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়[40]।

---

[38] ২৩১ সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির 'এ সখি হামারি'র পাদটীকা- "পদরত্নাবলীর প্রথম সংস্করণে 'কাম' শব্দটিই ছিল। "দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ শব্দটি নিম্নরেখাঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে বিরহ শব্দটি লিখিয়াছেন। এই পাঠটিই এখানে গৃহীত হইল।" [উৎস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, *পদরত্নাবলী*, অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত (কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ), ২৫৮।] (১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে *পদরত্নাবলী*-র প্রথম সংস্করণ এবং আষাঢ়-এ সংযোজিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।)

[39] my love is gone,'/my heart is torn with anguish. [উৎস: XI সংখ্যক পদ, *পদরত্নাবলী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ), ৩১৭।]

[40] *পদরত্নাবলী*-র আরেক সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও একই মনোভঙ্গির অধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়। *পদরত্নাবলী*-র 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে তিনি 'কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত' চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব ধর্মকে 'অপূর্ণ' এবং 'উচ্ছৃঙ্খলতার ধর্ম্ম' বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ 'মধুর রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না।' [উৎস: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, "গ্রন্থপরিচয়," *পদরত্নাবলী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ),৩২৯ – ৩৩০।]

একইভাবে, *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত সংস্কৃত *অমরুশতক*-এর বাংলা অনুবাদের সমালোচনায় অশ্লীলতাকে বর্জনের মানসিকতাই প্রকট হয়ে উঠেছে—

> অমরুশতকেরও অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত অশ্লীল। অনুবাদক বলেন যে, একশত শ্লোকের মধ্যে কেবল পাঁচটি অশ্লীল, তিনি সেই পাঁচটি অনুবাদ করেন নাই। ...আমরা অনুবাদকের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না; মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অমরুশতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এমন কি, ইহার মঙ্গলাচরণ সূচক প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ অশ্লীল।[41]

আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও সংগীতসংগ্রহ *প্রসাদ-প্রসঙ্গ*-এর সমালোচনা। সেখানে সমালোচক ('শ্রীপূ') রামপ্রসাদী সংগীতের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে আদিরসের অতিরিক্ত প্রয়োগে জর্জরিত বাংলা সাহিত্যের প্রতি নিজের বিতৃষ্ণাকে গোপন রাখেননি—

> বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্য আদিরসে পরিপূর্ণ। এই আদিরসপ্লাবিত বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে প্রসাদীসঙ্গীতনিচয় একটি সুশোভিত দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হয়। ... আমরা আদিরসে সন্তরণ দিয়া যখন এই দ্বীপে উপনীত হই, তখন আমাদিগের লোচনদ্বয় একদা সন্তৃপ্ত হয়...[42]

এই অংশটি *প্রসাদ-প্রসঙ্গ*-এর পরবর্তী সংস্করণের মুখবন্ধতেও ঠাঁই পেয়েছে। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকীয় পরিমণ্ডলে রামপ্রসাদের এই সমালোচনাটি এতদূর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে *ভারতী ও বালক* পত্রিকার দশম বর্ষে রামপ্রসাদের 'সাধক সঙ্গীত

---

[41] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৭।

[42] শ্রীপূ—, "রামপ্রসাদ সেন*," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৮।

[* এই প্রবন্ধের ফুটনোট অংশে উল্লেখ করা ছিল যে প্রবন্ধটি আসলে "প্রসাদপ্রসঙ্গ। অর্থাৎ সাধকবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সাধকত্ব ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শনীভূত প্রসাদী সঙ্গীত, ভজন, ও বন্ধনাদি, এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ। ঢাকার পূর্ব্ব বঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭১৭ শকঃ ২৫ বৈশাখ। প্রথম সংস্করণ"-এর সমালোচনা।]

(শ্যামাবিষয়ক পদাবলী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ'-এর সমালোচনাতেও এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে[43]। এই উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষভাবে আদিরসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি বটে, কিন্তু মাতা-পুত্রের সম্বন্ধনির্ভর প্রসাদী সংগীতকে 'সুশোভিত দ্বীপ' বলে উল্লেখ করার ফলে বোঝা গেল বাংলা সাহিত্যে আদিরসরূপ জলরাশির আধিক্য *ভারতী*-র সমালোচক-চিত্তকেও বিকল করেছিল। এই বিকলতা বা বিতৃষ্ণা যে কত গভীর তার পরিচয় পাওয়া যায় *আর্য্যদর্শন*-এর 'রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধটিরই আরেকটি অংশে—

> ... *চক্ষুঃশূল আদিরস* তখন আর ভাল লাগে না। বিলাসী বাঙ্গালীর আদিরস তাহার অস্থির মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চালিত হইতেছে। যে দিন বাঙ্গালী এ রসের আস্বাদন পরিত্যাগ করিবে, সেদিন হইতে তাহার অভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা। *বাঙ্গালীর কখন কি এ রসে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না?* [44]

উনিশ শতকের বাঙালির একটা বড়ো অংশের কাছে আদিরস এভাবেই 'চক্ষুঃশূল' হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, বাঙালির তথাকথিত 'বীরত্বহীনতা' এবং 'কাপুরুষতা'র জন্যেও দায়ী করা হচ্ছিল এই আদিরসের আধিক্যকে। ফলে এইসময় থেকেই 'আদি' এবং 'বীর'— এই দুই রসকে দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থানবিন্দুতে স্থাপন করা হচ্ছিল। এই দুই রস যেন বিরাজ করছিল বাইনারি অপোজিশন হিসেবে। তবে আদিরস বা শৃঙ্গার যে উনিশ শতকের সমালোচকদের দ্বারা সর্বদাই নিন্দিত হয়েছে এমন নয়। কোথাও

---

[43] একজন বঙ্গীয় সুলেখক বলিয়াছেন "এই আদিরস প্লাবিত বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে" প্রসাদী সঙ্গীত নিচয় একটী সুশোভিত দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হয়। [উৎস: আশুতোষ চৌধুরী, "সমালোচনা: STAR IN THE EAST (পূর্ব্বাকাশে শুকতারা)," *ভারতী ও বালক* ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৪৮৯।

[44] শ্রীপূ—, "রামপ্রসাদ সেন*," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৯। [নজরটান আরোপিত]

কোথাও শৃঙ্গারের সমর্থনেও মতপ্রকাশ করেছেন উনিশ শতকের সমালোচকরা। সেই সমর্থনসূচক বক্তব্যেরই কিছু দৃষ্টান্ত রইল পরের অংশে।

৫.১.৩ আদিরসের ইতিবাচক উপস্থাপনা

উনিশ শতকের বাংলায় শৃঙ্গাররস নানা লেখক-প্রাবন্ধিক-তাত্ত্বিক-সমালোচকের বয়ানে বিবিধ তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভঙ্গিই প্রধান। অবশ্য শৃঙ্গার সম্পর্কিত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিরল হলেও সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বহীন নয়।

আদিরস যে অশ্লীল হতে পারে না, তা প্রমাণ করার চেষ্টা কয়েক স্থানে চোখে পড়ে। *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* গ্রন্থে জয়গোপাল গোস্বামী 'আদ্যরস'-কে যতটা সম্ভব অনুল্লিখিত রাখলেও তাঁর রচিত 'আদ্যরস'-বিষয়ক বই *উজ্জ্বলরসতরঙ্গিণী*-র প্রকাশ-সম্ভাবনা ঘোষণা করে লিখেছিলেন—

> আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক বিষয় সকল উদ্গীর্ণ করিবে ইহা কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, *নব রসের মধ্যে নিরাবিল আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয়,...*[45]

আদিরসের বর্ণনা মানেই যে তা বর্জনীয় নয়, তা জানিয়েছিল *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'যাত্রা' নামের প্রবন্ধটি— "আদিরস বর্ণন থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হইল, এমত নহে।"[46] অনুরূপভাবে, আদিরস থাকলেই যে কোনও রচনা অশ্লীল হয়ে পড়ে না, তার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

---

[45] জয়গোপাল গোস্বামী, "বিজ্ঞাপন," *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: ষ্ট্যাণহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ৵০। [নজরটান আরোপিত]

[46] অজ্ঞাত, "যাত্রা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৬৩।

> ...কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যকে অনেকে অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন। ... *আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদি রসের আধার। আদি রসের আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই সমধিক আদর দেখা যায়* – তখন বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, এ বাঙ্গালী জাতির তখন জন্ম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে চাহি না, আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ *কালিদাস আদি রসের দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন। তবে বঙ্গ সাহিত্যই অশ্লীল হইয়া পড়িয়া থাকে কেন?*
>
> ... ... দেখা গেল *প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল কবিতা, তাহার প্রধান রস আদি,* গীতিকাব্যেই তাহার আরম্ভ, এবং সাময়িক সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কালের কবিদিগকে অশ্লীল বলা যায় না।[47]

'স্তন, চুম্বন' প্রভৃতি শব্দ থাকা সত্ত্বেও যে কাব্য সৌন্দর্যময় হতে পারে, সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সংস্কৃত আলংকারিক কথিত এই আদিরসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বললেন—

> আমরা এখন যাহাকে অশ্লীল বলি (স্তন, চুম্বন প্রভৃতি), এ রসের অবতারণায় এরূপ দুই একটা শব্দ আবশ্যক মত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে কাব্যের হানি না হইয়া বরং সৌন্দর্যের উৎকর্ষ হয়। সেই জন্য সুরুচির-ভয়ে-অভীত কালিদাস এরূপ অশ্লীলতার (?) স্থানে স্থানে অবতারণা করিয়াছেন।...কালিদাসের অশ্লীলতাও সৌন্দর্যমাখা।[48]

আদিরস নিয়ে প্রায় একইরকমের আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায় রজনীকান্ত রায় রচিত 'ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর' নামক প্রবন্ধে। এখানে কাব্যসাহিত্যে আদিরসের উপস্থিতির স্বাভাবিকতাকেই তুলে ধরেছেন লেখক—

> ভারতচন্দ্র যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে লোকে আদিরসঘটিত সমস্ত কাব্যই ভাল বাসিত এবং আদর করিত। যাহার

---

[47] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য," *ভারতী* ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১২৮-৩১। [নজরটান আরোপিত]

[48] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, "কালিদাস ও সেক্ষপীয়র," *সাহিত্য* ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৬৫৫-৫৭।

> রচনায় আদিরস বর্ণনা নাই, লোকে তাহাকে বড় সমাদর করিত না। এমন কি, ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তাহা উপহার প্রদান করিলেন, তখন মহারাজ তাহাতে আদিরসঘটিত বর্ণনা নাই দেখিয়া বড় খুসী হইলেন না। ভারতকে আদিরসঘটিত বর্ণনাযুক্ত বিদ্যাসুন্দর রচনা করিতে আদেশ করিলেন।[49]

উনিশ শতকেই 'রসকাদম্বিনী' নামে সংস্কৃত *অমরুশতক*-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। *নব্যভারত* পত্রিকায় বইটির সমালোচনা পড়ে বোঝা যায়, *অমরুশতক*-এর অনুবাদক অশ্লীলতার অভিযোগে পাঁচটি কবিতা বাদ দিলেও আদিরস মানেই যে অশ্লীল তা তিনিও স্বীকার করতে চাননি—

> অনেকে মনে করেন এই শতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত, উহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র, এরূপ কাব্যও যদি অশ্লীল হয়, তবে আদিরসের কবিতা মাত্রই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতে পারে।[50]

আদিরসকে অশ্লীল মনে করেননি বলেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*-তে লিখেছেন 'শৃঙ্গার' শীর্ষক সনেট। এইভাবেই আদি বা শৃঙ্গাররস সামগ্রিকভাবে না হলেও, আংশিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের বয়ানে।

৫.১.৪ আদিরসমাত্রই কি অশ্লীল?— উনিশ শতকীয় সমালোচকের দ্বিধা

আদিরস সম্পর্কে উনিশ শতকে আরেকধরনের মতবাদ লক্ষ করা যায়। অনেক সমালোচকের বয়ানে আদিরস সর্বদাই যে অশ্লীল বা অশ্লীলতা মানেই তা কুরুচিকর এবং

---

[49] রজনীকান্ত রায়, "ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর," *নব্যভারত* ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ১৮৬।

[50] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৭।

অনুচিত— এমন চরমপন্থী মত প্রকাশ পায়নি। বরং তাঁরা কখনও কখনও আদিরসের বিশেষ একটি প্রকারভেদকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করেছেন। কখনও বা দেখা যায় তাঁরা আদিরসের অনুচিত প্রয়োগ বা অনাবশ্যক প্রয়োগের নিন্দা করেছেন। সামগ্রিকভাবে আদিরসকে নাকচ করেননি।

উনিশ শতকের ধারণায় অশ্লীলতা কী? হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, লজ্জা, ঘৃণা বা অমঙ্গলের ভাবের উদ্রেক করে, এমন শব্দগুলিই অশ্লীল[51]। কিন্তু কেবল এই ধারণাতেই থেমে গেলেন না হীরেন্দ্রনাথ। তিনি আরেক প্রকার অশ্লীলতার কথাও ঘোষণা করলেন—

> কিন্তু আর এক প্রকার অশ্লীলতা আছে, যাহা বাস্তবিক অশ্লীলতা কি না, সে পক্ষে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষায় ইহাকে অশ্লীলতা বলে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ইহাকে আদিরস বলিতেন। কাব্যে নাটকে প্রণয়ের মূলে এই আদিরস থাকে।[52]

অর্থাৎ তৎকালীন একাধিক শিক্ষিত বাঙালির মনে আদিরস এবং অশ্লীলতার এক ধরনের অনিবার্য যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিনা প্রশ্নে এই দুই ধারণার অভেদস্থাপনে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তাঁর কাছে এই আদিরসই কাব্যনাটকে ‘প্রণয়ের মূলে’ অবস্থিত। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত *রসকাদম্বিনী*-র সমালোচনায় ‘পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য’ আদিরসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে—

> সংস্কৃত অমরুশতক কাব্য আদিরস প্রধান। *প্রকৃত আদিরস জগতের একটী দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে*

---

[51] [যে] শব্দের দ্বারা ব্রীড়া, ঘৃণা বা অমঙ্গলের ভাব উদয় হয়, তাহাই [অশ্লীল। সেক্ষ] পীয়রের ‘চতুর্থ হেনরী’র পাঠক অনায়াসেই স্বীকার করিবেন যে, সেক্ষপীয়র ঘোরতর অশ্লীল। (ফলস্টাফ, লিয়র, সিম্বেলিন, পোরসিয়া, বিয়েত্রিস্— এদের সংলাপে অশ্লীলতার কথা বলা হয়েছে)। [উৎস: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, “কালিদাস ও সেক্ষপীয়র,” *সাহিত্য* ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ), ৬৫০]

[52] দত্ত, “কালিদাস ও সেক্ষপীয়র,” ৬৫০।

> *এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়।* অন্ধকবি মিলটন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম নরদম্পতিকে সৃজন করিয়া, মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন তখন কি অপূর্ব আদিরস সংঘটিত হইয়াছে।... এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। সেই জন্য আদিরসের প্রধানত্ব।[53]

কিন্তু একইসঙ্গে আদিরসের 'পৈশাচিকী' বা 'কুৎসিত বিকৃতি'কে ধিক্কার দিয়েছেন প্রবন্ধকার—

> কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে।... সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।[54]

সুতরাং *বঙ্গদর্শন*-এর এই প্রবন্ধ থেকে আদিরস সংক্রান্ত এক ধরনের বাইনারির সন্ধান পাওয়া যায়। তার একদিকে রয়েছে 'প্রকৃত আদিরস' এবং অন্যদিকে আছে তার 'কুৎসিত বিকৃতি'। উনিশ শতকে শৃঙ্গাররসের দুটি পৃথক দিক নির্দেশ করে উভয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা টানার প্রয়াসও নিতান্ত বিরল নয়। এই বিভাজনরেখার একদিকে ছিল বিশুদ্ধ আদিরস, যা রুচির বিকৃতি নয়, বরং সৌন্দর্যের প্রকাশক। অন্যদিকে ছিল আদিরসের বিকৃত রূপ— যাকে 'অনাবশ্যক আদিরস', 'অনুচিত আদিরস', 'অনবগুণ্ঠন আদিরস', 'আদিরসের অপকৃষ্টাংশ', 'শৃঙ্গার'— এমন নানা অভিধায় ভূষিত করলেন উনিশ শতকের বাঙালি পণ্ডিতরা। মূলগতভাবে যা ছিল একই রস, তার মধ্যে 'ইতিবাচক' এবং 'নেতিবাচক'— এই দুইপ্রকার শ্রেণি নির্মাণ করার প্রয়াস, আসলে যেন পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে অর্জিত ভিক্টোরীয় নীতিবোধ এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত কাব্যতত্ত্বের

---

[53] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৬-৮৭। [নজরটান আরোপিত]

[54] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৬-৮৭।

ঐতিহ্য— এই দুইয়ের মধ্যে এক সমঝোতার চেষ্টা। এর ফলস্বরূপ আদিরসকে সম্পূর্ণত বর্জন করতে হল না। আবার ব্রিটিশ শাসকের শাসনসূত্রে পাওয়া ইউরোপ-ঘেঁষা মূল্যবোধকেও রক্ষা করা গেল। সেই সমঝোতারই বিবরণ রইল এই অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অংশে।

৫.১.৫ শৃঙ্গাররসে বিভাজনের প্রয়াস

আদিরসের আগে 'অনাবশ্যক', 'অনুচিত', 'অনবগুণ্ঠন'-এর মতো বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন যে সমালোচকরা, তাঁরা কিন্তু সম্পূর্ণ আদিরসকে নাকচ করতে চাননি। বরং তার এক বা একাধিক প্রকাশপন্থা নিয়ে তাঁদের আপত্তি বা সংকোচ বা দ্বিধাকে তাঁরা স্পষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো আদিরসকে 'অশ্লীল' বলে দূরে সরিয়ে না রাখলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা'তে শৃঙ্গার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। শৃঙ্গার অঙ্গীরস হলে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও মহান ভাব আদৌ বজায় থাকতে পারে কি না, সে বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন[55]। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*-এ ভবভূতি রচিত তিনটি নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন—

> ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; অনাবশ্যক স্থলে, কোনও ক্রমে স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, অনাবশ্যক [য] স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন।[56]

---

[55] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য," *ভারতী* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ২৬৫-৬৭।

[56] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৭।

এখানে 'অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলে' আদিরস প্রয়োগের বিরোধিতা করা হয়েছে। 'অনাবশ্যক' ও 'অনুচিত' শব্দের প্রয়োগ দেখে আপাতভাবে ধারণা হতে পারে যে, তাহলে আদিরসের 'আবশ্যক' ও 'উচিত' পরিসরও থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই রসের দ্বারা রচনা 'দূষিত' হতে পারে— এ হেন আশঙ্কাপূর্ণ ভাষাব্যবহার আদিরস সম্পর্কে উনিশ শতকের সাধারণ মনোভঙ্গিকে স্পষ্ট করে দেয়। প্রায় একইভাবে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রবন্ধে 'অনাবশ্যক আদিরস'-কে 'উন্নত গভীর ভাব' প্রকাশের অন্তরায় বলেই ধরেছেন কালীপদ ঘোষ।[57] এই প্রবন্ধেই কালিদাস-বর্ণিত আদিরসকে 'আদিরসের অপকৃষ্টাংশ' বা 'প্রেমের অপভ্রংশ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

> কালিদাস যে দুইখানি নাটক লিখিয়াছেন তাহা আদিরস-প্রধান। এই রসের অপকৃষ্টাংশ এ দুইখানি নাটকে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কালিদাস প্রেমের অপভ্রংশ বর্ণনা করিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু শান্ত, পবিত্র, দেবতুল্য, শারদশশীর ন্যায় একেবারে হৃদয়গ্রাহী চক্ষুপ্রীতিপ্রদ ও নির্ম্মল প্রেমের বর্ণনা কালিদাস কুত্রাপি করেন নাই।[58]

তবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বা কালীপদ ঘোষ কেউই যে শৃঙ্গারের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন, এমন নয়। *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' নামক প্রবন্ধেও আদিরসকে সামগ্রিকভাবে 'অশ্লীল' না বলে আদিরসের একটি বিশেষ ধরনের প্রকাশ সম্বন্ধে বিরোধিতার মনোভাব দেখানো হয়েছে—

---

[57] কালিদাসের কাব্যে উন্নত গভীর ভাব সচরাচর নাই, কারণ, তিনি অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস আনিয়া ফেলেন। [উৎস: কালীপদ ঘোষ, "কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৪৩৬-৩৭।]

[58] কালীপদ ঘোষ, "কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৩৮৮।

পুরাকালে বঙ্গসাহিত্য পাঠে দেখা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব-আদি কবিরা আদিরসটিকেই তাঁহাদের কল্পনা-কাননের সকল পুষ্প দিয়াই সাজাইয়াছিলেন।

...তাঁহাদের কবিতা পাঠে এমন বোধ হয় না যে, প্রণয় আমাদের জীবনমালিকার মূলসূত্র এবং সংসারসমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র; বরং কেবল এইমাত্র বোধ হয় যে, প্রণয় আমাদের যৌবনকালের একটি উপাদেয় লীলাস্বরূপ।[59]

ঠাকুর পরিবারের আরেক সদস্য সরলা দেবী 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে, কেবল আদি বা বীর রসকেই সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু করে তোলার সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলেছেন—

নাটকান্তর্গত রস মোটের উপর একই- হয় আদি নয় বীর। যে বেগবতী চিত্তবৃত্তি সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যের কার্য্যের মূল এবং যাহাদের সংখ্যা অসংখ্য তাহাদের গুটিকতমাত্রকে লইয়া সকল কবিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সহৃদয়তা স্ফূর্তি পায় না।[60]

'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এ নিন্দিত হয়েছিল 'অনাবশ্যক আদিরস'। শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা *নব্যভারত* পত্রিকায় 'ভারবি' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেখানেও আবার 'অনুচিত আদিরস' বা 'অনবগুণ্ঠন' আদিরসকে নিন্দা করা হয়েছে[61]। ভারবিকে যে দোষে অভিযুক্ত করেছিলেন শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, প্রায় একই দোষে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অভিযুক্ত

---

[59] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ৮৪-৮৫।

[60] সরলা দেবী, "মুদ্রারাক্ষস," *ভারতী* ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ১২০।

[61] একটি বিষয়ে ভারবি আধুনিক পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অভিযুক্ত। *তিনি অনুচিত আদিরসের বর্ণনা দ্বারা যে কয়েকটী সর্গ কলুষিত করিয়াছেন,* উহা না করিলে তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য হত। তাঁহার ন্যায় আর একজন মনস্বী কবি *ভবভূতি উত্তরচরিতাদি নাটকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলেও অতি সাবধানে আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুত অনবগুণ্ঠন আদিরস বর্ণনা করা প্রাচীন কবিদিগের একটি মহাদোষ।* মাঘভট্টও ভারবির অনুকরণ করিতে বসিয়া নিতান্ত অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা শিশুপাল বধের ৪ টি সর্গ নিতান্ত অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন। [উৎস: শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, "ভারবি," *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৫১৫।] (নজরটান আরোপিত)

করলেন বীরেশ্বর গোস্বামী। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রবন্ধে তিনি বললেন— অস্থানে, অপাত্রে, আদিরসের অবতারণা সাধারণতঃ মাইকেলের প্রধান দোষ[62]। মাইকেলের আরেক সৃষ্টি *মেঘনাদবধ কাব্য* নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ অংশে বীররসের সঙ্গে শৃঙ্গারের সম্মিলনকে এর 'সৌন্দর্যহানির কারণ' হিসেবে বিশ্লেষণ করেছিলেন—

> প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ মেঘনাদবধের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহা যে নির্দোষ প্রমাণিত হইবে, তাহা নয়। বীর রসের সঙ্গে তাঁহার "ব্যভিচারী" শৃঙ্গার রসের সম্মিলন করাতে স্থানে স্থানে ইহার সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে।[63]

বীরের সঙ্গে আদিরসের মিশ্রণকে নাকচ করার পাশাপাশি, আদিরসের স্থানে বীভৎসরসের উদ্রেকের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে[64]। আবার, নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন লেখেন "বিদ্যাসুন্দর আদিরসাত্মক কাব্য নহে; উহা অশ্লীল বা অসৎকাব্য"[65], তখন আদিরস এবং অশ্লীলতার এক দ্বৈততা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়। আদিরস যে অশ্লীলতার সমার্থক নয়, সে বিষয়ে আরও একবার তাঁর অবস্থান স্পষ্ট

---

[62] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য (উপসংহার)," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৬৪-৬৫।

[63] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র: দ্বিতীয় প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ১৫১।

[64] তাঁহাদের [ইংরাজ আলংকারিকদের] লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কিনা সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই...। বিশেষতঃ আদিরসের স্থলে অনেকে অপরের মনে আদিরসের ভাব না আনিয়া বীভৎসরসের উদ্রেক করিয়া দেয়। সুতরাং ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্য হইলেই যে অন্যের হৃদয়ে সেই ভাবের তরঙ্গ উঠিবেই উঠিবে তাহা বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। [উৎস: চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২২৩-২৯।]

[65] নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, "ভারতচন্দ্র," *সাহিত্য* ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৭৫৫-৫৮।

করেছেন নলিনীনাথ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের অনেক লেখকই আদিরসকে সরাসরি নস্যাৎ না করে এর একটি বিশেষ প্রকারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৫.১.৬ আদিরস বনাম শৃঙ্গাররস

দেখা গেল, সংস্কৃত-আলংকারিক কথিত আদিরসকেই সামগ্রিকভাবে অশ্লীল বলে মনে করেছিলেন 'শিক্ষিত বাঙালি'র একাংশ'। বঙ্কিমচন্দ্র একে বলেছিলেন 'কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি', হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তেমনি আবার বলছেন আদিরস হল সেই রস যার অবতারণায় 'স্তন, চুম্বন' এমন দু-একটি শব্দ 'আবশ্যকমত' প্রয়োগ করতে হয়। আবার, নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'প্রেমবৃত্তির উচ্ছ্বাস'ই আদিরস। নলিনীনাথ স্বয়ং অবশ্য এই 'উচ্ছ্বাস' তথা 'ইন্দ্রিয়লালসা'-কে 'আদি' বা মানবমনের প্রধান বৃত্তির আসনে বসাতে নারাজ হয়েছিলেন। কারণ তা 'বলবতী' হলেও 'অপকৃষ্ট'। প্রথম অনুভূত রসও এটি নয়।[66]

এই নেতিবাচকতা ও দোলাচলের মধ্যে উনিশ শতকীয় গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার পাঠে এমন এক দল লেখক-সমালোচকেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যাঁরা আদিরস সম্বন্ধে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ আদিরস মানেই তা অশ্লীল এবং অশ্লীলতা মানেই তা নেতিবাচক— আদিরসকে এমন দ্বিধাহীন অতিসরলীকরণের আওতায় তাঁরা ফেলতে

[66] দেকার্টে ও স্পাইনোজা প্রেমকে একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন— এই বৃত্তির উচ্ছ্বাসই আদিরস। আদিশব্দে "প্রথম" অর্থ হইলে আদিরস প্রথম রস। কিন্তু মনুষ্য, আহারের অভাব প্রথম অনুভব করে; তবে আদিরস প্রথম অনুভূত রস নহে। আদি অর্থে "প্রধান" হইলে, আদিরস প্রধান রস। কিন্তু যে রসে বিদ্যাসুন্দর গঠিত, ভারতের পুণ্য ঋষিরা কি তাহাকে মনুষ্যের প্রধান বৃত্তির উচ্ছ্বাস কহিতে পারেন? দয়া, ভক্তি, প্রেম হইতে ইন্দ্রিয়লালসা বলবতী হইতে পারে; কিন্তু অপকৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

পারেননি। আবার আদিরসকে বিনা প্রশ্নে অনায়াস সাবলীলতায় গ্রহণও যে করতে পেরেছেন— এমন নয়।

এই শ্রেণির একদল তাত্ত্বিক-সমালোচকের মধ্যেই 'আদিরস' এবং 'শৃঙ্গাররস'— এ দুইয়ের পৃথক রসরূপ প্রমাণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের অধিকাংশই বিশ্বনাথ কবিরাজের মতো 'লৌকিক কাম' (শৃঙ্গ তথা মন্মথের উদ্ভেদ) অর্থেই আদিরস শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অভিনবগুপ্ত বা ভোজের মতো কতিপয় তাত্ত্বিক শৃঙ্গারের অন্যতর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন[67]। কিন্তু মূলত *সাহিত্যদর্পণঃ* পাঠে অভ্যস্ত বাঙালি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা যে কাম ছাড়া শৃঙ্গারের অপর কোনও অর্থের কথা বলতে চেয়েছেন, এমন মনে হয় না। নবাগত ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার সঙ্গে আপস করতে তাঁরা কামেরই দুটি রূপ দেখাতে চেয়েছেন।

তাঁদের ভাবনায়, আদিরস হল নারীপুরুষ সম্পর্কের এক পবিত্র, শরীরবাসনাহীন নিষ্কলুষ সাহিত্যরূপায়ণ। অন্যদিকে শৃঙ্গার ভোগবিলাস, নাগরিকতা ও কৃত্রিমতার দোষে দুষ্ট। সে কারণেই কুরুচিময়। সেখানে আদিরসের সেই পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতার স্পর্শ নেই বলেই তা গর্হিত ও বর্জনীয়— এই জাতীয় এক ন্যারেটিভ উঠে আসে উনিশ শতকীয় সমালোচনার একাধিক দৃষ্টান্তে। এই বিভেদ-প্রকল্পে শৃঙ্গারকে কুরুচিপূর্ণ-অশ্লীল এবং আদিরসকে পবিত্র, কলুষহীন প্রমাণ করার চেষ্টাই প্রকট। যেমন, বীরেশ্বর গোস্বামী

[67] ভোজদেবের মতে শৃঙ্গারই কাব্যের কময়ীয়তাহেতু। এই শৃঙ্গার-রসাভিমান প্রাণিগণের অন্তরে বিশিষ্ট অদৃষ্ট-(বাসনা) রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; ...তাই ভোজরাজ বলিয়াছেন, 'কবি যদি কাব্যে শৃঙ্গারী (অভিমান-সম্পন্ন) হন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যজগৎ রসময় হইয়া উঠে;...' [উৎস: অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ৮৯।]

বীরাঙ্গনা কাব্য-এর সমালোচনায় আদিরসকে বিশুদ্ধতার মর্যাদা দিলেও, শৃঙ্গারকে 'দূষ্য বা কুরুচিকর' বলে চিহ্নিত করেছিলেন—

> আমরা পূর্ব্বে "আদিরস" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি, (তাহার কারণ, এই অর্থেই এ শব্দ ভ্রমক্রমে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়) কিন্তু *"শৃঙ্গার রস" বলিলেই ঠিক হইত। প্রাচীন কবিরা এই দুই রসের বড় একটা প্রভেদ করিতেন না, কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধান পরিমাণে ইহাদের মানদণ্ড হয় না!* ...মানবের আদিপিতা সপ্রেম সম্ভাষণে প্রিয়াকে জাগরিত করিতেছেন...ইহাই আদিরসের চিত্র; কে বলিবে, ইহা দূষ্য বা কুরুচিকর? এ সব [গৌরী মহাদেবকে দেখে লজ্জারক্তিম কপোলে দাঁড়িয়ে আছেন], আদিরসের চিত্র; কে বলিবে ইহা অশ্লীল?[68]

প্রায় একই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাসুন্দরকে 'আদিরসাত্মক কাব্য' বলার বিরোধিতা করেছেন। কারণ, তাঁর মতে বিদ্যাসুন্দর শৃঙ্গাররসাত্মক। অন্যদিকে 'আদিরস' শব্দটিকে তিনি কামগন্ধহীন প্রেমের নামান্তর হিসেবে গ্রহণ করেছেন—

> অনেকেই কবিরাজের ধুয়া ধরিয়া বলেন, রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য— বিদ্যাসুন্দর আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু আদিরস কাহাকে বলে? পৌরাণিক বলিবেন, যে রস আস্বাদন করিয়া সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী অমর; তাহার নাম আদিরস; মরুময় ইন্দ্রিয়ের চির-বুভুক্ষা নহে। প্রেম অর্থে স্বার্থত্যাগ; বাঞ্ছিতের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া। *আদিরস দেহের সহিত পুড়িয়া যায় না; এ দেশের অধঃপতনের সহিত জাতীয় অলঙ্কারে, আদিরস ও শৃঙ্গাররস, একার্থবাচক হইয়াছিল।*[69]

---

[68] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য: উপসংহার," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৫৯। [নজরটান আরোপিত]

[69] নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, "ভারতচন্দ্র," *সাহিত্য* ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৭৫৫। [নজরটান আরোপিত]

নলিনীনাথ 'আদিরস ও শৃঙ্গাররস'-এর একার্থবাচকতার বিরোধিতা করলেন তো বটেই, উপরন্তু জানালেন এই দুই রসের সমার্থক হয়ে ওঠা 'এ দেশের অধঃপতন'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। বলা বাহুল্য, 'অধঃপতন' বলতে এক্ষেত্রে নৈতিক স্খলনকেই বোঝানো হয়েছে। এইভাবেই উনিশ শতকীয় পরিমণ্ডলে শৃঙ্গারের সঙ্গে নেতিবাচকতার যোগসূত্র রচিত হয়ে যাচ্ছিল।

সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'জয়দেব' নামে একটি প্রবন্ধ[70]। সেখানে জয়দেবের কাব্যে আদিরসের উপস্থিতিকে স্বীকার করা হলেও তাকে 'শ্রীহানি'র কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়নি। বরং দায়ী করা হয়েছে কবির 'আত্মবিস্মৃতির অভাব'কে। তবে লেখক জয়দেবের বর্ণনাকে 'শৃঙ্গারকলুষ' বলে অভিহিত করতেও ছাড়েননি—

> শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র; ...*কিন্তু এই শৃঙ্গার-সম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ যাহা বল*।
>
> ...তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠে তাহাই নাই।
>
> ...এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গার রস নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।...*এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।*[71]

অর্থাৎ, প্রাবন্ধিকের অভিযোগ *গীতগোবিন্দম্*-এ আদিরসের উপকরণ থাকলেও তা আত্মবিস্মৃত সরলতায় মহিমময় হয়ে ওঠেনি। অবশ্য সম্ভোগ বা দেহলগ্নতাকে দোষারোপ করেননি তিনি। বরং যে কৃত্রিমতা-নাগরিকতা আদিকে 'শৃঙ্গারকলুষ'-এ পর্যবসিত করেছে

---

[70] লেখকের নাম অজ্ঞাত।

[71] অজ্ঞাত, "জয়দেব," *সাধনা* ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ (১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩২৪-২৮। [নজরটান আরোপিত]

তাকেই দায়ী করেছেন। এই সমস্ত উদাহরণ থেকে উনিশ শতকের শৃঙ্গার-সংক্রান্ত দ্বিধাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে শুরু করে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-নাট্যতত্ত্বের কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেই আদি ও শৃঙ্গারের এই জাতীয় পার্থক্য চোখে পড়ে না। অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, “সকল রসের আদিভূত শৃঙ্গাররস। তাই ‘আদিরস’ ইহার অপর নাম।”[72] *নাট্যশাস্ত্র*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোকে[73] নাট্যের আটটি রসের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে শৃঙ্গাররসের কথা। ভারতীয় রসশাস্ত্রে যাঁরা অষ্টরসবাদী, তাঁদের মতে মূল রস চারটি— শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। বাকি চারটি অপ্রধান রসের উৎপত্তি এই মূল রসগুলি থেকেই। *ভাবপ্রকাশন* গ্রন্থের রচয়িতা শারদাতনয়-এর মতে শৃঙ্গারের উৎপত্তি সামবেদ থেকে। ব্রহ্মা ‘ত্রিপুরাহ’ নামে যে নাটক রচনা করে সভার নটদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন, তা দেখতে গিয়ে ব্রহ্মার চার মুখ থেকে চারটি বৃত্তিজাত চারটি রস নির্গত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে কৈশিকী বৃত্তিজাত রসটি হল শৃঙ্গার। কিন্তু শৃঙ্গার-সংক্রান্ত কোনও আলোচনাতেই আদিরস এবং শৃঙ্গারকে পৃথক প্রতিপন্ন করার কোনও চেষ্টা নেই। বরং এ দুইয়ের সমার্থকতার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। তাই ধরে নেওয়া যায়, আদি এবং শৃঙ্গারের এই বিভাজন উনিশ শতকেরই সৃষ্টি। উনিশ শতকে ইংল্যান্ড থেকে আগত মূল্যবোধ এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত বাঙালি ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানিজমের ধারণা ধীরে ধীরে আত্মস্থ করতে শুরু করে। ফলে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে শৃঙ্গাররসের অসংকোচ প্রকাশকে তাঁদের পক্ষে মন থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত

---

[72] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ২৬।

[73] শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।... [উৎস: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ভরত নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১৩৩।]

কাব্যতত্ত্ব-অবলম্বনকারী প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা আবার কাব্যতত্ত্ব থেকে সরাসরি উঠে আসা শৃঙ্গারের গুরুত্বকেও অস্বীকার করতে পারছিলেন না। উভয় ধারণার মধ্যে দোলাচলে পড়েছিলেন যাঁরা, একপ্রকার মধ্যস্থতার মনোভাব থেকেই থেকেই আদি ও শৃঙ্গারকে পৃথক করে নিজেদের পিউরিটান মূল্যবোধ ও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রজ্ঞানের ভিতরকার দ্বন্দ্ব তাঁরা মেটাতে চেয়েছিলেন।

অর্থাৎ ভিক্টোরীয় নৈতিকতাবোধে আচ্ছন্ন সমাজের প্রয়োজন ছিল এমন এক পরিসর যেখানে প্রাচীন রসতত্ত্বকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য না করেও শৃঙ্গার-সংক্রান্ত ভাবনাকে নীতিবোধের আওতায় নিয়ে আসা। আদি-শৃঙ্গার বিভাজন সেই উদ্দেশ্যকেই সফল করেছিল।

৫.২ বীররস, রৌদ্ররস ও ভয়ানকরস

অশ্লীলতার প্রতি বিরূপতা বাঙালি মানসে একদিকে শৃঙ্গারের প্রতি বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত করেছিল। অন্যদিকে শৃঙ্গারের কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবেই বীররস তথা বীরত্বের ভাবের প্রতি একধরনের পক্ষপাত লক্ষ করা যাচ্ছিল। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনায় বীররসের কয়েকটি সাধারণ উল্লেখের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক—

- নবম সর্গ বীররসপ্রধান।... বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়।[74] (প্রসঙ্গ: *বৃত্রসংহার*-এর সমালোচনা)

- হের হের রণ মাঝে নাচিছে সুন্দরী রে
নাচিছে সুন্দরী!
...এ স্থানে যে কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে বর্ণনীয় বীর রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, সেই জন্যই এটী কবিতা।[75]

---

[74] অজ্ঞাত, "বৃত্র সংহার:," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৫০৯।

[75] শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ২৯।

- সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে নাটকে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, বেণীসংহারে সে সমস্তই প্রায় দৃষ্ট হয়। প্রত্যুতঃ বেণীসংহারের ন্যায় এত উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক নাটক সংস্কৃত ভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষায় তিন খানি নাটক তিন রসের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররামচরিত, এবং ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার,— শৃঙ্গার, করুণ, ও বীররসবিষয়ে জগতের আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।... ভেলা দ্বারা সাগর পার হওয়ার ইচ্ছার ন্যায় বীররসের উদ্দীপনার চেষ্টা উন্মাদবিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীত হয়।[76] (প্রসঙ্গ: *বেণীসংহার*-এর সমালোচনা)

- 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে সমবকার সম্পর্কে বলা হয়েছে– "বীর রস ইহার অঙ্গী," ভাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে— "ইহাতে শৌর্য্য-বর্ণন দ্বারা বীর রস ও কোন গ্রন্থে বা সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা আদ্যরসও বর্ণিত হইয়া থাকে।"[77]

- ইন্দ্রজিতের হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ। ...বীরাঙ্গনা-প্রমীলা-হৃদয়ে বীররসের সহিত প্রগাঢ় স্নেহরস মিশ্রিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব ভাব হইয়াছে।... কুসুম বীররসের উদয়ে উত্তপ্ত হৃদয়ের তেজে মলিন হয়। ...এখানেও ইন্দ্রজিতের বীর-ভাবের বিকাশ...[78]

- তিনি [রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী।[79]

- কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরাজিতে রোমান্স। ইহা বীররসপ্রধান।[80]

- লোকহিতৈষী, পরহিতব্রত, শান্তিরসনিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর।... ঋষি, ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু, ইন্দ্র, ঋষির প্রাণভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন— কী প্রকারে তাহা বলিবেন? ...তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ মহাচিত্র বাঙ্গালাসাহিত্যে দুর্লভ।[81]

---

[76] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৩৯৪।

[77] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ১৮২-৮৩।

[78] নক্ষত্র নাথ দেব, "প্রমীলা ও ইন্দুবালা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪৭৬।

[79] অজ্ঞাত, "দানবদলন কাব্য," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ বঙ্গাব্দ): ৯২।

[80] অজ্ঞাত, "নবেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য," *বঙ্গদর্শন* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ২৫।

[81] অজ্ঞাত, "বৃত্রসংহার," *বঙ্গদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ৪৫১

- দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণরসে।[82]

- তাই বোধ করি শক্তি [বাংলাদেশে] জমিল না। যেটুকু বা জমিয়াছে তাহাতে বীররসের প্রাবল্য কি অন্য কোনও বিদ্রূপাত্মক রসের প্রাধান্য নিঃসংশয়ে বলা যায় না।[83]

- এই কাব্য [মাঘের *শিশুপালবধ*] বীররস প্রধান। ইহার নায়ক কৃষ্ণ। প্রতিনায়ক শিশুপাল। ...বীররসের অবতারস্বরূপ বলদেবের তেজস্বিনী বক্তৃতা... ...মাঘের ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণ নৃপতিগণের আধার...। মাঘের বলদেব বীররসের জ্বলন্ত ছবি।... [84]

- তাঁহার [ভারবির] লেখনী কখনও বীর-রসে প্রমত্ত হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে... কোথাও শান্তি সলিল প্রক্ষেপ দ্বারা বীরহৃদয়েও বৈরাগ্য জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছে।[85]

- এই মহাকাব্য বীররস প্রধান; আদি ও শান্তিরস অপ্রধানরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।[86]

- Hamlet এর এই করুণ-রসের পর এক্ষণে একটু বীররস হউক।[87]

- ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িতা।[88]

- সংস্কৃত ভাষায় বীররসের ঈদৃশ কাব্য দ্বিতীয় নাই। ...পঞ্চালরাজের সেনাগণকে এইরূপে বীরমদে মাতাইবার জন্যই বেণীসংহার রচিত হইয়াছিল।[89]

---

[82] অজ্ঞাত, “বৃত্রসংহার,” *বঙ্গদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ৫২৪।

[83] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “শিব,” *ভারতী ও বালক* ১৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ১১০।

[84] শরচ্চন্দ্র বাক্যরত্ন, “মাঘভট্ট,” *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৩৭-৩৮।

[85] শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, “ভারবি,” *নব্যভারত* ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৫১৫।

[86] শর্ম্মা, “ভারবি,” ৫১৮।

[87] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: বনফুল কাব্য,” *বঙ্গদর্শন* ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ৫২৬।

[88] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, “শ্রীহর্ষ,” *নানা প্রবন্ধ* (কলকাতা: নব গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৮৮৫), ৭২।

[89] উমেশচন্দ্র বটব্যাল, “নূতন তাম্রশাসন,” *সাধনা* ৩য় বর্ষ, ২য় অংশ ২য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ১০৯।

- স্বামীর ভাবী বিরহের সম্ভাবনায় সাধ্বীর প্রাণ কিরূপ ব্যাকুলিত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বীর-রসাত্মক কাব্যের কবি তাঁহার আদর্শ বীর পত্নীকে এইরূপ অশ্রুসিক্ত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।[90]

- প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ মেঘনাদবধের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহা যে নির্দোষ প্রমাণিত হইবে, তাহা নয়। বীর রসের সঙ্গে তাঁহার "ব্যভিচারী" শৃঙ্গার রসের সম্মিলন করাতে স্থানে স্থানে ইহার সৌন্দর্যের হানি হইয়াছে।[91]

- মুর্শিদাবাদ কাহিনী বীররস প্রধান মহানাটক।[92]

- লক্ষ্মণ-ভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে।[93]

উদাহরণের এই বাহুল্য থেকেই বোঝা যায় বাঙালি সাহিত্য সমালোচকের মনোভূমিতে বীররস নেহাত স্বল্প স্থান জুড়ে ছিল না। শৃঙ্গারকে নস্যাৎ বা অগ্রাহ্য করতে গিয়ে কিংবা আদিরসকে একপ্রকার নেতিবাচক তাৎপর্য দিতে গিয়ে বীররসের প্রতি তাঁদের পক্ষপাত প্রকট হয়ে উঠছিল প্রায়শই।

৫.২.১ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে বীররস ও রৌদ্ররসের স্বল্পতা সংক্রান্ত অভিযোগ

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বীররসের অভাব সম্পর্কে অনুযোগ শোনা গেছে একাধিকবার। যেমন, *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—

---

[90] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র, প্রথম প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৬৪।

[91] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র, দ্বিতীয় প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ১৫১।

[92] অজ্ঞাত, "প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: মুর্শিদাবাদ কাহিনী, বাবু নিখিলনাথ রায়, বি.এ প্রণীত," *নব্যভারত* ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ৪৭।

[93] শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজাত শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত, "রামায়ণের সমালোচনা: ব্যঙ্গরচনা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৭২।

> প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে যে কেবলই আদি রস, অন্য রসের ঐকান্তিক অভাব, তাহা নহে। অন্যান্য রসের একেবারে অভাব হইলে এ সাহিত্য এতদিন টিকিত না। কিন্তু একটি জিনিসের বাঙ্গলায় অভাব আছে— বীর রস।[94]

এর কিছুদিন পূর্বেই *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় 'শ্রীলক্ষ্মী নামে লেখা এক সমালোচনায় বাংলা কাব্যে বীররসের অভাব নিয়ে সুগভীর আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল। বাংলা কাব্যে বীরচরিত্র নেই, 'মহত্ত্বদ্যোতক' বীররস নেই বলে[95] দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন 'শ্রীলক্ষ্মী'। লিখেছিলেন—

> ...এ কালিমাময় কলিকাল ভারতের কালরাত্রি; এখন সমস্ত আর্য্য সন্তান জড়বৎ নিস্পন্দ। দুই একজন কবি ভারতের পূর্ব্ব প্রভা স্বপ্ন দেখিয়া "উঠ, জাগ বীরগণ" বলিয়া এক একবার চীৎকার করেন বটে, কিন্তু তখনই-
>
> "রাই জাগ, রাই জাগ! শুক সারী বলে..."
>
> অমনি আর্য্যকবির হৃদয়-কমলিনী (পৃষ্ঠা ২৭৬) নিদ্রাভঙ্গের সুকোমল করুণস্বরে বলিয়া উঠেন—
>
> "এখনও যামিনী আছে কোথা যাবে বল প্রাণ..."
>
> *ইহাতেই বঙ্গের কবি গলিয়া যান এবং বীররসের অবতারণা করিতে গিয়া, আদিরসের ছড়াছড়ি করিয়া বসেন। নিস্তেজ, ভীরু, বাঙ্গালী বাবু-পরিবৃত বাঙ্গালী কবির পক্ষে প্রকৃত বীরচরিত্রের কল্পনা বোধ হয় অসম্ভব, তাই বাঙ্গালা ভাষায় বীররসাত্মক মহাকাব্য নাই।*[96]

---

[94] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য," *ভারতী ও বালক* ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১২৮-২৯।

[95] আমরা বাঙ্গালা ভাষায় যে দুই তিন খানি মহাকাব্য দেখিয়াছি সে সমস্তই নামে মহাকাব্য, বস্তুতঃ সে সকল কাব্যে মহাকাব্যের কোনই লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মহত্ত্বই মহাকাব্যের প্রাণ। কিন্তু সে সকল কাব্যে মহতী দৃশ্য-কল্পনা, মহতী চরিত্র রচনা, সুগম্ভীর ভাবব্যঞ্জনা কৈ? মহত্ত্বদ্যোতক সে বীররস কৈ? একটী মাত্রও বীর-চরিত্র কৈ? "মেঘনাদ বধ" নারীপ্রধান কাব্য, "বৃত্রাসুর বধ"-ও নারীপ্রধান কাব্য।

[96] শ্রীলক্ষ্মী, "বাঙ্গালা গীতিকাব্য: সমালোচনা— কবিকাহিনী। দীনেশচরণ বসু প্রণীত এবং কবিতামালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্ বিরচিত," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ২৭৫-২৭৬। [নজরটান আরোপিত]

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন, উনিশ শতকের বাঙালির কাছে বীররস যে ঐশ্বর্যময় তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রায় একই গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল রৌদ্ররস। বীররসের অনুপস্থিতি নিয়ে অভিযোগের অনুরণন তাই শোনা যায় রৌদ্ররসের ক্ষেত্রেও। কালিদাস রৌদ্র, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রসের বর্ণনা ভালো করতে পারেন না— এই মন্তব্য করা হয়েছে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রবন্ধে[97]। একইসঙ্গে কালিদাসের কাব্যে ভয়ানক রসের বিরলতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে[98]। *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রবন্ধে 'ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আদিমিশ্রিত রৌদ্ররস'-এর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে[99]। 'জটিল সন্ন্যাসী' ছদ্মনামে রচিত 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে রূপকের একটি বিশেষ শ্রেণি ডিম-এ রৌদ্ররসকে অঙ্গীরস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে[100]। *বঙ্গদর্শন*-এ *বৃত্রসংহার*-এর সমালোচনায় বীররসের সমতুল্য হিসেবে এসেছে রৌদ্রের উল্লেখ[101]।

---

[97] তিনি রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রস সকলের বর্ণনা করিতে পারেন না। [রঘুবংশে] কালিদাসের বর্ণনা কেবল বীররসের বিড়ম্বনা মাত্র। এই রূপ অন্যান্য রসেরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।... রৌদ্ররসের বর্ণনা কালিদাস ভালো করিতে পারেন না।

[98] ভয়ানক রসের বর্ণনা কালিদাসে অতি বিরল, যথা রঘুর দ্বিতীয় সর্গে কামধেনু কর্ত্তৃক দিলীপের ছলনা, পঞ্চম সর্গে মত্ত রাবণের আগমন, কুমারের তৃতীয় সর্গে এ সকল স্থল কিছু বিশেষ ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয় না। [উৎস: কালীপদ ঘোষ, "কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।]

[99] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য (উপসংহার)," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৬৫-৬৬।

[100] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা: নাট্য পরিশিষ্ট," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮৪।

[101] দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। [উৎস: অজ্ঞাত, "বৃত্র সংহার: ১ম সংখ্যা," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৪৭৩।]

এইখানে উল্লেখ্য, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ রৌদ্ররসকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে 'রাক্ষস' এবং 'দানব'দের জন্য[102]। কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিতে রৌদ্ররস এ জাতীয় নেতিবাচক ব্যঞ্জনা থেকে মুক্ত ছিল। বরং এক ধরনের ইতিবাচক ব্যঞ্জনাই লক্ষ করা যায়। *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী *প্রসাদপ্রসঙ্গ*-এর সমালোচনা। সমালোচকের মতে বাঙালির 'সর্ব্বনাশ' তথা 'কামিনী-সুকুমার' দুর্বলতার কারণ শৃঙ্গাররসের মাত্রারিতিক্ত চর্চা। তিনি এর বিপরীতে চেয়েছেন বীররসের 'সাহস ও প্রমত্ততা' এবং রৌদ্ররসের 'প্রচণ্ডতা ও ভীষণতা'কে—

> ইহাতে [আদিরসে] তাহার সর্ব্বনাশ হইল, স্বদেশ উৎসন্ন হইয়া গেল, তাহার প্রকৃতি কামিনী-সুকুমার দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তবু কি তাহার এ রসে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না? বীররসের সাহস ও প্রমত্ততা, রৌদ্ররসের প্রচণ্ডতা ও ভীষণতা তাহাকে কি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? তবে আর মনুষ্যত্ব কোথায়?[103]

ইংরেজ শাসকের আরোপিত দুর্বলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার অভিযোগের বিরুদ্ধে যুঝতে উনিশ শতকীয় বাঙালির প্রয়োজন ছিল নিজের বীরত্বগৌরবপূর্ণ পৌরুষযুক্ত এক ভাবমূর্তি প্রচার। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক দ্রোহের কোনও প্রকল্প অঙ্কুরিত না হলেও নানা বিষয়ে ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের আবহ প্রস্তুত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। উনিশ শতকের সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, নাটক, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিধৃত আছে। এই রাজনৈতিক-মানসিক প্রেক্ষাপট থেকেই বাঙালির

---

102 রৌদ্র (রসের) স্থায়িভাব ক্রোধ, এর উদ্ভব হয় রাক্ষস, দানব ও উদ্ধত মানুষের মধ্যে; এর কারণ সংগ্রাম। ...এই বিষয়ে বলা হয়েছে— রাক্ষস, দানবাদির রৌদ্ররস বলা হয়েছে। অন্যদের কি এই রস নেই? অন্যদেরও রৌদ্ররস আছে। এই বিষয়ে (রাক্ষসাদির বিশেষ) অধিকার বুঝতে হবে। [উৎস: বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, ১৪৭।]

103 শ্রীপূ—, "রামপ্রসাদ সেন*," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৪৯।

কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল বীররসের পাশাপাশি রৌদ্ররস, এমনকি ভয়ানকরসও। তৎকালীন কবিতা, নাটক, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির এক বড়ো অংশ জুড়ে দেখা যায় সাহসিকতা, প্রমত্ততা ও ভয়ংকরের জয়গাথা। উনিশ শতকের রসতত্ত্বচর্চাও এই প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিব' নামক প্রবন্ধে বীররসের যথাযথ বিকাশের অভাবে কাব্যসৌন্দর্যের হানির কথা উল্লেখ করেছেন—

> বাঙ্গালার শাক্তকাব্যে শক্তির মহিমা প্রচারিত হইলেও যথার্থ বীর রসের সম্বন্ধ অল্পই। ...শক্তির মধ্যেও কোমল রসেই আমাদের হৃদয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এমনকি অনেক স্থলে এই জন্য রসের যথাযথ বিকাশ অভাবে কাব্যের হানিও স্বীকার করিতে হয়।[104]

একইরকম অনুযোগ শোনা যায় 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধে— "একটী জিনিষের বাঙ্গলায় অভাব আছে— বীর রস।"[105] অনুরূপভাবে *নব্যভারত* পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায়কে নায়ক করে লেখা *ভারত-মঙ্গল* কাব্যের সমালোচনায় বলা হল—

> কিন্তু এখানে একটী কথা বলিতে হইতেছে- মহাকাব্যে বীররস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি যাবতীয় রসেরই সমাবেশ আবশ্যক। ১ম খণ্ড ভারত-মঙ্গলে ইহার কোন কোনটীর অভাব আমরা বড়ই অনুভব করিয়াছি।[106]

এখানে প্রত্যক্ষভাবে বীররসের প্রতি পক্ষপাত না থাকলেও সংস্কৃত রসশাস্ত্রে সর্বদাই শৃঙ্গারের প্রাধান্য যে অহেতুক এবং অযৌক্তিক এমন এক সংশয়চিহ্ন দেখা

---

[104] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "শিব," *ভারতী ও বালক* ১৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ১১০।

[105] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য," *ভারতী ও বালক* ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১২৮-২৯।

[106] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা, ভারত-মঙ্গল। পূর্ব্ব খণ্ড, সটীক; আনন্দচন্দ্র মিত্র-বিরচিত। প্রথম সংস্করণ," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৩১৪।

দিয়েছিল উনিশ শতককে। শৃঙ্গারের বদলে বীররস-রৌদ্ররসেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল— এমন প্রচ্ছন্ন বার্তাও রয়ে যাচ্ছিল কোনও কোনও রচনায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বীর-রস' শীর্ষক চতুর্দশপদী সনেটে বীরকে 'রস-কুল-পতি'[107] বলে উল্লেখ করেছিলেন। 'স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী' সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের শৃঙ্গার-প্রাধান্যের জন্যই যথাযোগ্য গুরুত্ব পাচ্ছে না[108]— এমন মত পেশ করেছিল *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'রস' প্রবন্ধ[109]। *নব্যভারত* পত্রিকায় *হামির* নামক এক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমালোচনায় বলা হয়েছিল— "আদিরসপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির নভেলে তিনি [লেখক] যে বীররসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার কথা।"[110]

আসলে, ইংরেজ শাসক উনিশ শতককে তৈরি করেছিল বীরত্ব-সংক্রান্ত ধারণার এক আধিপত্যকামী বয়ান। সেই বয়ানে বাঙালি ভীরু, বীরত্বহীন এবং পরাজিত এক সত্তা। পরাধীন বাঙালি জাতির প্রয়োজন ছিল ইংরেজ আধিপত্যের প্রতিস্পর্ধী কোনও এক তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌঁছনো। সেই কারণেই সংস্কৃত রসশাস্ত্র জুড়ে থাকা শৃঙ্গারকে অগ্রাহ্য করে বীররসকে সাদরে বরণ করে নেওয়ার প্রবৃত্তি চোখে পড়ে প্রায়শই।

---

107 "বীর-রস এ বীরেন্দ্র রস-কুল-পতি!" [উৎস: মধুসূদন দত্ত, "চতুর্দশপদী কবিতাবলী," *মধুসূদন রচনাবলী* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫), ১৭১।]

108 সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসপরিচ্ছেদ পাঠ করিলে, কতকগুলি প্রশ্ন স্বতঃ আমাদের মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রস কাহাকে বলিতেন? মনের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টিকে বাছিয়াই স্থায়ীভাব বলিলেন কেন? এই নয়টি ভিন্ন, আরও অনেকগুলি ভাব তো মনোমধ্যে স্থায়ী হইতে পারে। স্ত্রী-বিষয়ক অনুরাগ রস হইল; কিন্তু অনুরাগ কি স্ত্রী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি বর্ত্তিতে পারে না? না, বর্ত্তিলে স্থায়ী হইতে পারে না? আমরা তো দেখিতেছি অপত্যস্নেহ, বন্ধুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতি অনুরাগের নানা অঙ্গ এবং সকলগুলিই স্থায়ী। যদি স্ত্রী-বিষয়ক অনুরাগভিন্ন রস না হয়, তাহা হইলে স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী নীরস অথবা নীচরস বলিয়া পরিগণিত হইবে।

109 অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭১-৭৬।

110 অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, হামির: ঐতিহাসিক উপন্যাস," *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৫০৪।

৫.২.২ কৃত্রিম বীররসের ভজনার সমালোচনা

অনেকে আবার এই কৃত্রিম বীররসের ভজনাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মনে হয়েছিল এই বীররস-প্রাধান্য বাঙালির নিজস্ব জাতিসত্তা থেকে বিচ্যুত। কৃত্রিম এবং জোর করে আরোপিত। 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—

> বীর রস বাঙ্গলা সাহিত্যে যেখানে যেখানে বসিয়াছে ভালোরূপে ফুটিতে পারে নাই। তাহার কারণ, বীররস বাঙ্গালীর প্রাণের রস নহে। প্রাচীন সাহিত্যে বীররস মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াছে বটে, কিন্তু জমাইতে পারে নাই– কতকগুলা ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সড়কি সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়। ...আসল কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে বীর রস অনেক সময় কোমল রসে ভিজান অথবা একেবারেই সম্পর্কে শূন্য, বীররস আমাদের পক্ষে বিদেশীয়, অথচ আমরা স্বদেশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে চাই, সুতরাং ভয়ে ভয়ে একটা গোল বাধাইয়া বসি...[111]

'শ্রী অঃ' ছদ্মনামধারী এক লেখক *ভারতী* পত্রিকায় 'ব্যাস ও বাল্মীকির প্রাচীন কুলুঙ্গি' থেকে বীরচরিত্রদের সংগ্রহ করে 'গড়াপেটা বীররসের খেলনা' নির্মাণকে কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন[112]। তাঁর মতে 'দেশের উপর কবিতা লেখা উচিত' এই বোধোদয় বাঙালির বায়রন-পাঠের ফল। বাঙালির কোমল হৃদয়জাত সহজ স্নেহপ্রেমের উৎসারের বদলে ইংরেজ সমাজের অনুকরণে বাঙালি নারীপুরুষের মুখে আড়ম্বরময় কৃত্রিম

---

[111] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য," *ভারতী ও বালক* ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১২৮-২৯।

[112] বায়রণ পড়িয়া সহসা আমাদের চৈতন্য হইল, যে, কবি যদি হইলাম তবে দেশের উপর কবিতা লেখা উচিত। কি করা যায়; ব্যাস ও বাল্মীকির প্রাচীন কুলুঙ্গি হইতে ধূলা ঝাড়িয়া ভীম অর্জ্জুন দ্রোণ কর্ণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির নামগুলিকে বাহির করিলাম ও সেইগুলিকে লইয়া আমাদের এই গড়া-পেটা বীররসের খেলানা স্বরূপ করিয়া খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এই পুতুলবাজির জন্যই কি ব্যাস বাল্মীকি তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

তেজস্বিতাপূর্ণ সংলাপ বসানোরও প্রবল বিরোধিতা করলেন তিনি।[113] তাঁর মনে হয়েছিল, ইংরেজদের অনুকরণ করে সর্বত্র বীররস ও মাহাত্ম্যের সৌধ রচনা করতে গিয়ে মায়ামেদুর হৃদয়ের সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে হারিয়ে ফেলেছেন আধুনিক বাঙালি কবিরা। তিনি অভিযোগ করলেন, বাঙালি কবি "যাহা ইংরাজী কেতাবে দেখেন, তাহাই লেখেন।"[114] আরও বললেন—

> যখন দেখিতে পাই যে, আধুনিক একজন "মহাকবি" নরক বর্ণনা করিতে গিয়া Dante ও Virgil-এর ক্রীতদাস স্বরূপে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছেন, যখন দেখি প্রখ্যাত কবিগণ বীররসে দেশ মাতাইতে গিয়া সংজ্ঞাহীন উন্মত্ত প্রলাপে নিজে মাতিয়া উঠেন... তখন ধৃতরাষ্ট্রের মত আমাদিগকেও বলিতে হয় যে, "যখন এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম, তখন এ দেশের কবিতার জয়ের আশা আর করিনা"।[115]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *পুরুবিক্রম* নাটকে বীররসের আতিশয্য সমালোচিত হয়েছিল *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার পাতায়—

> ইহার প্রথম পত্র হইতে শেষ পত্র পর্য্যন্ত কেবল বীররস। ইহার নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেকন্দারসা হইতে উদাসিনী পর্য্যন্ত সকলেই বীররসে উন্মাদিত, ইহার সামান্য প্রহরী ও সৈনিক্যগণের মুখেও কেবল বীররসের উদ্ঘোষণ।[116]

শুধু *আর্য্যদর্শন* পত্রিকাতেই নয়, *পুরুবিক্রম*-এর বীররস যে কৃত্রিমভাবে আরোপিত, এমন অনুযোগ দেখা গেছে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সমালোচনার পাতাতেও—

---

[113] শ্রী অঃ, "দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি," *ভারতী* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ১৫৬।

[114] শ্রী অঃ, "দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি," ১৫৭।

[115] শ্রী অঃ, "দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি," ১৫২-৫৭।

[116] অজ্ঞাত, "প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: পুরুবিক্রম নাটক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৭৪, বল্মীক যন্ত্রে মুদ্রিত, গ্রন্থকারের নাম অপ্রকাশিত," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৪৪।

> গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান, এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়...। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না।[117]

উনিশ শতকের পটভূমিতে বীররসের অবতারণা স্বাভাবিক নাকি আরোপিত সে নিয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকলেও, উনিশ শতক সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে শৃঙ্গাররসের একটি বিরুদ্ধ তাত্ত্বিক বিন্দু তৈরি করতে চাইছিল— এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। এই কাজে উনিশ শতকের সহায়ক হয়ে উঠেছিল বীররস। বীররসকে বিশেষ তাৎপর্যদানই হয়ে উঠেছিল ইংরেজ-কর্তৃক পরাজিত অবমানিত জাতির আত্মকর্তৃত্ব অর্জনের এক তত্ত্বগত প্রয়াস।

৫.৩ হাস্যরস

উনিশ শতকের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে হাস্যরসকে বেশ উপেক্ষিত বলেই মনে হয়। শৃঙ্গাররস ও বীররস এবং এই দুই রসসংক্রান্ত দ্বান্দ্বিকতা বাঙালির রসতাত্ত্বিক সমালোচনার পরিসরকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল, হাস্যরসের ভূমিকা সেই ক্ষেত্রে প্রায় নগণ্য।

উনিশ শতকীয় সমালোচনায় হাস্যরসের প্রসঙ্গ অবশ্য এসেছে একাধিকবার। কখনও অন্যান্য রসের আলোচনাপ্রসঙ্গে, কখনও আবার এককভাবে। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক, অন্যান্য রসের আলোচনাপ্রসঙ্গে হাস্যরসের উল্লেখমাত্র করা হয়েছে, এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত—

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভবভূতির *উত্তররামচরিত* কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে হাস্যের নামটি উল্লেখ করেছেন মাত্র—

---

[117] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: পুরুবিক্রম নাটক, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দ ১৭২৬।" *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ২৩৯।

> কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কিনা— কোন্ অঙ্কে কোন রস প্রধান –কোথায় কোন্ ভাব,— হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,— নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারী ভাব— স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব ;— কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন্ বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।[118]

প্রায় একই কথা বলা চলে *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'অভিনয়ের উপযোগিতা' এবং 'ভারত-মঙ্গল'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গেও। এইসব ক্ষেত্রেও অনেকগুলি রসের উল্লেখের মধ্যে মিশে আছে হাস্যরস[119]। তার আলাদা কোনও তাৎপর্য বা গুরুত্ব সেখানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

কখনও কখনও হাস্যকে উপস্থাপিত করা হয়েছে করুণের বিপরীত রস হিসেবে, বা করুণরসের সঙ্গেই হাস্যরসের প্রসঙ্গ এসেছে। *সাহিত্য* পত্রিকায় চার্লস ডিকেন্স সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

> যখন তিনি [ডিকেন্স] পাঠককে হাসাতে চাইতেন, তখন তিনি রচনায় যথাসম্ভব হাস্যরসের প্রয়োগ করিতেন; আবার যখন তিনি পাঠককে কাঁদাইতে চাহিতেন, তখন তিনি হাস্যরস ছাড়িয়া কেবল করুণরসের ব্যবহার করিতেন। তিনি হাস্যরস ও করুণরস স্বতন্ত্র রাখিতেন,

---

[118] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১০৮ - ১০৯।

[119] * করুণ, বীর, হাস্য বা যে কোন রসের চিত্র হউক না কেন... যদি অভিনেতা আপনার সত্তা ভুলিয়া, অভিনীত চরিত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে তচ্চরিত্রময় করিতে সমর্থ হন... [তবে নিশ্চয়ই তিনি দর্শকের মন আকর্ষণ করতে, নাটকের মধ্যমে লোক শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন।] [উৎস: বাণীনাথ নন্দী, "অভিনয়ের উপযোগিতা," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ২৫৮।]
** কিন্তু এখানে একটী কথা বলিতে হইতেছে – মহাকাব্যে বীররস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি যাবতীয় রসেরই সমাবেশ আবশ্যক। ১ম খণ্ড ভারত-মঙ্গলে ইহার কোন কোনটীর অভাব আমরা বড়ই অনুভব করিয়াছি। [উৎস: অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: ভারত-মঙ্গল," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৩১৪।]

> কখনও মিশাইয়া ফেলিতেন না; তাই তাঁহার হাস্য কেবলই হাস্য, তাঁহার বেদনা কেবলই বেদনা।[120]

আবার এই পত্রিকাতেই রসিকচন্দ্র রায় রচিত নবরসের বর্ণনা-সমন্বিত ‘নবরসাঙ্কুর’ বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বললেন—

> এমন কি- রসিকবাবু যে হাস্যরসের উদাহরণটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুণরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে।[121]

এখানে স্পষ্টতই উঠে এসেছে এমন এক বাইনারি যেখানে হাস্যরসের অবস্থান করুণের ঠিক বিপরীত বিন্দুতে। আবার সব সময়ে যে তারা বিপরীত স্থানাঙ্কে থেকেছে, তা নয়। এই দুই রসের সহাবস্থানের দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়—

> যে সকল অবস্থা বিশেষে নায়ক নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে, রসবিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি।... সংস্থানই রসের আকর।... অনেক স্থানে [লেখক] করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন।[122]

এখানে হাস্য এবং করুণ রসের মাঝখানে ‘ও’- এই সংযোজক অব্যয়ের প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী এ দুই রসের মধ্যে সংযোগসূত্র খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাও একেবারে বিরল ছিল না। এবার দেখা যাক, হাস্যরসের প্রসঙ্গ কীভাবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে উনিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য-সমালোচনায়—

---

[120] অজ্ঞাত “সহযোগী সাহিত্য,” *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ৩৮০।

[121] অজ্ঞাত, “প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: নবরসাঙ্কুর, অর্থাৎ আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। শ্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত,” *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৯।

[122] অজ্ঞাত, “চন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের সমালোচনা, উপন্যাস। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা স্কুলবুক প্রেস,” *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৯৯।

আলোচিত গ্রন্থের নাম	হাস্যরস সম্পর্কিত মন্তব্য	পত্রিকা	বর্ষ ও মাস
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত *একঘরে*	বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্য রস আছে। (পৃ. ২৯৮)	*ভারতী*	১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ১৪শ বর্ষ, ভাদ্র
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের *কঙ্কাবতী*	চার্লস ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকদের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত। (পৃ. ৩৫৯)	*সাধনা*	১২৯৯ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় বর্ষ (প্রথম খণ্ড) ফাল্গুন
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কল্পতরু*	দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি (ইন্দ্রনাথ) উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত “বেলেল্লা গিরিতে” প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। (পৃ. ৪১৭)	*বঙ্গদর্শন*	১২৮১ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় বর্ষ, পৌষ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: *কিঞ্চিৎ জলযোগ*	হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে।... (কিঞ্চিৎ জলযোগ) ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। (পৃ. ৬৫০)	*বঙ্গদর্শন*	১২৭৯ বঙ্গাব্দ, প্রথম বর্ষ, চৈত্র
রামায়ণ-এর সমালোচনা (শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজাত শ্রীমন্মহামর্কট-প্রণীত ব্যঙ্গরচনা)	বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেণ। (পৃ. ৪৭২)	*বঙ্গদর্শন*	১২৭৯ বঙ্গাব্দ, প্রথম বর্ষ, পৌষ
প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: মরকত-রঙ্গভূমিতে অভিনীত শৈলজা-প্রণেতা-প্রণীত *অনুপমা*	হাস্যরসের অবতারণা থাকায় বইটি পড়িতে পড়িতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়।(পৃ. ৬৭১)	*নব্যভারত*	১২৯৯ বঙ্গাব্দ, দশম বর্ষ, চৈত্র

এভাবে উনিশ শতকে হাস্যরসের প্রসঙ্গ প্রায়শই উঠে এল গ্রন্থ-সমালোচনার ব্যাপ্ত পরিসরে। কেবল সমালোচনা নয়, সমালোচনার সমালোচনাতেও কখনও কখনও এসেছে হাস্যরস প্রসঙ্গ। যেমন, ‘মহারাষ্ট্র সাহিত্য’ প্রবন্ধে ইংরাজি-সাহিত্য প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য

সমালোচনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘হাস্যরসাত্মক কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ দেওয়াকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে[123]। বাঙালির শেকসপিয়ার আলোচনাতেও হাস্যরসের উল্লেখ পাওয়া যায়—

- হাস্যরসে সেকস্‌পীয়রের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, এ কথা স্বীকার করিতে হয়। যখন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি হাস্যরসের পূর্ণ অবতার।... রেসিনও হাস্যরসে অনভিজ্ঞ নহেন। তিনিও স্থানে স্থানে ইহা তীব্রভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু হাস্যরসের পূর্ণবিকাশে সেক্‌সপীয়ার তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[124]
- শেক্ষপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য্য জিনিস।[125]

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি দেখে বোঝা যায়, হাস্যরস কোনও তাত্ত্বিক গভীরতাসহ আলোচিত হয়নি। হাস্যরস নিয়ে উনিশ শতকে নির্মিত হয়নি কোনও তর্ক বা তত্ত্বনির্মাণের প্রেক্ষিত।

তবে দুটি একটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘কৌতুকহাস্য’ এবং ‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’ এই দুটি প্রবন্ধে হাস্যরসের তত্ত্বায়নের চেষ্টা দেখা যায়। দুটি প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *সাধনা* পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-০২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তা *পঞ্চভূত* গ্রন্থের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ‘কৌতুকহাস্যের মাত্রা’ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—

> যেমন দুঃখের কান্না, তেমনি সুখের হাসি আছে– কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে ক’টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই

---

123 সখারাম গণেশ দেউস্কর, “মহারাষ্ট্র সাহিত্য,” *সাহিত্য* ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৪৭।

124 অজ্ঞাত, “সেকস্‌পীয়র ও রেসিন,” *সাহিত্য* ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৬৯৮।

125 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “কালিদাস ও শেক্ষপীয়র,” *বঙ্গদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৩৬।

> জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে, কেবল হাস্যরসটা নাই।[126]

এই হাস্যের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ জুড়েই। আমরা হাসি কেন, এর উত্তরে বলা হয়েছে—

> কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি।...আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।[127]

'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধে যে 'নিয়মভঙ্গজনিত পীড়া'কে দুঃখ বা করুণরসের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই একই পীড়াকে হাস্যের কারণ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। হাস্য এবং করুণরসের এই আন্তঃসম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধেও—

> সমস্ত প্রকৃতিময় হাস্যরস ও করুণরস অবাধে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত হইতেছে— যখন দেখি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনসূত্রেই হাস্য ও রোদন ঘোর ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তখন একটি রস যে কবিতার সীমাগত আর অন্যটি যে নয়, তাহা কি নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে?[128]

---

[126] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা," *সাধনা* ৪র্থ বর্ষ, ১ম ভাগ (১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৩৬৮।

[127] ঠাকুর, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা," ৩৬৯।

[128] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২৭।

পাঞ্চভৌতিক সভার ব্যাখ্যা অনুসারে হাস্য হল 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'[129]। অন্যদিকে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে হাস্যের কারণ হিসেবে আরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হল 'অসঙ্গতি'কে—

> ...ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্যই পাঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন, যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র।... অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়।[130]

প্রবন্ধের একেবারে শেষদিকে হাস্যের সঙ্গে কেবল করুণ নয়, বিস্ময় তথা অদ্ভুতেরও সংযোগস্থাপন করা হয়। অসংগতির মাত্রাভেদে বিস্ময়ই হাস্যে এবং হাস্য করুণে পরিণত হয়, এমন মত প্রকাশ করা হয়েছিল—

> স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।[131]

তবে, এই একটি-দুটি প্রবন্ধের উদাহরণ ব্যতিক্রমী। এগুলি প্রকৃতপক্ষে নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা করে। উনিশ শতকে হাস্যরসের তাত্ত্বিক দিকগুলি মোটের ওপর খুব বেশি আলোচিত

---

[129] আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ।... কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়...। কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ... কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি। [উৎস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কৌতুকহাস্য," *সাধনা* ৪র্থ বর্ষ, ১ম ভাগ (১৩০১ বঙ্গাব্দ): ১৩২-৩৬।]

[130] ঠাকুর, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা," ৩৭২।

[131] ঠাকুর, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা," ৩৭৪।

হয়নি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্বর্ণকুমারী দেবীর *কাহাকে* উপন্যাসের আলোচনায় বলেছিলেন—

> দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই উপন্যাসের [কাহাকে] রসগ্রহে নিতান্ত অক্ষম। ...এই উদ্ভট রঙ্গভূমির পাত্রগণের চরিত্র, কথোপকথন, ভাব সব যেন অদ্ভুত ও নিতান্ত বিদেশি বলিয়া বোধ হয়। সমাজের এক অংশে যে এতখানি জ্যেষ্ঠতাতত্ব ও হাস্যরস সঞ্চিত হইয়াছে,— তাহা কেমন বেখাপ ও বাঙ্গালী জীবনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।[132]

হাস্যরসাত্মক রচনা যে কখনোই কবিতার মর্যাদা পেতে পারে না, এমন মত ব্যক্ত করা হয়েছিল প্রথম বর্ষের *ভারতী*-তে প্রকাশিত ‘বঙ্গসাহিত্য’ প্রবন্ধে—

> হাস্যরসাত্মক বস্তুগত বিষয় ছন্দে প্রকাশ করিলে তাহা লিপি চাতুর্যের জন্য কৌশলের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে আমরা কবিতা বলিতে পারি না।
>
> কিন্তু হাস্যরসটি উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা কিছু সুকঠিন। হাস্য-রসটি তন্ন তন্ন পুর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, অবস্থা-বিশেষে ইহাতে কোমলতা বা কদর্য্যতার প্রাধান্য থাকে। ...গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, হাস্যরস কবিতার সীমাগত নহে... প্রকৃত কবিতার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।[133]

হাস্যরস যে কোনও গভীর বা গম্ভীর ভাবের বাহক হতে পারে না, এমন মনোভাবও প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধকারের মতে, মহাকাব্যে ও অন্যান্য ‘দেব-প্রকৃতি’ উদ্দীপক সাহিত্য-সংরূপে হাস্যরসের প্রয়োগ অনুচিত—

> হাস্যরসটি সকল প্রকার গম্ভীর রসের বিঘ্নকারী। পাঠকের হৃদয় রৌদ্ররসেই উত্তেজিত হউক, আর ভয়ানক রসেই আলোড়িত হউক,

[132] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, “মাসিক সাহিত্য সমালোচনা,” *সাহিত্য* ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ১৩৬-৩৭।

[133] চ—, “বঙ্গসাহিত্য,” *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২৬ -২৯।

> করুণরসেই দ্রবীভূত হউক বা ভক্তিরসেই পুলকিত হউক, হাস্যরসের প্রকৃত অবতারণাতে হৃদয় এতদূর শিথিল হইয়া পড়ে যে, ঐ সকল গভীর রসের উদ্দীপনশক্তি একেবারে ব্যর্থ হয় এবং মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। শুদ্ধ মহাকাব্য কেন,— কি নাটক, কি খণ্ডকাব্য, কি গীতিকাব্য, যে কোন রচনা দ্বারা কবি পাঠক-হৃদয়ের দেব-প্রকৃতি উত্তেজিত করিতে চাহেন, সেই রচনাতেই হাস্যরসের বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।... এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবিরা হাস্যরসটিকে যে, কবিতার অযোগ্য বলে মনে করিতেন তাহা নয়, কিন্তু পাছে রচনাবিশেষের মুখ্য উদ্দেশ্যের হানি হয়, এই হেতু তাঁহারা সেই সেই রচনাতে হাস্যরসের পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিতেন না।[134]

এই উদাহরণগুলিই বুঝিয়ে দেয় হাস্যরস উনিশ শতকীয় বাঙালি মানসে তেমন মর্যাদার আসন পায়নি। আর এই উপেক্ষার কারণ হয়তো নিহিত ছিল— প্রথমত, তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির গভীরে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় রসতত্ত্বের নিবিড় পাঠেও হাস্যের প্রতি উপেক্ষার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ হাস্যকে 'শৃঙ্গারের অনুকরণ'[135] বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনও কোনও আলংকারিকের মত অনুসারে, হাস্য একটি গৌণ রস যার উৎপত্তি মূল রস শৃঙ্গার থেকে[136]। শৃঙ্গারের সঙ্গে লগ্নতা আছে যে রসের, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে সেই রসের আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা কমই

---

[134] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," ভারতী ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২৬ -২৭।

[135] শৃঙ্গারানুকৃতির্ষা তু স হাস্য ইতি সংজ্ঞিতঃ। (শৃংগারের যে অনুকরণ তা হাস্য নামে অভিহিত।) [উৎস: বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, ১৩৯।]

[136] শারদাতনয় নারদের মত উদ্ধৃত করিয়া চারিটি প্রধান রসের উৎপত্তি ও প্রধান রসচতুষ্টয় হইতে অপ্রধান রস রসচতুষ্টয়ের আবির্ভাবের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ... ব্রহ্মা দেবগণের সাহায্যে 'ত্রিপুরাহ' নামক একখানি ডিম (নাট্যরচনাবিশেষ) রচনাপূর্ব্বক নিজ সভামধ্যে নটগণের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। তখন তাহা দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে কৈশিকী-সাত্ত্বতী-আরভটী-ভারতী বৃত্তিসহ শৃঙ্গার-বীর-রৌদ্র-বীভৎস রসচতুষ্টয় নিঃসৃত হইয়াছিল। ... যখন জটাজিনধারী, ফণিভূষণ, অগ্নিনয়ন, ভস্মাঙ্গরাগকারী শিব দেবী পার্ব্বতীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন, তখন তদ্দর্শনে শিব দেবী পার্ব্বতীর প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন, তখন তদ্দর্শনে দেবীর ও তাঁহার সখীগণের হাস্যোদ্রেক হয়। এই কারণে বলা হয়— শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উৎপত্তি। [উৎস: শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৮-২০।]

ছিল। ব্রিটিশ শাসক আরোপিত ভীরুতা-কাপুরুষতার অপবাদ মুছতে শৃঙ্গারকে অতিক্রম করে বাংলায় তখন চলছে বীররসের বন্দনা। এই সমাজপ্রেক্ষিতে শৃঙ্গারের আনুষঙ্গিক রস হিসেবে হাস্যের উপেক্ষিত হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যেও নিহিত ছিল হাস্যের প্রতি অবজ্ঞার বীজ। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ হাস্যের কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে "বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী"কে[137]। বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুসারে হাস্যরস ছয় প্রকার। স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত, অতিহসিত[138]। এর মধ্যে "অপহসিত ও অতিহসিত অধম পাত্রের যোগ্য।"[139] রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রকৃত *নাট্যদর্পণ*-এ বলা হয়েছে, "এই হাস্যরস প্রায় পামর প্রকৃতিক ও অধম প্রকৃতিক পাত্রেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।" 'অধম প্রকৃতি' বলিতে *নাট্যদর্পণ*-কার বুঝিয়েছেন 'স্ত্রী-প্রকৃতি' কারণ তাঁদের মতে "স্ত্রীগণ পুরুষাপেক্ষা অধম-প্রকৃতিক।"[140] ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-তে হাস্যরস সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে– "স্ত্রীনীচপ্রকৃতাবেষ ভূয়িষ্ঠং দৃশ্যতে রসঃ" অর্থাৎ "এইরূপ রস স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতি লোকের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়"[141] গোটা উনিশ শতক জুড়ে যেখানে বাঙালির মধ্যে চলেছে পৌরুষ-অর্জনের প্রবল প্রয়াস, সেখানে "স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতি লোকের মধ্যে" দৃষ্ট রস তো কিছুটা তাচ্ছিল্য পাবেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকে অবজ্ঞার আড়ালে চলে যাচ্ছিল হাস্যরস।

---

[137] বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, ১৪৩।

[138] উত্তম ব্যক্তিদিগের (হাসি হইতেছে) – 'স্মিত' ও 'হসিত'; মধ্যমগণের 'বিহসিত' এবং 'অবহসিত', নীচগণের 'অপহসিত' এবং 'অতিহসিত'। [উৎস: বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১৬৪।]

[139] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১২৫-২৬।

[140] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৩৩।

[141] বন্দ্যোপাধ্যায়,*নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, ১৪৩।

৫.৪ করুণরস

ভরত-প্রদত্ত অষ্টরসের বিবৃতিতে করুণকে রাখা রাখা হয়েছিল তৃতীয় স্থানে। শৃঙ্গার এবং হাস্যের পরে তার অবস্থান। আটটি রসকে যে ভরত তাদের গুরুত্বের ক্রমানুসারেই সাজিয়ে লিখেছিলেন, এমন প্রমাণের হদিশ অবশ্য পাওয়া যায় না সমগ্র *নাট্যশাস্ত্র*-এর কোথাও। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে রসের সংখ্যা নিয়ে যেমন মতভেদ ছিল, তেমনি আটটি বা নটি বা বারোটি রসের মধ্যে কোন রসটি পাবে প্রাধান্যের আসন, সে নিয়েও ছিল নানা মুনির নানা মত। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ঝুঁকে ছিল শৃঙ্গারের দিকেই। যে কারণে কাব্যতত্ত্বের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই শৃঙ্গারই আদিরস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু সব আলংকারিকই যে শৃঙ্গারের অবিসংবাদিত প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এমনটা নয়। বিস্ময় স্থায়িভাবজাত অদ্ভুতরসই যে একমাত্র রস, এমন মত ব্যক্ত করেছিলেন আচার্য নারায়ণ। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় ভবভূতির কথা। *উত্তররামচরিত*-এ তিনি বলেছেন, “একইমাত্র রস, উহা— করুণ’। অন্য রসগুলি তার রূপভেদ (বিবর্ত্ত) মাত্র”[142]।

এখন, ভবভূতি মহান্ কাব্যস্রষ্টা হলেও তিনি কিন্তু আলংকারিক বা কাব্যতাত্ত্বিক ছিলেন না। ফলে তাঁর এই অভিমত যুক্তির যথাযথ পারম্পর্যের বদলে কাব্যিক আবেগের আতিশয্য দ্বারাই আক্রান্ত। তবে, উনিশ শতকের কোনও কোনও বাঙালি সমালোচক, তাঁদের অন্তর্লীন কাব্যিক স্বভাবের বশেই হয়তো বা, করুণরসকে যেভাবে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন, তাতে ভরত বা ভোজ বা বিশ্বনাথ বা নারায়ণের চেয়ে ভবভূতির সঙ্গেই

[142] একো রস করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।

তাঁদের মনোভূমিগত সাদৃশ্য প্রকট হয়ে ওঠে। আদি কবি বাল্মীকির মুখনিঃসৃত প্রথম শ্লোকটিই যে শোকস্থায়িভাব-প্রসূত ছিল, সে কথা কেউ কেউ আবার পাঠকসাধারণকে মনে করিয়ে দিয়েছেন—

> তবু বলি, কান্না ভাল, বুকের অনেক উত্তাপ, অনেক ময়লা, অনেক কালি ইহাতে ধুইয়া যায়। করুণতা জগতের প্রাণ, করুণ রস কবিরও সর্বস্ব। তাই না সেই আদি কবি মহাকবির মুখনিঃসৃত করুণরসপূর্ণ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইতি শীর্ষক সেই আদি শ্লোক?[143]

ওথেলো-র আলোচনা প্রসঙ্গে *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'যাত্রা' প্রবন্ধের লেখক বলেছেন—

> রস মধ্যে করুণ রসের তীব্রতাই অধিক। সুতরাং করুণ রসে যাদৃশ মনুষ্য চিত্তকে আলোড়িত করা যায়, কেবল আদিরসে তাহা হয় না। এই জন্য জনসাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করুণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন।[144]

মধুসূদন দত্ত করুণরসকে তাঁর সনেটে 'রস-কুলে রাণী'[145] বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রায় একইভাবে, 'নৈষধ সমালোচন' প্রবন্ধের লেখক করুণরসের মহিমা ব্যক্ত করে বলেছেন করুণরস "আর্য্যগণের হৃদয়কন্দরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়" এবং "আর্য্যকবির জনবিমোহনকারিণী ঐন্দ্রজালবিদ্যা" বলে করুণকে অভিহিত করা হয়েছে[146]।

---

[143] হারাণচন্দ্র রক্ষিত, "সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব," *নব্যভারত* ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ): ৬৭।

[144] অজ্ঞাত, "যাত্রা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৫৯।

[145] "করুণা বামার নাম—রস কুলে রাণী;" [উৎস: মধুসূদন দত্ত, "চতুর্দশপদী কবিতাবলী," *মধুসূদন রচনাবলী* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫), ১৭০।]

[146] অজ্ঞাত, "নৈষধ সমালোচন," *বঙ্গদর্শন* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৪৪।

৫.৪.১ উনিশ শতকে করুণরস-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা

রস-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসর উনিশ শতকে খুব বেশি তৈরি হয়নি। তবে করুণরস নিয়েও সীমিত সংখ্যক তাত্ত্বিক প্রশ্ন বা অবস্থান উঠে এসেছিল। *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত, পরে *পঞ্চভূত* গ্রন্থভুক্ত 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বহু-আলোচিত। এখানে 'অসংগতি'র সূত্র ধরে হাস্য এবং করুণ রসের মধ্যে এক সম্পর্কসূত্র খোঁজার চেষ্টা আছে—

> জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই।... অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।[147]

রসিকচন্দ্র রায় 'আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন'-এর উদ্দেশ্যে 'নবরসাঙ্কুর' নামে যে বইটি রচনা করেন,[148] *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় তার নির্মম সমালোচনা করে বলা হয়—

> ... বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, "বালকবর্গের রসানুভব জন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।" আমরা জিজ্ঞাসা করি নবরসের আলঙ্কারিক ভেদ জ্ঞান কি বালকের বোধ্য? এমন কি-রসিকবাবু যে হাস্যরসের উদাহরণটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুণরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে, অথচ আমরা নিতান্ত বালক নহি, সুতরাং এই নবরস যে বালকে রসিক বাবুর মত বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না।[149]

---

[147] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কৌতুকহাস্যের মাত্রা," 'পঞ্চভূত,' রবীন্দ্র-রচনাবলী: প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ৯৩৬-৩৮। [পত্রিকাপাঠ: *সাধনা* ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ)]

[148] কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

[149] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৮৯।

বলা বাহুল্য, এখানে হাস্যরসের সূত্র ধরেই এসেছে করুণরসের কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে, হাস্যে অসংগতির মাত্রা চড়াতে থাকলে তা করুণে পরিণত হয়। আবার, এ কথাও বলা চলে তীব্রতম শোকও যথাযথ সাহিত্যিক আধার লাভ না করলে তা হাস্যের চেহারা নিতে পারে। করুণরস হয়ে-ওঠার ব্যর্থতা ও হাস্যের এই সম্পর্কসূত্র *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে পাওয়া যায়—

> কেহ যে কোন অবস্থায় পড়িয়া কাঁদিলেই যে তাহা শুনিয়া কোন শ্রোতার মনে করুণ রসের আবির্ভাব হইবেই এমন কোন নিশ্চয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে অনেকে আপনার শোকপ্রকাশ করিতে গিয়া এমন সব বাক্য প্রয়োগ করে যে তাহাতে চোখে জল না আসিয়া মুখে হাসি আসে।[150]

'নবরসাঙ্কুর'-এর সমালোচক অবশ্য এই গূঢ় তাত্ত্বিক বিচারের পরিসরে প্রবেশ করেননি। রসিকচন্দ্র-প্রদত্ত হাস্যরসের দৃষ্টান্তগুলি যে যথাযথ নয়, সেটুকু বোঝানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

তবে রস-সংক্রান্ত তত্ত্বের একটি ছাত্রপাঠ্য বই উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল— এই তথ্যটি উনিশ শতকে রসবাদের প্রতি বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝে নেওয়ার জন্য জরুরি। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বা অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক ছাত্রদের কাছে তুলে ধরার জন্য লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়* বা জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্য-দর্পণ* হয়তো লেখা হয়েছিল, কিন্তু আলাদাভাবে কেবল রসবাদের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে একটি ছাত্রপাঠ্য বইয়ের প্রকাশ— এই ঘটনা উনিশ শতকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিরল।

উনিশ শতকে করুণরস সম্পর্কে আরেক ধরনের তত্ত্বগত ভাবনার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছিল *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনা। *ভারতী*-তে ধারাবাহিকভাবে

---

[150] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২৪।

প্রকাশিত ‘বঙ্গসাহিত্য’ প্রবন্ধটি ছিল রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত *বঙ্গসাহিত্য* গ্রন্থের সমালোচনা। এই প্রবন্ধে কবিতা কাকে বলে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন—

> যে ছন্দোময়ী রচনা পাঠ করিলে মনে কোন একটি বিশেষ প্রতিমা বিভাসিত হয়, বা কতকগুলি ভাব-পরম্পরার উদ্রেক হয় এবং সেই প্রতিমা বা ভাবপরম্পরার আবির্ভাবে হৃদয়ের কোমলতর রসগুলি উত্তেজিত হয়, সেই রচনাকেই কবিতা বলে।[151]

এখন, অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী রস ‘উত্তেজিত হয়’ না, অভিব্যক্ত হয়। আর পাঠকের হৃদয়ে যে অনুভব স্থায়ী আকারে থাকে তা হল স্থায়িভাব। কাব্যনাটকের বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীর সংযোগে তা রসপরিণতি লাভ করে। ‘বঙ্গসাহিত্য’-এর সমালোচক যেভাবে ‘হৃদয়ের কোমলতর রস’-এর কথা বলেছেন, তা অভিব্যক্তিবাদের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে অনেকখানিই দূরে সরে গেছে। কোন রসগুলিকে ‘কোমলতর রস’ বলা যায় সেই প্রসঙ্গে তিনি ‘করুণরস’-কে ‘কোমলতর রস’-এর অন্তর্গত বলে ঘোষণা করেছেন—

> ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে, সমগ্র রসগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি কোমল আর কতকগুলি উগ্র বা কদর্য্য। করুণ বা শান্তি বা ভক্তি বা প্রেম– এ সকলই কোমল– আর বীভৎস বা রৌদ্র বা ভয়ানক ইত্যাদি ইত্যাদি সকল রসই কদর্য্য বা উগ্র– সুতরাং, ইংরাজি Finer Sensibilities অর্থাৎ কোমলতর রসগুলি বলিতে উপরি উক্ত দুই বিভাগের একটিমাত্র বুঝায়।... তিনি [রমেশচন্দ্র] আপনিই বলিয়াছেন যে, করুণ ভক্তি প্রেম ইত্যাদি রসই কোমলতর রসের অন্তর্গত।[152]

---

[151] চ—, “বঙ্গসাহিত্য,” ২৪।

[152] চ—, “বঙ্গসাহিত্য,” ২৫।

কেন কবিতায় 'কোমলতর রস'ই কেবল প্রাধান্য পাবে সেই নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন তিনি, তবে তা অন্য প্রসঙ্গ।

৫.৪.২ সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে করুণরস— বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য-সমালোচনা, বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে একাধিকবার এসেছে করুণরসের উল্লেখ। তবে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাতেও রস-সংক্রান্ত আলোচনা যে একেবারে ব্রাত্য ছিল, এমন নয়। ফলে করুণরসের কথাও সে-সব স্থানে উপেক্ষিত থাকেনি।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনায় করুণরসপ্রসঙ্গকে ছুঁয়ে দেখা যাক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনায় রসবাদ-প্রসঙ্গ অত্যন্ত বিরল। তবে, এ বাবদে অন্যান্য রসের থেকে করুণ রস ব্যতিক্রমী। কারণ, পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির সূত্র ধরেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-পরিসরে প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছে করুণরস, সংজ্ঞা ও প্রয়োগে একান্তভাবে প্রাচ্য হওয়া সত্ত্বেও। *ওথেলো*-তে করুণরসের তীব্রতার আলোচনা স্থান পেয়েছিল *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায়। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক করুণরসের গুণকীর্তন করতেও ভোলেননি[153]। আবার *বঙ্গদর্শন*-এর পাতাতেই দেখা যায় 'হ্যামলেটের করুণ রস'[154] লেখকদের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

পূর্ণচন্দ্র বসুও *সাহিত্য-চিন্তা* গ্রন্থের 'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধে 'ট্র্যাজেডির করুণ রস' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে তেরো বছর আগে *আর্য্যদর্শন*-এ তিনি যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করেছেন। এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে 'ইউরোপীয় বিয়োগান্ত

---

[153] পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

[154] Hamlet এর এই করুণ রসের পর এক্ষণে একটু বীররস হউক। [উৎস: অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *বঙ্গদর্শন* ৯ম বর্ষ (ফাল্গুন ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ৩৬০।]

রীতি' অর্থাৎ ট্র্যাজেডির তুলনা করা হয়েছে। করুণরসকেই ট্র্যাজেডির 'প্রধান গুণ' বলে উল্লেখ করে তার সঙ্গে সংস্কৃত করুণরসযুক্ত নাটকের তুলনা করেছেন লেখক—

> প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত * রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ, তাহা আর্য্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ তাহা আর্য্যসাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়।[155]

এই বইয়েরই অন্যত্র ট্র্যাজেডিতে করুণরসের উল্লেখের সঙ্গে এ কথাও বলা হল, ট্র্যাজেডির পরিণামে খুন করুণরসের পরিবর্তে বীভৎস রসের সঞ্চার করে—

> সাহিত্যে রসের ক্ষেত্র। ট্র্যাজিডির উচ্চতা ভয়ানক এবং করুণ রসে। কিন্তু ট্র্যাজিডির পরিণামে খুন ঘটাতে বীভৎস রসের ঘোর সঞ্চারে কি ভয়ানক, কি করুণ, উভয়কে মন্দীভূত করে। স্বচক্ষে খুন দেখিলে, কি খুনের নাম শুনিলে, কি স্মৃতিপথে খুনের উদয় হইলেই, অমনি বীভৎসের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, এবং হৃদয় কম্পিত হয়।[156]

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় করুণরসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় কৃত্তিবাসী *রামায়ণ*-এর কথা। বীরেশ্বর গোস্বামী *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি কৃত্তিবাস' প্রবন্ধে করুণ রস বর্ণনায় কৃত্তিবাসের নৈপুণ্য এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী ও কৃত্তিবাসের করুণরস প্রয়োগের পার্থক্যের দিকটি তুলে ধরলেন—

> রামায়ণ করুণরস প্রধান, এমনকি শোক হইতে শ্লোকের উৎপত্তি ইহা অমর কবিগুরু বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় কৃত্তিবাসও সর্ব্বাপেক্ষা করুণরস বর্ণনায় পারদর্শী। সীতাহরণ ও রামের বিলাপ বর্ণনায়, অন্ধমুনির পুত্রশোক কাহিনীতে কৃত্তিবাস সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রকেই কাঁদাইয়াছেন। রামায়ণ করুণ

---

155 আর্য্যসাহিত্য খুনহীন হইয়াও বিয়োগান্ত-রসে পূর্ণ। [উৎস: পূর্ণচন্দ্র বসু, "সাহিত্যে খুন," *সাহিত্য-চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ৩৯-৪০।]

156 পূর্ণচন্দ্র বসু, *সাহিত্য-চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ২২।

> রসপ্রধান...কেবল করুণরসেই নহে, অন্য রস বর্ণনেও কবি পারদর্শী। ...কবিকঙ্কণ এরূপ রসবর্ণনে বড় একটা পারদর্শী নহেন– করুণ রস বর্ণনেই তিনি অদ্বিতীয়।[157]

আবার, যোগীন্দ্রনাথ বসু *নব্যভারত* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর যে সমালোচনা করেছেন, সেখানে একাধিকবার এসেছে করুণরসপ্রসঙ্গ। *মেঘনাদবধ কাব্য*-কে করুণরসের কাব্য হিসেবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ। 'মেঘনাদ-বধ-চিত্র' প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি বললেন—

> অনেকে মেঘনাদ-বধকে বীররস প্রধান কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীররস অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য। বর্ণনীয় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস নির্ণয় করিতে হয়, তবে মেঘনাদ-বধকে করুণ-রস-প্রধান কাব্য বলিয়া নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। ...অধিকাংশ পাঠক মধুসূদনকে বীররস বর্ণনাতেই নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন, কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মূর্তিমতী বিরহব্যথা রূপিনী জানকীর এবং শ্মশানশয্যায় স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা নববিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিলে কে বলিবেন যে, মধুসূদন কেবল বীররসেরই কবি?[158]

একইরকমভাবে 'মেঘনাদ-বধ-চিত্র'-এর পঞ্চম প্রস্তাবেও তিনি বলেছেন, "মেঘনাদবধকে বীররসাত্মক কাব্য অপেক্ষা করুণরসাত্মক কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।"[159] *মেঘনাদবধ কাব্য*-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে

---

[157] বীরেশ্বর গোস্বামী, "কবি কৃত্তিবাস," *ভারতী* ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৭৪৪।

[158] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র: চতুর্থ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৪৩৩।

[159] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র: পঞ্চম প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৮১।

হয়...”[160] মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর আলোচনাসূত্রেও এসেছে করুণরসপ্রসঙ্গ—

> বিভিন্ন রসোদ্রেকে কবির নিপুণতার দৃষ্টান্ত “বীরাঙ্গনা”য় অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, যদিও কাব্যখানি প্রধানতঃ আদিরসঘটিত, তথাপি শকুন্তলা, রুক্মিণী ও দ্রৌপদীর পত্রে আদিরসের, গঙ্গার পত্রে শান্তরসের, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আদিমিশ্রিত রৌদ্ররসের, কৈকেয়ী ও জনার পত্র ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণরসের বেশ স্ফূর্তি পাইয়াছে।[161]

গিরীশ ঘোষ রচিত *সীতার বনবাস* নাটকের সমালোচনায় একে ‘কারুণ্য রস পরিপূর্ণ দৃশ্য কাব্য’[162] বলেছেন পাঁচকড়ি ঘোষ। *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর মতোই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বৃত্রসংহার* কাব্য প্রসঙ্গেও *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার পাতায় দেখা গেছে করুণরসের উল্লেখ—

> ঋষি [দধীচি] ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ঋষির প্রাণভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন- কি প্রকারে তাহা বলিবেন?...এর পর যাহা রচিত হইয়াছে, ততসদৃশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ মহাচিত্র বাঙ্গালাসাহিত্যে দুর্লভ।... দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণরসে।[163]

তেমনি আবার *কাব্য-চিন্তা* গ্রন্থে পূর্ণচন্দ্র বসু ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ করুণরস বর্ণনার নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন—

> আমরা পূর্ব্বে বিদ্যার যে আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্র করুণরসও কেমন উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন

---

[160] বসু, “মেঘনাদ-বধ-চিত্র: পঞ্চম প্রস্তাব,” ৮৩।

[161] বীরেশ্বর গোস্বামী, “বীরাঙ্গনা কাব্য,” *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ১৫২।

[162] পাঁচকড়ি ঘোষ, “সীতার বনবাস,” *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৪৯৮।

[163]

- অজ্ঞাত, “বাঙ্গালা সাহিত্য: বৃত্রসংহার” *বঙ্গদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ৪৫১।
- অজ্ঞাত, “বৃত্রসংহার,” *বঙ্গদর্শন* ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ৫২৪।

> করিতে পারিতেন।... ভারতচন্দ্রের আদিরসগর্ভ কোন্ পংক্তিচয় তাহার সহিত তুল্যমূল্য হইতে পারিবে?[164]

মনে রাখা দরকার, কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* থেকে *বীরাঙ্গনা কাব্য, সীতার বনবাস* থেকে *বৃত্রসংহার*— এ সব রচনা বাংলা ভাষায় লেখা হলেও এদের মূল কাহিনি কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য বা পুরাণ থেকে নেওয়া। সংস্কৃত অনুসারী নয়, এরকম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে করুণরসের প্রসঙ্গ সচরাচর দেখা যায় না। *নব্যভারত* পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষে আনন্দচন্দ্র মিত্র রচিত *ভারত-মঙ্গল* কাব্যের সমালোচনায় বলা হয়েছিল, "মহাকাব্যে বীররস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি যাবতীয় রসেরই সমাবেশ আবশ্যক।"[165] *ভারত-মঙ্গল* ছিল রামমোহন রায়কে নায়ক করে মহাকাব্যের ধরনে লেখা একটি কাব্য। সংস্কৃত-অনুসারী না হলেও এর রচনাপ্রণালী সংস্কৃত সাহিত্যের আঙ্গিক অনুসরণ করেছে বলে সেখানে করুণরসপ্রসঙ্গ আসা অস্বাভাবিক নয়।

তবে ওই একই বর্ষের *নব্যভারত*-এ 'শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত' *প্রতিধ্বনি* নামক কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে "করুণরসাত্মক গীতি-কাব্য"কে 'বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোভূষণ'[166] বলা হয়েছে। *সাধনা* পত্রিকায় *রাজসিংহ*-এর সমালোচনায় চঞ্চলকুমারীর প্রেম প্রসঙ্গে বলা হল—

---

[164] পূর্ণচন্দ্র বসু, "কাব্য – ভারতচন্দ্র: রস-বর্ণনা," *কাব্য-চিন্তা* (কলিকাতা: ডন প্রেস, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ), ১৩৩।

[165] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: ভারত-মঙ্গল— পূর্ব্ব খণ্ড, সটীক; আনন্দচন্দ্র," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ৩১৪।

[166] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা: প্রতিধ্বনি কাব্য," *নব্যভারত* ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০২ বঙ্গাব্দ): ২২০।

> বঙ্কিম বাবু বড় একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন। এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণরসের বরুণবাণে দিগ্বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।[167]

বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটি উপন্যাস *বিষবৃক্ষ*-এর করুণরস সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় *ভারতী* পত্রিকার পাতায়—

> সকলেই বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর কৃত করুণরস-প্রধান "বিষ-বৃক্ষ" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতে করিতে মনে অনেকগুলি ভাবের উদ্রেক হয়, এবং করুণরসে পাঠকের হৃদয় পর্য্যন্ত দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে।[168]

নব্যভারত-এর সপ্তম খণ্ডে শ্রীরামকমল বিদ্যাভূষণ প্রণীত *বিলাপাবলী* কাব্যের আলোচনায় বলা হয়েছে—

> "মার মার" করিলেই যেমন বীর রস প্রকাশ হয় না, "মাগো' বলিলেই করুণরস দেখান হয় না।[169]

বাণীনাথ নন্দী 'অভিনয়ের উপযোগিতা' নামক একটি প্রবন্ধেও এনেছেন করুণরসের প্রসঙ্গ। তাঁর মতে, অভিনেতা দর্শকের মন আকর্ষণ করতে এবং নাটকের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন তখনই, যখন—

> ...করুণ, বীর, হাস্য বা যে কোন রসের চিত্র হউক না কেন... যদি অভিনেতা আপনার সত্তা ভুলিয়া, অভিনীত চরিত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে তচ্চরিত্রময় করিতে সমর্থ হন।[170]

---

[167] সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রাজসিংহ," *সাধনা* ২য় বর্ষ, ২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দ): ৪১০।

[168] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২৮।

[169] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ১৫০।

[170] বাণীনাথ নন্দী, "অভিনয়ের উপযোগিতা," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ২৫৮।

অবশ্য এরকম দু-একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম হয়তো সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ-প্রভাবমুক্ত বাংলা সাহিত্যে রসবাদ-নির্ভর সমালোচনার বিরল উপস্থিতিকেই প্রমাণ করে।

৫.৪.৩ সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে করুণরস— সংস্কৃত সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় যেসব স্থানে করুণরস-প্রসঙ্গ এসেছে, সেই দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ রইল এই অংশে—

৫.৪.৩.১ *রামায়ণ*-এর করুণরস

রামায়ণ, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, নৈষধচরিত, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ আলোচনায় এসেছে করুণরস প্রসঙ্গ। *রামায়ণ* বা *রামায়ণ*-এর কাহিনি নিয়ে যে সব সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে করুণরস-প্রসঙ্গ আসা সম্ভবত অনিবার্য ছিল। যেমন, পূর্ণচন্দ্র দত্ত *কাব্য-চিন্তা* গ্রন্থে *রামায়ণ*-এর করুণ রস নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এমনকি *মহাভারত* এবং *রামায়ণ*-এ করুণরসের উপস্থিতির একটি তুলনামূলক আলোচনাও এখানে দেখা যায়[171]। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রথম

---

[171] কাব্যাংশে বাল্মীকির প্রতিভা করুণাদি কোমল রসে বিশেষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি সেই রসে আমাদের হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন।

...রামায়ণে করুণরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস একটানা স্রোতে মহাকাব্যকে প্লাবিত করিয়া যাইতেছে। বাল্মীকি এই রসে [ভ্র]মণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি হৃদয়-ব্যথায় পৃথিবীকে বিগলিত করিবার জন্য করুণ-রসের প্রস্রবণকে একেবারে শতধারায় বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সে রসের মহা তরঙ্গোচ্ছ্বাসে অন্য রস তত মিশিতে চায় না। রাম-বনবাস-কালে কৈকেয়ীর ব্যবহারে হৃদয়াঙ্গ একদা একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই করুণরসের মহা প্রবাহ আসিয়া সেই হৃদয়কে একেবারে আর্দ্র করিয়া ফেলে। স্থায়ীরস, সঞ্চারী ভাবকে সরাইয়া দেয়। তুমি রামের জন্য, সীতার জন্য, লক্ষ্মণের জন্য অশ্রুবর্ষণ শেষ করিতে পার না...। বাল্মীকি কাব্যের সর্ব্বস্থলেই করুণ রসের উপকরণ যোজনা করিয়াছেন। ...সীতাহরণের পর রাম যেমন রোদন-ধ্বনিতে পশু, পক্ষী ও বৃক্ষগণকেও কাঁদাইয়াছিলেন বনগমনোদ্যোগী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তদ্রূপ সমস্ত লোকমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। সেই করুণ রসের স্রোত আবার অশোক কাননে। সীতার দুঃখে তথায় কে না কাঁদিতেছে? ...তৎপরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা

বর্ষে 'শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজাত শ্রীমন্মহামর্কট' ছদ্মনামে 'রামায়ণের সমালোচনা' শীর্ষক যে ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়, সেখানে শ্লেষের মোড়কেই *রামায়ণ*-এ করুণরসের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়[172]। বলা বাহুল্য, রামায়ণে করুণরসের বিরলতা নিয়ে যে মন্তব্য এখানে লেখক করেছেন, সবটাই ব্যঙ্গপ্রসূত।

৫.৪.৩.২ *উত্তররামচরিত* ও করুণরস: দোলাচলের পটভূমি

ভবভূতি রচিত *উত্তররামচরিত* মূলত তার করুণরস বর্ণনার নৈপুণ্যের জন্যই প্রসিদ্ধ। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর 'ভবভূতি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> আদিরসবর্ণনে কালিদাস অদ্বিতীয়, বীর ও করুণরসবর্ণনে ভবভূতির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, "কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে"। করুণরস প্রকৃতপ্রস্তাবে ভবভূতিই বর্ণনা করিয়াছেন।[173]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ভবভূতি-প্রসঙ্গে বলেছেন—

ও বনবাসে কে না নয়ননীরে পৃথিবী আর্দ্র করিয়াছেন? রামায়ণে এই স্থায়ী রসস্রোত সমভাবে প্রবল প্রবাহে বহিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু মহাভারত কিরূপ রসের আধার? রামায়ণ যেমন করুণ রসে উছলিয়া পড়িতেছে, মহাভারত তেমনি বীররসে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। ... ব্যাসের হৃদয় করুণ, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর রসে পরিপূর্ণ। বাল্মীকির হৃদয় ও মুখমণ্ডল সকলই করুণরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। ... বাল্মীকি তথায় (রামের বনবাস-কালে) নিজ কাব্যকে করুণরসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন দেখ, তাহা কি নির্ব্বাসন বলিয়া প্রতীতি হইবে? ... ব্যাস কি বাল্মীকির মত করুণ রসের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন? ... ব্যাস এই নির্ব্বাসনস্থলে নিজ কাব্যকে তত করুণরসের উপকরণে সজ্জিত করিতে পারেন নাই। পঞ্চপাণ্ডবেরা বীরের ন্যায় বনবাসে গেলেন। সে স্থলে করুণের সহিত গম্ভীর রসের সঞ্চার। [উৎস: পূর্ণচন্দ্র বসু, "মহাকাব্যের পার্থক্য: রসের পার্থক্য," *কাব্য-চিন্তা* (কলিকাতা: ডন প্রেস, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ), ১০০।]

[172] রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরগণকর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণ রসাশ্রিত বিষয়। [উৎস: শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজাত শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত, "রামায়ণের সমালোচনা (ব্যঙ্গরচনা)," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৭২।]

[173] সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, "ভবভূতি," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১৬০।

> এই নাটক করুণরসাশ্রিত...। শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরসবিষয়ে সেইরূপ।[174]

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত ও পরে *বিবিধ প্রবন্ধ*-এ সংকলিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এর আলোচনায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র তথা রসশাস্ত্রকেই একপ্রকার নস্যাৎ করলেন বটে, কিন্তু করুণরসের প্রাধান্যের কথাও উল্লেখ করলেন একাধিকবার। করুণরসের সূত্র ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র তথা আপামর বাঙালির সংস্কৃত রসতত্ত্ব-সংক্রান্ত দোলাচলের মনোভাবটি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কিনা—কোন্ অঙ্কে কোন রস প্রধান -কোথায় কোন্ ভাব,— হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,— নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারী ভাব— স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব;— কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন্ বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।[175]

যে বঙ্কিমচন্দ্র *উত্তররামচরিত* আদৌ করুণরসপ্রধান কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, সেই বঙ্কিমই আবার *উত্তরচরিত*-এ সীতাপবাদে রামের বিলাপ প্রসঙ্গে লেখেন—

> ...এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। ...শুনিলে বা পাঠ করিলে, বোধ হয়, যেন কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা— শব্দের বড় ঘটা, কিন্তু অন্তঃশূন্য।...[176]

---

174 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব," *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১* (কলকাতা: দে'জ, ২০২০), ৪১২।

175 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১০৮-১০৯। [*বিবিধ প্রবন্ধ*-এ সংকলিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে এই অংশটি অনুপস্থিত]

176 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১১৩।

যদি *উত্তররামচরিত*-এ করুণরসের উপস্থিতির প্রশ্নটিই অবান্তর হয়, তাহলে ‘করুণরসের’ ‘বিঘ্ন’তেই বা বঙ্কিম কেন ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা বোঝা কঠিন। এই যুক্তিগত অসংগতি লক্ষ করেই কি তিনি পরে ‘উত্তরচরিত’-এর গ্রন্থপাঠে প্রথম মন্তব্যটি বর্জন করেছেন?

৫.৪.৩.৩ নৈষধ ও করুণরস

এবার আসা যাক *নৈষধচরিত*-এর প্রসঙ্গে। *নব্যভারত*-এ প্রকাশিত ‘শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য’ প্রবন্ধে নৈষধের করুণরস-বর্ণন সম্পর্কে শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্নের প্রশংসাসূচক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—

> নৈষধচরিত আদিরস প্রধান মহাকাব্য, আদ্যোপান্তই প্রায় ইহার আদিরসে অভিষিক্ত, তবে কবির করুণরস বর্ণনেও বিলক্ষণ শক্তি ছিল।[177]

আবার ঠিক বিপরীত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত ‘নৈষধ সমালোচন’ প্রবন্ধে—

> যে করুণরস আর্য্যগণের হৃদয়কন্দরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, যাহা আর্য্যকবির জনবিমোহনকারিণী ঐন্দ্রজালবিদ্যা, নৈষধে সেই করুণরসের একান্ত অভাব।[178]

এইভাবেই নৈষধচরিত-এ করুণরস-প্রাধান্যের সূত্র ধরে উনিশ শতকের সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন।

৫.৪.৪ নাট্যতত্ত্বে করুণ রস: করুণের প্রাধান্য-সংক্রান্ত বিতর্ক

কোনও নাটকের তথা কাহিনির সমাপ্তি ট্র্যাজিক বা করুণরসাত্মক হওয়া সম্পর্কে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল উনিশ শতকের

---

[177] শরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন, “শ্রীহর্ষের নৈষধকাব্য (২),” *নব্যভারত* ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): ৬৫০-৫১।

[178] অজ্ঞাত, “নৈষধ সমালোচন,” *বঙ্গদর্শন* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৪৪।

বাঙালি। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন' এই নিষেধাজ্ঞার কারণ খোঁজার চেষ্টা আছে—

> ভারতবর্ষীয় কবিগণের উপাখ্যান প্রায়ই সুখ দুঃখের সমতায় রচিত হইত, কিম্বা সুখ-প্রবল করিয়া রচিত হইত কিন্তু দুঃখ-প্রবল রচনার বিষয়ে তত আদর ছিলনা। এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নিষেধ সূত্র ও লিখিত আছে। কিন্তু কী কারণে যে ভারতবর্ষীয় আলঙ্কারিকেরা উপাখ্যানকে দুঃখান্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায় না। বোধ হয় রঙ্গভূমি হইতে মানব কবির মনসিজ অসামান্য দুঃখভারাবনত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া সাংসারিক কোন্ সামান্য সুখের দ্বারায় আর তাহার অপনোদন করিবে, এবং দুঃখভারে বিকৃত মন স্ফূর্ত্তিবিহনে যে সংসারে কোন কার্য্যকারী হইবে না, ও শারীরিক ও মানসিক-রোগ-করীও হইতে পারে, এবং এরূপ দুঃখের পৌনঃপুন্যে মন দুঃখ বিষয়ে অসাড় হইয়া যাইতে পারে, এই সকল ভাবিয়াই হয়ত তাহাঁরা উপাখ্যান দুঃখে পরিশেষিত করিতে নিষেধ বিধি করিয়াছিলেন।[179]

ভরত প্রমুখ *নাট্যশাস্ত্র*-রচয়িতাদের প্রণীত সূত্রে করুণরসের প্রাধান্য নেই, প্রাধান্য কেবল আদি ও বীররসের— সে কথা জানানোর পর 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে বলা হয়—

> এস্থলে এরূপ বলাও কিছু অসঙ্গত নহে যে, আদ্য ও বীর রসের ন্যায় নাটকে করুণ রসের প্রাধান্য থাকিলে, তাহা সভ্য-সমাজে আদরণীয় হইত না। নাটকে করুণ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হইলে উহা অবশ্যই সামাজিকদিগের অন্তঃকরণে প্রচুর পরিমাণ আনন্দ বিতরণ করিত।
>
> ...করুণ রস হাস্য রসের বিরোধী হইয়া মুখ্যভাবে নাটক-মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইলে, সামাজিকদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ-শোকাদির আবির্ভাব হইতে পারে, এজন্য মুনিবর ঐ রসকে অঙ্গিস্বরূপ করিয়া নাটক প্রণয়ন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ আশ্চর্য্যজনক রসকে বীর রসের পার্শ্বচর করিতে আদেশ

---

[179] রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮২ বঙ্গাব্দ), ৪৪০-৪১।

> করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ঐ রসকে প্রধান অঙ্গী করিয়া নাটক রচনা করিলে, তাহা কখনই সভ্য-সমাজে অনাদর-ভাজন হইত না। কোন নাটকের মধ্যে মুখ্যরূপে করুণ-রসের স্রোতঃ প্রবাহিত হইলে, উহা সামাজিকদিগের শোক-দুঃখের কারণ কেন হইবে?[180]

আসলে পাশ্চাত্য ভাবধারার স্পর্শে বাঙালি নিশ্চয়ই তখন সংস্কৃতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির ধারণার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিল। ফলে করুণ কেন নাটকের অঙ্গীরস হতে পারে না— এই প্রশ্ন তথা সংশয় উনিশ শতকের বাঙালির পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল। 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে সেই সংশয়েরই অনুরণন শোনা যায়।

৫.৪.৫ করুণরসের তাত্ত্বিক অবস্থান

ভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' নামক প্রবন্ধে করুণরসসৃষ্টিতে কালিদাসের দুর্বলতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। *রঘুবংশ*-এর প্রসঙ্গে কালীপদ ঘোষ বলেছেন, "করুণরসসৃষ্টিতেও তিনি ব্যর্থ।"[181]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী, "শোক স্থায়িভাব হইতে করুণরসের উৎপত্তি, উহা শাপক্লেশগ্রস্ত প্রিয়জনের বিয়োগ-বিভবনাশ-বন্ধন-বিদ্রব-উপঘাত-ব্যসনসংযোগ প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপন্ন হয়...।"[182] এখানে 'বিদ্রব' শব্দের অর্থ হল নির্বাসন এবং 'উপঘাত' শব্দের অর্থ হল আগুনে পুড়ে মৃত্যু প্রভৃতি অপঘাতজনিত মৃত্যু। একমাত্র কারও পুনর্জীবনলাভের আশা ছাড়াই মৃত্যু ঘটলে, কিংবা মৃত ব্যক্তি নতুন শরীর নিয়ে পুনর্জীবনলাভ করলে, তবেই তা করুণ রস হয়।

---

[180] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৪৭৫।

[181] কালীপদ ঘোষ, "কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৪৩৫।

[182] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫): ১৩৫।

সুতরাং প্রবাস বা মানহেতু নায়ক নায়িকার মধ্যে ব্যবধান রচিত হলে তা সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব অনুযায়ী করুণের ক্ষেত্র নয়, শৃঙ্গারের ক্ষেত্র। এমনকি নায়ক-নায়িকার মিলনের পরবর্তীকালে একজনের মৃত্যু হলেও যদি পুনর্জীবনের সম্ভাবনা বা আশা থাকে, তাহলে তা করুণরস হিসেবে গণ্য হয় না, শৃঙ্গারের অন্যতম প্রকারভেদ করুণ-বিপ্রলম্ভ নামে চিহ্নিত হয়। যেমন, *কুমারসম্ভবম্*-এ 'রতিবিলাপ' অংশ পাঠকহৃদয়ে যে রসের নিষ্পত্তি ঘটায় তা করুণরস। কিন্তু মদনের পুনর্জীবন-সম্ভাবনা সূচিত হওয়া মাত্রই তা করুণ-বিপ্রলম্ভ বা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে পরিণত হয়।

ঠিক একই কারণে, শকুন্তলা যখন তপোবনে বিরহের উদ্‌যাপন করেন বা শকুন্তলার স্মৃতি হৃদয়ে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর যখন দুষ্যন্ত বিচ্ছেদবেদনা ও অনুতাপে অধীর হন, তখন করুণরসের নিষ্পত্তি ঘটে না। যে রসের নিষ্পত্তি হয়, তা হল বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। আবার, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে কালিদাস যখন শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার ছবি আঁকেন, তখন তাকেও করুণরসের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ 'শাপক্লেশগ্রস্ত প্রিয়জনের বিয়োগ-বিভবনাশ-বন্ধন-বিদ্রব-উপঘাত-ব্যসনসংযোগ'– এর কোনোটাই এক্ষেত্রে ঘটেনি। বরং এখানে যে চরিত্রগুলি বাৎসল্য বা সখ্যের বিভাব তাদের মধ্যে কর্তব্যপালনহেতু দেশান্তরের ব্যবধান তৈরি হয়েছে। *ভারতী*-র প্রাবন্ধিক সেই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিভাজনের দিকে তাঁর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। *রঘুবংশম্*-এর পর্যালোচনার সময়ে কালীপদ ঘোষ মনে করিয়ে দিয়েছেন—

> আমরা যে সকল উদাহরণ নিয়াছি তাহা করুণ রসের নহে। আমরা বলিয়াছি যে এ সকল বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে, এবং রঘুর স্থানে স্থানে কালিদাস করুণ রসের বর্ণনা

> করিয়াছেন। ...অতএব আমরা দেখিলাম যে প্রকৃত মর্ম্মভেদী করুণ রস কালিদাসে নাই।[183]

কিন্তু 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এর লেখক এই বিষয়ে যতদূর সচেতন ছিলেন, উনিশ শতকের সব লেখকের মধ্যে সেই সচেতনতা চোখে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বর্ষে প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত 'যাত্রা' নামক প্রবন্ধটির পুনরুল্লেখ করতে হয়। সেখানে লেখা হয়েছিল—

> জনসাধারণ আদিরসপ্রিয় হইলেও, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে কবিগণ তাহার সহিত কৌশল ক্রমে করুণ রস মিশ্রিত করিয়া কাব্যাদির মনোহারিত্ব বিধান করেন।[184]

এখানে লেখকের বক্তব্য ছিল, কবিরা যে কৌশলে আদিরসের সঙ্গে করুণরসের এই মিশিয়ে দেওয়ার কাজটি করে থাকেন তা হল, বিরহ বা বিচ্ছেদ। বিরহ বা বিচ্ছেদ রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে করুণরসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। কিন্তু তা 'যাত্রা'র লেখকের দৃষ্টি অথবা জ্ঞানের পরিধির বহির্ভূত ছিল। তাই বিপ্রলম্ভের সঙ্গে তিনি করুণরসকে একীকৃত করে ফেলেছেন। যেহেতু *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম বর্ষে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তাই ধরে নেওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় দৃষ্টির দ্বারা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হয়েই প্রবন্ধটি *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায় প্রকাশযোগ্যতা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'উত্তরচরিত'-এর পত্রিকাপাঠে ঘোষণা করেছিলেন "আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই"[185] করুণরস ও বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের পার্থক্য সম্পর্কে এ প্রবন্ধের অমনোযোগিতা

---

[183] কালীপদ ঘোষ, "কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৪৩৬-৩৭।

[184] অজ্ঞাত, "যাত্রা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৪৫৯।

[185] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত: দ্বিতীয় সংখ্যা," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১০৮।

কিংবা অসচেতনতা, সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের অলংকার-শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষাকেই আরও একবার প্রকট করে।

৫.৪.৬ উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও করুণ রস

করুণরসের প্রসঙ্গে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল' প্রবন্ধে কালিদাসের করুণরস সৃষ্টিতে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছিল। আর এই প্রবন্ধে আবার কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে করুণরসের বিশেষত্ব তুলে ধরা হল—

> নিজে আড়ালে থাকিয়া দূতীমুখে ইরাবতীর এই অনুগ্রহভিক্ষা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী, মালবিকাগ্নিমিত্রের করুণরস এই খানে আসিয়া ঘনীভূত হইয়াছে।[186]

তবে করুণ রস থাকা সত্ত্বেও *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* যে ট্র্যাজেডি নয়, তা স্বীকার করলেন এই প্রবন্ধের লেখক। কারণ হিসেবে বললেন—

> সংস্কৃত নাটক কখন ট্র্যাজেডি হয় না। মিলনান্ত বলিয়াই যে তাহারা ট্র্যাজেডি নহে, তাহা নয়। মিলনের বুকের ভিতর শোকের যে অন্তঃসলিল প্রবাহিত হইলে আমরা কোন নাটককে ট্র্যাজেডি বলিয়া থাকি সংস্কৃত মিলনান্ত নাটকে সেই শোকের অন্তঃপ্রবাহ নাই।[187]

এখানে এসে উনিশ শতকের বাঙালি মননের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় তাত্ত্বিক চিন্তার আরও একটি ব্যবধানের দিক চিনে নেওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র বিয়োগান্ত নাটকের অনুপন্থী নয়। অথচ বিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দুঃখ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও আঘাতের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটছে ব্রিটিশ-শাসিত বাঙালির। পাশ্চাত্য

---

[186] সরলা দেবী, "মালবিকা-অগ্নিমিত্র," *ভারতী* ১৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ): পৃষ্ঠা ৬৮২।

[187] সরলা দেবী, "মালবিকা-অগ্নিমিত্র," ৬৮১।

বিজ্ঞানচেতনার স্পর্শে ছিন্ন হচ্ছে অন্ধ সমর্পণ ও বিশ্বাসের মায়াতন্তু। যে সমাহিত স্থৈর্য ও আলোকিত জীবনবোধ প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রকারকে মিলনান্তক পরিণতিকেই একক ও ধ্রুব বলে চিহ্নিত করতে প্রণোদিত করেছিল, সেই বিশ্বাসের ভরকেন্দ্র থেকে অনিবার্যভাবে চ্যুত হচ্ছিল উনিশ শতক। তাই উনিশ শতকের বাঙালি প্রাচীন ভারতের রসবাদের চেয়ে বেশি মানসিক সামীপ্য খুঁজে পাচ্ছিল গ্রিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে।

তাছাড়া, উনিশ শতক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শতক। তত্ত্বকারের নির্ধারিত পথে মিলনান্তক নাটককেই একমাত্র পরিণতি বলে শিরোধার্য করতে গিয়ে ব্যাহত হচ্ছিল তার চিন্তার স্বকীয়তা। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনার অভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়েছিল উনিশ শতকের বাঙালির চোখে—

> রাজার সহিত মালবিকার বিবাহোদ্যোগের দৃশ্যে মহিষী একবারো আপনার মনেও দুঃখপ্রকাশ করেন নাই।...কেমন শান্ত প্রসন্ন আনন্দের সহিত তিনি রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন।[188]

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অনুসারে স্পষ্টতই এখানে ‘উত্তম প্রকৃতির ব্যক্তিতে শোক’[189] স্থায়িভাবের রসরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই অংশটি পড়ে উনিশ শতকের পাঠকের তো মনে হতেই পারে, মহিষীর এই দুঃখহীনতা স্বাভাবিক নয়। কেবল অলংকার -শাস্ত্র অনুসারে তাঁকে ‘উত্তম প্রকৃতির’ প্রমাণ করার তাগিদেই দেখানো গেল না তাঁর শোকাতুর রূপ! নাট্যতত্ত্বে আনন্দময় ও মিলনান্তক পরিণতির বিধান ছিল বলেই মহিষী এখানে এমন নির্লিপ্ত, বিকারহীন। কেবল রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করার দায় থেকেই

---

[188] সরলা দেবী, “মালবিকা-অগ্নিমিত্র,” ৬৮১।

[189] “স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে করুণের স্থায়িভাব শোক মরণের অধ্যবসায় (দৃঢ়সংকল্প) আনয়ন করে। শোকে মধ্যম প্রকৃতির মুমূর্ষা (মরণেচ্ছা) অথবা মৃত্যু পর্যন্তও ঘটিয়া থাকে। আর উত্তম প্রকৃতির শোক অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও বিবেক দ্বারাই শান্ত হইয়া থাকে।”

মহিষী এখানে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'! তাই 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র'-র লেখিকা মহিষীর অতুলনীয় প্রসন্নতার প্রশংসা করলেও শেষে এইটুকু না বলে থাকতে পারেন না—

> মহিষীর মনে যদি কিছু কষ্ট থাকে তবে নিজের কাছেও তাহা ভাষায় প্রকাশ করেন নাই— আশ্চর্য্য সংযম বলিতে হইবে।...এই আত্মলয়ের নীচের স্তরে অনেক দুঃখ অনেক নিরাশা ফসিল আকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে নিরাশা যাতনা এখন এমন প্রশান্ত হর্ষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে যে মহিষী নিজেই আর বোধহয় তাহাকে সহজে চিনিতে পারেন না।[190]

'নিরাশা', 'যাতনা', 'দুঃখ' এই শব্দগুলির সঙ্গে 'প্রচ্ছন্ন', 'ছদ্মবেশ'— এই শব্দগুলির সম্মিলনই বুঝিয়ে দেয়, উনিশ শতকের বাঙালির পক্ষে কেন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের 'করুণরস'-কে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। মহিষীর প্রশান্ত হর্ষ যে ছদ্মবেশমাত্র কিংবা তাঁর দীর্ঘ যন্ত্রণাযাপনের উপজাত, সে কথা প্রাচীন কাব্যতত্ত্বের তাত্ত্বিক বিভাজনের আড়ালে হারিয়ে যায়। কিন্তু উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাঠে দীক্ষিত লেখকের দৃষ্টি এভাবে এড়িয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণে 'নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য'[191] বলে রসবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন, প্রায় একই কারণে করুণরসের কাব্যতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত সম্পূর্ণরূপে আদৃত হল না উনিশ শতকের মননে।

৫.৫ বীভৎস রস

ভরত *নাট্যশাস্ত্র*-এ যে চারটি মুখ্যরসের কথা বলেছিলেন, তার একটি বীভৎস। *নাট্যশাস্ত্র*

---

[190] সরলা দেবী, "মালবিকা-অগ্নিমিত্র," ৬৮১।

[191] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড*, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ১৬২।

অনুসারে বীভৎস রস থেকেই গৌণ ভয়ানক রসের উৎপত্তি[192]। আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র বীভৎসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা এবং এর আলম্বন বিভাবগুলিকে নেতিবাচকভাবেই বরাবর চিহ্নিত করেছে। যেমন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে, "অহৃদ্য, অপ্রিয়, অপবিত্র (অচোক্ষ্য – অশুচি) ও অনিষ্টকর বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা (এই রস) উৎপন্ন হয়।"[193] *দশরূপক* অনুসারে বিভাবাদির দ্বারা জুগুপ্সার পরিপোষণ হয়ে বীভৎস রসের উদ্রেক ঘটে। একে 'অত্যন্ত উদ্বেগকর ও ক্ষোভের জনক' বলা হয়েছে[194]। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ বীভৎস রসের সংজ্ঞা–

> যাহার স্থায়ীভাব জুগুপ্সা তাহাকে বীভৎস রস বলা হয়। কথিত আছে- ইহার বর্ণ নীল এবং ইহার দেবতা হইতেছেন মহাকাল। ইহার আলম্বন (বিভাব) হইতেছে, দুর্গন্ধ মাংস, রুধির, মেদ প্রভৃতি। এখানে কৃমিপাতাদিকই (পোকা কিলবিল করাকে) উদ্দীপন বলা হইয়া থাকে।[195]

একইভাবে শারদাতনয়ের *ভাবপ্রকাশন* অনুসারে জুগুপ্সা "নিন্দাত্মক চিত্তসঙ্কোচ"[196]। বীভৎস রসের উদ্দীপন বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা– 'নিন্দিত'। এখানে বীভৎস রসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– (১) ক্ষোভাত্মক (রক্ত, অস্ত্র প্রভৃতি দেখে এই ধরনের বীভৎস রসের জন্ম হয়।) (২) উদ্বেগাত্মক (অশুচি বা অপবিত্র বস্তু দেখে এই জাতীয় বীভৎস রসের জন্ম হয়।) রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র *নাট্যদর্পণ*-এ বলেছেন– ঘৃণ্য

---

[192] বীভৎসদর্শনং যচ্চ ভবেৎ স তু ভয়ানকঃ। [উৎস: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *ভরত নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১৩৯।]

[193] বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যশাস্ত্র: প্রথম খণ্ড*, ১৫০।

[194] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ১৭০।

[195] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১৭০।

[196] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ১৬৬।

রূপ দর্শনের পাশাপাশি ‘পরশ্লাঘা শ্রবণ’-এর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে বীভৎসের বীজ[197]। ধনঞ্জয়ের টীকায় ধনিক আবার বাহ্য অশুচিতার চেয়ে বীভৎসের উদ্রেকের ক্ষেত্রে মানবমনের অন্তর্নিহিত ঘৃণাকে দায়ী করলেন—

> সাধারণতঃ উদ্বেগজনক অশুচি পদার্থই যে বীভৎস রসের জনক হইবে– এরূপ নিয়ম নাই। যাহা সাধারণ লোকের নিকট অতি রমণীয়– শৃঙ্গারের উদ্রেকহেতু সেই রম্য রমণী-শরীরও বৈরাগ্যবশতঃ ঘৃণাজনক ও অশুদ্ধ প্রতীয়মান হইয়া বীভৎস রসের জনক হইতে পারে।[198]

বীভৎসের এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অন্যান্য আলংকারিকদের ভাবনাতেও গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, নারদ মতে, “বাহ্যবিষয়াশ্রিত মন যখন চিত্তবস্থ ও তমঃসত্ত্বযুক্ত, তখনই তাহা হইতে বীভৎস রসের উদ্রেক হয়”[199]। *কাব্যপ্রকাশ*-এর টীকায় গোবিন্দ ঠক্কুর বলেছেন— ‘বিষয়সমূহের দোষাধিক্য’ দেখে উদ্ভূত যে ঘৃণা, তাই-ই বীভৎসের স্থায়ী ভাব জুগুপ্সা[200]। অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে, “অনভিমত বস্তু দর্শনে, গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দের দোষহেতু ও বহু উদ্বেজনবশতঃ বীভৎস রস সমুদ্ভূত হইয়া থাকে”[201]।

উনিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচনায় বীভৎসের যে সব উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির অভিমুখও মুখ্যত নেতিবাচক। যেমন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *কল্পতরু*-র সমালোচনায় বীভৎস রসের ‘অন্যায় অবতারণা’কে ‘রুচির দোষ’ মনে করেছেন

[197] এখানে ‘পরশ্লাঘা’ শব্দের অর্থ বিপক্ষ বা শত্রুর স্তুতি। [উৎস: অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ১৭৩।]

[198] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব,* ১৭০।

[199] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব,* ১৭১।

[200] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব,* ১৭৩।

[201] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব,* ১৬৯।

সমালোচক[202]। আবার যোগীন্দ্রনাথ বসু *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থে *মেঘনাদবধ কাব্য* সম্পর্কে বলেছেন— "মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎসরসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন।"[203] *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর রাক্ষসকুলের পরিচয়ে এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে তারা 'বীভৎসরসের আধার' নয়। বীভৎস রসের নেতিবাচক ব্যঞ্জনা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার, যোগীন্দ্রনাথ বসুই যখন *ডিভাইন কমেডি*-র নরকের সঙ্গে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর নরক-বর্ণনার তুলনা করে বলেন, "মেঘনাদবধের নরকে বীভৎসরসেরই প্রাধান্য। ইহার নারকীয় দৃশ্য, ডিভাইন কমেডির (Divine Comedy) নরক বর্ণনার ন্যায়, আমাদিগকে ভীত ও স্তম্ভিত করে না; হৃদয়ে বীভৎস ভাবেরই অধিক উদ্দীপন করে"[204] তখন বীভৎস রসের উপস্থিতিই *ডিভাইন কমেডি*-র তুলনায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর নবম সর্গকে কিছুটা সাহিত্যগুণে অবনমিত করেছে বলে মনে হয়।

মেঘনাদবধ কাব্য ছাড়া মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর অংশবিশেষেরও উপাদান ছিল বাল্মীকি *রামায়ণ*। সেই *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর অন্তর্গত 'শূর্পণখা পত্রিকা'তেও স্বয়ং মধুসূদন ঘোষণা করেন—

---

[202] যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। [উৎস: অজ্ঞাত, কল্পতরু: সমালোচনা, *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৪১৭।]

[203] যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫), ২৩৪। [দ্বাদশ অধ্যায়: পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব-কাল]

[204] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদবধ কাব্য," *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫), ২৮০। [পত্রিকাপাঠ: যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মেঘনাদ-বধ-চিত্র: চতুর্থ প্রস্তাব," *নব্যভারত* ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ), ৪৩২।]

> কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই।[205]

এই কটি উদাহরণে বীভৎস রস-কে কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হলেও এটিই কিন্তু বীভৎস সম্পর্কে উনিশ শতকের এক এবং একমাত্র মনোভঙ্গি ছিল না। ভরত কথিত অষ্টরস (পরে নবরস)-এর সৌন্দর্য নিহিত তার বৈচিত্র্যে। সব রস একপ্রকার না-হওয়াই রসতত্ত্বের সার্থকতার মূল চাবিকাঠি। তাই কাব্যজগতে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, বিস্ময়ের পাশাপাশিই বিরাজ করে করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস। উনিশ শতকের সব সমালোচকই যে এই কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন, এমন নয়। বীভৎসজাত ভয়ানকরস সম্পর্কে সর্বদা নেতিবাচক তাৎপর্য যে আরোপ করা হয়নি, সেই দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকে বীভৎসকেও সর্বদা নেতিবাচকরূপে না দেখে, তাকে অনেকসময়েই তুলে ধরা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক পক্ষপাতশূন্যতায়। নিচে রইল তার কয়েকটি উদাহরণ:

- চণ্ডীকাব্যে যেমন নানা রস আছে, তেমনি বৃহৎ পক্ক রোহিত মৎস্যেও নানা রস আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ রস আছে সে বিষয়ে নানা মত আছে; কেহ কেহ বলেন যে ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক; মধ্য দেশে শান্ত, করুণ, আদি ও পশ্চাদ্ভাগে অদ্ভুত, হাস্য ও বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়।[206]
- সেখানে আমাদের হৃদয়ের কোন কোমলতর রসের উত্তেজনা হয়? তখন কি বরং ভয়ানক, বিস্ময়, বীভৎস, ইত্যাদি কতকগুলি কঠোর অকোমল রস একত্রে মিশ্রিত হইয়া অপ্রতিহত প্রতাপে

---

[205] মধুসূদন দত্ত, "বীরাঙ্গনা কাব্য: লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা," মধুসূদন রচনাবলী, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫), ১৪২।

[206] শ্রী অঃ, "তুলনায় সমালোচন," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ): ৩৭।

> আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত আলোড়িত করিতে থাকে না?[207]

উনিশ শতকে কালিদাস এবং ভবভূতির সাহিত্যকৃতির তুলনা প্রসঙ্গে একাধিক রচনায় একাধিকভাবে বীভৎসরসের প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন, 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—

> কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; ...বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না।
>
> ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন– কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে।[208]

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' প্রবন্ধেও কালিদাস সম্পর্কে একইভাবে বলা হয়েছে—

> অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎসরসের বর্ণনা নাই।[209]

উপরোক্ত দুই উদ্ধৃতিতেই লেখকদ্বয়ের মতামত থেকে স্পষ্ট, বীভৎসরসের অনুপস্থিতি অন্তত এই ক্ষেত্রে, কালিদাসের কোনও ইতিবাচক গুণ হিসেবে গণ্য হয়নি। বরং ভবভূতি

---

[207] ম্যাকবেথ প্রসঙ্গে [উৎস: চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪): ২৬-২৯।]

[208] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ): ১৬২। [পত্রিকাপাঠ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১১০।] (নজরটান আরোপিত)

[209] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "কালিদাস ও শেক্ষপীয়র," *বঙ্গদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৫): ৩১।

যে সব রসকেই সমানভাবে স্থান দিয়েছেন তাঁর কাব্যে, সেই দিকটিকেই গৌরবান্বিত করার চেষ্টা আছে। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে বীভৎস রসকে তেমন কোনও নেতিবাচক তাৎপর্যে তুলে ধরা হয়নি।

উনিশ শতকে বীভৎস রসের এই স্বীকৃতির পেছনে আরও একটি কারণ অনুমান করা যায়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে ব্রহ্মসভায় ভরত কর্তৃক প্রলয়কালীন সংহারক্রিয়ার সুনিপুণ অভিনয় দেখে ব্রহ্মার উত্তরমুখ থেকে ভারতী বৃত্তি ও তা থেকে বীভৎস রসের উৎপত্তি ঘটেছিল। পরে বীভৎস রস থেকে ভয়ানক রস উৎপন্ন হয়। শারদাতনয়ের *ভাব-প্রকাশন*-এ এই ভারতী বৃত্তিকে 'পুরুষ-প্রধান' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাগরনন্দীর *নাটকলক্ষণরত্নকোষ*-এ বলা হয়েছে— "জুগুপ্সা যাহার স্থায়ীভাব সেই বীভৎস বীর-সংশ্রিত।"[210]

'পুরুষ-প্রধান' বৃত্তিজাত এবং 'বীর-সংশ্রিত' বলেই কি উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস-নির্মাতারা উপেক্ষা করতে পারলেন না বীভৎস রসকে? ইতিমধ্যে দেখা গেছে, ব্রিটিশ-শাসিত দেশে বাঙালি জাতির ওপর বিদেশি শাসকরা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন ভীরুতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতার অভিযোগ। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি গড়ে তুলতে চাইছিল এমন নতুন জাতিচেতনা যেখানে প্রতিবিম্বিত হবে তার সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। বাঙালির এই নতুন আত্মপরিচয়-নির্মাণের নিরিখেই হয়তো শৃঙ্গারকে অতিক্রম করে উনিশ শতক জুড়ে দেখা যাচ্ছিল বীর, রৌদ্র ও ভয়ানকের জয়গাথা। সামনে এল বীভৎস রসের নতুন তাৎপর্য। শৃঙ্গার, বীর বা করুণের মতো বহুল ব্যবহৃত রসের প্রায় পাশাপাশিই স্থান পেয়ে গেল বীভৎসের মতো একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্প-উল্লিখিত রস।

[210] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৭৩।

৫.৬ উনিশ শতকের তত্ত্বচর্চায় এবং সমালোচনায় শান্তরস

৫.৬.১ কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে শান্তরস

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ উল্লিখিত 'শান্ত' পরবর্তী সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রায় সব সংস্করণেই[211] ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমদিকে আটটি নাট্যরসের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ শান্ত প্রায় কোনও সংস্করণেই রস হিসেবে মান্যতা পায়নি। একমাত্র বরোদা সংস্করণেই 'রসবিকল্প' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে শান্ত-এর উল্লেখ আছে এবং উপসংহারে বলা হয়েছে রস নটি।[212] ষষ্ঠ অধ্যায়ের একেবারে শেষদিকে শান্তরসের এই আকস্মিক উল্লেখ অনেক গবেষকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করেছে এবং তাঁরা অনুমান করেছেন এই অংশটি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। আবার সুশীল কুমার দে-র অনুমান, ভরত 'শান্ত'কে একটি 'উপাদান' হিসেবে স্বীকৃতি হিলেও রস হিসেবে স্বীকৃতি আদৌ দেননি।[213]

শান্তরসকে 'রস' হিসেবে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া যায় কি না, কাব্য ও নাটক উভয় স্থানেই এর অস্তিত্ব আছে কি না, শান্তের স্থায়িভাব কী, এর ব্যভিচারিভাব কিংবা অনুভাবের অস্তিত্ব আছে কি না– ইত্যাদি নানা বিষয় ঘিরেই 'শান্ত' সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও মতানৈক্যের জন্ম দিয়েছিল। যেমন, শারদাতনয় শান্তরসকে 'বিকলাঙ্গ' আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ শান্ততে কোনও ব্যভিচারিভাবের বাহ্য প্রকাশ লক্ষ করা যায় না, আবার

---

[211] গ্রসে, কাব্যমালা, কাশী, বরোদা

[212] অবশ্য বরোদা সংস্করণের অন্য একটি পাঠান্তরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই এবং কাশী সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণের একটি পাঠান্তরে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নবরসের কথা পাওয়া যায়।

[213] …Bharata had some knowledge of sama or santa; but it is also clear that the instances quoted only show Bharata's recognition of santa as an element, and they do not mean 'Bharat's acceptance of santa as a Rasa. [**Source:** Sushil Kumar De, "The Santa Rasa in the Natya-Sastra and the Dasa-Rupaka," in Some Problems of Sanskrit Poetics (Calcutta: Firma KLM, 1959), 140.]

এর অনুভাবও অনুপস্থিত। নাটকে এর অভিনয়ও অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন তিনি। তবে, মোক্ষের প্রকৃষ্ট উপযোগী বলে শান্ত 'বিকলাঙ্গ' হলেও তাকে শ্রেষ্ঠ রস বলা হয়েছে। দশরূপকার ধনঞ্জয় অবশ্য নাটকে শান্তরসের স্বীকৃতির বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ—

প্রথমত, ভরত শান্তরসের বিভাব বা বর্ণ বা অধিদেবতার উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির উপশম যেহেতু বাস্তবে সম্ভব নয়, তাই শান্তরসের অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ধনঞ্জয়। তৃতীয়ত, যেহেতু শান্তরসের প্রধান উপকরণ সমস্ত চিত্তবৃত্তির বিলয়, সেইজন্য নাট্যের দ্বারা শান্তরসের সঞ্চার সর্বপ্রকারে অসম্ভব। চতুর্থত, ধনঞ্জয়ের মতে, শান্তরস এবং বীর ও বীভৎস রসের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা নেই। কোথাও শান্ত বীররসের অন্তর্ভুক্ত, কোথাও বীভৎসরসের পর্যায়ভুক্ত। তাই তিনি নাট্যে শান্তরসকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেননি।[214]

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রুদ্রট ভরতকথিত আটটি রসের সঙ্গে শ্রেয়ঃ ও শান্ত নামে দুটি অতিরিক্ত রস জুড়েছিলেন। উদ্ভট প্রথম নাট্যে নবরসের কথা বলে শান্তরসকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেন[215]। আচার্য মম্মট বলেছিলেন নির্বেদ ব্যভিচারী হলেও কালবিশেষে স্থায়ীর রূপ ধারণ করে, যার রসপরিণতি হিসেবে শান্তকে তিনি নবম রসের মর্যাদা দেন।[216] আনন্দবর্ধনও *ধ্বন্যালোক* গ্রন্থে শান্তরসকে স্বীকার করেছেন। তবে 'শান্ত'-কে রস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক সবচেয়ে অগ্রগণ্য তিনি হলেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। তিনি যে শুধু শান্তকে রস হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন তাই-ই নয়, শান্তকেই

[214] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ১৮৭।

[215] কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪.৪।

[216] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৯৬।

অন্য সব রসের 'প্রকৃতি' (মূল উপাদান) বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন অন্য রসগুলি শান্তেরই 'বিকৃতি' (মূল উপাদানজাত অন্যান্য রূপ, যেমন মাটি থেকে তৈরি ঘট প্রভৃতি)।[217] "শান্তরস থেকে কারণ অনুসারে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয় এবং সেই কারণগুলি ধ্বংস হলে ভাবগুলিও শান্তেই বিলীন হয়।"[218] যেমনভাবে একটি মালায় সুতোর দ্বারা নানা মণিরত্ন গাঁথা থাকে, তেমনই রতি, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়িভাব গাঁথা থাকে শান্ত নামক স্থায়িভাবের দ্বারা।[219]

শান্তের স্থায়িভাব কী, তা নিয়েও আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কারও কারও মতে শান্তের স্থায়িভাব নির্বেদ, কারও মতে শম্। তবে অভিনবগুপ্তের মতে—

> শান্তরসের স্থায়িভাবরূপে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উপস্থাপিত হতে পারে। আর পরম সত্যের অনুভব আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান শব্দটির অর্থ আত্মা স্বয়ং। ...এই আত্মাই শান্তরসের স্থায়ী ভাব।[220]

'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'আত্মা'র তাত্ত্বিক পরিভাষা হিসেবে অভিনবগুপ্ত 'শম্' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। শমের রসাস্বাদনের পদ্ধতি যে রতি প্রভৃতি লৌকিক রসের চেয়ে ভিন্নতর সেই কথাও অভিনবগুপ্ত জানিয়েছিলেন।[221] বলেছিলেন, "আত্মার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা থেকে শান্তরস উদিত হয়, যা সত্যজ্ঞানে উপনীত করে এবং পরমানন্দের সঙ্গে যুক্ত।"[222]

---

217 শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ১৮৬।

218 জি. টি. দেশপাণ্ডে, *অভিনবগুপ্ত*, অনু. রত্না বসু (নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬), ৭৯।

219 দেশপাণ্ডে, *অভিনবগুপ্ত*, ৭৯।

220 দেশপাণ্ডে, *অভিনবগুপ্ত*, ৭৮।

221 দেশপাণ্ডে, *অভিনবগুপ্ত*, ৭৮।

222 দেশপাণ্ডে, *অভিনবগুপ্ত*, ৭৯।

এভাবেই অভিনবগুপ্তের বয়ানে শান্তরস কেবল নবম রসের আসনেই অধিষ্ঠিত হয়নি, উপরন্তু অ-সাধারণত্বের বিশেষ মহিমাতেও ভূষিত হয়েছে।

কিন্তু শান্তরস নিয়ে এত বিতর্ক-মতদ্বৈধ এবং শান্তরস ঘিরে অভিনবগুপ্তের দীর্ঘ দার্শনিক প্রস্তাবনা— এর তেমন কোনও প্রভাব উনিশ শতকে চোখে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্য-দর্পণ*-এ প্রদত্ত শম্ এবং শান্তরসের সংজ্ঞাগুলি দেখে নেওয়া যাক। শমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

> অথ শম। ১৪৮। সংসারের অসারতা ও সমুদয় পদার্থের অনিত্যতা জ্ঞান হইলে চিত্তে যে একটী অবস্থা জন্মে, তাঁহার নাম নিশ্চেষ্ট অবস্থা; সেই অবস্থাতে যে আত্ম-বিশ্রাম-সম্ভূত-সুখ তাহার নাম শম।[223]

শান্তরসের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছিল—

> অথ শান্তরস। ১৬২। এই রসে শান্তি স্থায়িভাব, অনিত্যতাদি জন্য যে পদার্থ পরম্পরার অসারত্ব-জ্ঞান অথবা পরমাত্ম-স্বরূপ-জ্ঞান তাহাই আলম্বন বিভাব। ...রোমাঞ্চ। অশ্রুপাতাদি অনুভাব। নির্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।[224]

অর্থাৎ শম্ এবং শান্ত— উভয় সংজ্ঞাতেই 'সমুদয় পদার্থের অনিত্যতা জ্ঞান' বা 'অসারত্ব-জ্ঞান'-এর প্রসঙ্গ পাওয়া গেল, এবং শান্তরসের সঙ্গে 'পরমাত্ম' জ্ঞানের যোগসূত্র রচিত হল। এই বিশেষ পরিভাষাগুলি কিন্তু অভিনবগুপ্ত বা পূর্বে উল্লিখিত অন্য কোনও তাত্ত্বিকের বাচন থেকে সরাসরি উঠে আসেনি। অভিনবগুপ্তের আলোচনায় 'আত্মজ্ঞান' বা 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'আত্মার মুক্তি আকাঙ্ক্ষা'র কথা থাকলেও 'পরমাত্ম জ্ঞান' এই পরিভাষাটি সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে এ কি জয়গোপাল গোস্বামীর নিজস্ব শব্দচয়ন?

---

223 জয়গোপাল গোস্বামী, *কাব্যদর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (কলিকাতা: জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত ও ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), ৯৩-৯৪।

224 গোস্বামী, *কাব্য-দর্পণ,* ১০৭-০৮।

আসলে জয়গোপাল গোস্বামী শান্তরসের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করেছিলেন যাঁর গ্রন্থ অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চার ভিত্তিভূমি। তিনি হলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে—

> যাহার স্থায়িভাব শম ও প্রকৃতি উত্তম, তাহা হইতেছে শান্ত (রস)। ...*অনিত্যত্বাদি বশতঃ অশেষ বস্তুর অসারত্ব অথবা যাহা পরমাত্মস্বরূপ— তাহা হইতেছে ইহার আলম্বন বিভাব*। পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থ, রম্যবনাদি, মহাপুরুষসঙ্গ প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন (বিভাব); অনুভাবসমূহ হইতেছে রোমাঞ্চ প্রভৃতি এবং ব্যভিচারী ভাবসমূহ হইতেছে *নির্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি*, সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতি।[225]

জয়গোপাল গোস্বামীর শান্তরস বিশ্লেষণে কি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না? *সাহিত্যদর্পণঃ* আরও অনুপুঙ্খভাবে অনুসৃত হয়েছিল উনিশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আরেকটি গ্রন্থ, লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়ে*—

> শান্তরসে শম স্থায়িভাব; ইহা উত্তম প্রকৃতিতে বর্ণনীয়; অনিত্যতাদিহেতুক পদার্থের নিঃসারত্বজ্ঞান এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান এই উভয় ইহাতে আলম্বন-বিভাব, পুণ্যাশ্রম, মহাপুরুষ ও তীর্থাদির দর্শন সত্যনিষ্ঠা উদ্দীপনবিভাব, রোমাঞ্চাদি কার্য্য অনুভাব; নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারীভাব।[226]

শান্তরসের পরিচয়, আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব— এই সব সংজ্ঞার ক্ষেত্রে *কাব্যনির্ণয়*-কে হুবহু *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অনুবাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। শান্তরসের সঙ্গে দানবীর (দান বিষয়ে উৎসাহ, দান-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি রক্ষার

---

[225] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩), ১৭২। [নজরটান আরোপিত]

[226] লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, *কাব্যনির্ণয়। বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: কাশীনাথ ভত্তাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), ৫৬-৫৭।

জন্য প্রিয়জনকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারেন এমন), দয়াবীর (পরদুঃখে কাতর হয়ে যিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন) এবং ধর্মবীর (পুণ্যসঞ্চয় দ্বারা পরকালে সুখী হতে উৎসাহী ব্যক্তি)— এই তিনটির পার্থক্যও *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থে দেখনো হয়েছে। বলা হয়েছে—

> অহঙ্কার ও কীর্ত্তি-লাভ-বাসনা-বিরহিত বলিয়া শান্তরস; দানবীর, ধর্ম্মবীর ও দয়াবীর হইতে পৃথক্। তবে যদি সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার বিরহিত হয় তাহা হইলে দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর ও দেববিষয়িনী রতি প্রভৃতি শান্তরসের যোগ্য হইতে পারে।[227]

শান্তের সঙ্গে দানবীর, দয়াবীর ও দেবাদিবিষয়ক রতির পার্থক্য দেখানো হয়েছিল *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও। শান্তরস সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> নিরহঙ্কারত্ব বশতঃ ইহা দয়াবীর ইত্যাদি হয় না। ...যদি দয়াবীর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কাররাহিত্য লাভ করে, তাহা হইতে তাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হইতে পারে।
>
> 'আদি'– শব্দে ধর্ম্মবীর, দানবীর, দেবতাবিষয়ক রতি প্রভৃতি (বুঝিতে হইবে)।[228]

সুতরাং, দয়াবীর, দানবীর প্রভৃতির সঙ্গে শান্তরসের পার্থক্যনির্দেশের এই রীতিও *সাহিত্যদর্পণঃ*-ধারারই উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে। *সাহিত্যদর্পণঃ-এ* শান্তরসের বিবরণে উল্লেখ করা হয়—

---

[227] ভট্টাচার্য্য, *কাব্যনির্ণয়*, ১০৭-৮।

[228] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১৭৪-৭৫।

> যেখানে কোন দুঃখ নাই, সুখ নাই, চিন্তা নাই, দ্বেষরাগ নাই, কোনও ইচ্ছা নাই, সর্বভাবেই সমজ্ঞান বিদ্যমান, মুনীন্দ্র কর্ত্তৃক তাহা শান্তিরসরূপে কথিত হইয়াছে।[229]

এরই অনুপুঙ্খ অনুসরণ করে *কাব্যনির্ণয়*-এ বলা হয়েছে—

> যেখানে সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা থাকে না এবং শম প্রধান হয়, তথায় শান্তরস বলে।[230]

তাহলে দেখা গেল, উনিশ শতকে কাব্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শান্তরসের যে উল্লেখ, তা তাত্ত্বিক জটিলতাবর্জিত এবং *সাহিত্যদর্পণঃ*-অনুসারী। উনিশ শতকের তাত্ত্বিকদের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতি এই নির্ভরতার দিকটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে *সাহিত্যদর্পণঃ*-সংক্রান্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। উনিশ শতকের সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনায় শান্তরস কীভাবে ধরা দিয়েছে, তা পরবর্তী অংশে দেখে নেওয়া হবে।

৫.৬.২ সাহিত্য-সমালোচনায় শান্তরস

উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় শান্তরসের উল্লেখ বিরল নয়। তবে, এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্তরসের উল্লেখমাত্রই পাওয়া যায়, তাদের কোনও গভীরতর তাত্ত্বিক তাৎপর্য পাওয়া যায় না বললেই চলে। পূর্ণচন্দ্র বসু অবশ্য তাঁর *সাহিত্য-চিন্তা* গ্রন্থে ট্র্যাজেডিতে ধর্ম্মভাবের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শান্তরসের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে চলে গেছেন। তাঁর মতে—

> ট্র্যাজিডি পাপছবির ঘোর অন্ধকারে ধর্ম্মের একটু জ্যোৎস্না ফুটাইতে চাহে। কিন্তু ধর্ম্মের সম্যক্ ছবি ও তেজ তাহাতে দেখা যায় না। ...ভয়ানকই তাহার প্রধান রস, করুণা তাহার পরিণাম। সেই রসে ধর্ম্ম যত দূর ফুটে, তত দূর পর্য্যন্তই তাহার সীমা। সে সীমা অতিক্রম

---

[229] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ১৭৪।

[230] ভট্টাচার্য্য, *কাব্যনির্ণয়,* ৫৭।

> করিয়া ধৰ্ম্মকে অধিকতর ফুটাইতে গেলে শান্তিরসের আবির্ভাব ঘটে; আর ট্র্যাজিক রস থাকে না। এ জন্য ট্র্যাজিডি শান্তিরসকে প্রবল করিতে পারে না।[231]

এখানে ট্র্যাজেডি ও শান্তরসের পরস্পরবিরোধিতার দিকটি তুলে ধরে ট্র্যাজেডিতে শান্তরসের অনুপস্থিতির কারণ তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। কিন্তু শান্তরস সম্বন্ধে কার্যকারণ-পরম্পরা সমন্বিত এ জাতীয় বিশ্লেষণ বেশ দুর্লভ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শান্তরসের প্রসঙ্গ এসেছে বিবৃতিধর্মিতার মধ্য দিয়ে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে উল্লেখ করা হল—

- রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হয় তবে রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী একখানি চমৎকার কাব্য। ...সে কাব্য শান্তি-রসের প্রস্রবণ...। রামপ্রসাদের এই সাত্ত্বিকভক্তি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর লাগে। তাহার শান্তরসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। [232]

- রসরঙ্গিনী সৌন্দর্যাভিলাষিনী, রূপ-বিমুগ্ধা শান্তরস; ...শান্তরস জড় জগতের শান্তি সৌন্দর্যে প্রথমত আকৃষ্ট হইয়া শেষে জগতপতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়।[233]

- যেরূপে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নানাবিধ দুরবস্থায় দলে দলে পদ্মফুলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং এক মহান্ ধৰ্ম্মাদর্শের সৃষ্টি হইয়া শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যেমন আর্য্যসাহিত্যের অন্তর্গত মহাকাব্যের প্রকাণ্ড প্রসারে সম্ভাবিত হইয়াছে এমত আর কিছুতেই হয় নাই। ...[রাম প্রভৃতি] তাঁহাদের সেই

---

[231] পূর্ণচন্দ্র বসু, "সাহিত্যের আদর্শ: সাহিত্যে রসের ক্ষেত্র," *সাহিত্য-চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ২৪।

[232] পূর্ণচন্দ্র বসু, "কাব্য— রামপ্রসাদে: প্রসাদী কবিত্ব," *কাব্য-চিন্তা* (কলিকাতা: ডন্ প্রেস, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ), ১৫৪-৫৬।

[233] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা– কবিতামালা। গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত," *নব্যভারত* ১৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ): ৪৪৭।

সমগ্রকল্পনাবিস্তৃত চরিত্র দর্শনে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাঠকের মনে এত শান্তরসের সঞ্চার হয় যে, তাহাতে অনুকম্পা আর স্থান পায় না।[234]

- আর্য্য সাহিত্যের ইষ্টার্থ বা অধ্যয়নফল এতই সুন্দর, এতই উৎকৃষ্ট, এতই শান্তরসপরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।... শান্তিরস প্রবল হইয়াছে— আর্য্যসাহিত্যে নাটকে ও মহাকাব্যে। [235]

- "শান্তকাব্যানি" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি অশ্লীলতাদুষ্ট নহে, তথাপি সম্ভবতঃ শান্তরসোদ্দীপক হয় নাই... [236]

এছাড়া আরও বিভিন্ন উৎস থেকে শান্তরসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সেইসব ক্ষেত্রে শান্তরসের নিজস্ব কোনও তাৎপর্য নেই। শান্তরস সেখানে এসেছে একাধিক রসের অনুষঙ্গে, নানা রসের সম্মিলিত উল্লেখের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। যেমন—

- সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণনা তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন।[237]
- কেহ কেহ বলেন যে ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক; মধ্য দেশে শান্ত, করুণ, আদি ও পশ্চাদ্ভাগে অদ্ভুত, হাস্য ও বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়।[238]

---

[234] বসু, *সাহিত্য-চিন্তা*, ২৩।

[235] বসু, *সাহিত্য-চিন্তা*, ৩, ২৪।

[236] অজ্ঞাত, "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা – কাব্যপেটিকা। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্ক চূড়ামণি প্রণীত," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৯৩।

[237] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব," *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১* (কলকাতা: দে'জ, ২০২০), ৩৯৭।

[238] শ্রী অঃ, "তুলনায় সমালোচন –ভারতচন্দ্র রায়," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ): ৩৭।

- সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে রস নয়টি। আদি, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীবিষয়ক রতি আদিরসের স্থায়ীভাব, হাস হাস্যরসের স্থায়ী ভাব, শোক করুণরসের... এবং নির্ব্বেদ শান্তরসের স্থায়ীভাব।[239]
- এই নিমিত্ত তিনি রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রস সকলের বর্ণনা করিতে পারেন না।[240]
- বিভিন্ন রসোদ্রেকে কবির নিপুণতার দৃষ্টান্ত "বীরাঙ্গনা"য় অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, যদিও কাব্যখানি প্রধানতঃ আদিরসঘটিত, তথাপি শকুন্তলা, রুক্মিণী ও দ্রৌপদীর পত্রে আদিরসের, গঙ্গার পত্রে শান্তরসের, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আদিমিশ্রিত রৌদ্ররসের, কৈকেয়ী ও জনার পত্র ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণরসের বেশ স্ফূর্তি পাইয়াছে।[241]
- শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, প্রায় সকল রসেই এই কবি [বিহারীলাল চক্রবর্তী] সৌন্দর্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছেন।[242]

শান্তরস এভাবেই উনিশ শতকীয় আলোচনাবৃত্তে তার চিহ্ন রেখে গেছে। প্রাচীন ভারতে শান্তকে নিয়ে যে তাত্ত্বিক দোলাচল, উনিশ শতকের বাংলায় অবশ্য তার ছাপ তেমন পাওয়া যায় না। শান্তরস উনিশ শতকের সাহিত্যবোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তর্ক বা বাদানুবাদের জন্ম দেয়নি ঠিকই, তবে তাঁদের পাঠ-অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে একেবারে লুপ্তও হয়নি এই রস।

এইভাবেই একাধিক রস উঠে এসেছে উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের সাহিত্য-সমালোচনার পরিধিতে। বীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস আদৃত হয়েছে উনিশ শতকের সমাজ-

---

[239] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭১।

[240] অজ্ঞাত, "কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল," *ভারতী* ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।

[241] বীরেশ্বর গোস্বামী, "বীরাঙ্গনা কাব্য (উপসংহার)," *নব্যভারত* ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ): ৩৬২।

[242] অজ্ঞাত, "এক অপরিজ্ঞাত কবি," *নব্যভারত* ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ২১৮।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটজনিত কারণে। শৃঙ্গার, করুণ, বীভৎস— প্রভৃতি রসও একেবারে উপেক্ষিত থাকেনি। এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে সমস্ত রসের আলোচনাই ঠাঁই পেয়েছে। তাই ‘রসবাদের উল্লেখও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় দেখা যায় না’— এই মত গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে হয়। বরং অলংকারবাদ, রীতিবাদ, গুণবাদ, ধ্বনিবাদকে ছাপিয়ে যে তত্ত্বপ্রস্থান উনিশ শতকের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা হল রসবাদ। যুগের দাবিতে কোনও রস হয়তো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, কোনও রস কম। কিন্তু প্রধানত রসতত্ত্বের আলোতেই আলোকিত হয়েছে উনিশ শতকের কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা-পরিসর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা

ষষ্ঠ অধ্যায়

উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনার সূচনা কবে কীভাবে হয়েছিল তার কোনও সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক দলিল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞান হিসেবে যে বইটি সর্বজনমান্যতা পেয়ে এসেছে, ভরতের সেই গ্রন্থটি কিন্তু মূলগতভাবে নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের আদিরূপের সঙ্গে নাট্যতত্ত্বের এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও 'নাট্যতত্ত্ব' এবং 'কাব্যতত্ত্ব'— এ দুই ক্ষেত্র পরস্পর সম্পৃক্ত, নাকি দুটি আলোচনার পরিধি সম্পূর্ণ পৃথক— এই বিষয়টি সুদীর্ঘকাল বিতর্কের আওতায় থেকে গেছে।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* প্রধানত নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এখানে সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক সাধারণ কিছু আলোচনাও স্থান পেয়েছে। *নাট্যশাস্ত্রে*-র ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় 'রসবিকল্প' ও 'ভাবব্যঞ্জক'-কে ভারতীয় রসবাদের ভিত্তিভূমি বলে ধরা হয়। 'বাগভিনয়' শীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায়ে শুধু নাটক নয়, সামগ্রিকভাবে কাব্যের দোষ, গুণ ও অলংকারের আলোচনা আছে। নাট্যতত্ত্ব-প্রধান আরেকটি গ্রন্থ ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর চতুর্থ প্রকাশেও ঠাঁই পেয়েছে সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক বিশ্লেষণ।

উল্টোদিকে বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ* মূলত কাব্যতত্ত্বের বই। তা সত্ত্বেও এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা।

ভামহ, দণ্ডী এবং বামন নাটককে কাব্যেরই একটি শাখারূপে বিবেচনা করেছেন। নাট্যতত্ত্বকে কোনও পৃথক ধারা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি তাঁরা। এ কথা ঠিকই যে, ভামহ বা বামনের সময়কাল থেকেই সংস্কৃত তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরে নাট্যতত্ত্ব তার

মৌলিকতার ক্ষেত্রটি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল। মিশে যাচ্ছিল কাব্যতত্ত্বের সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে। নাট্যতত্ত্বকে কাব্যতত্ত্বেরই একটি উপবিভাগ বা শাখা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল। সুশীল কুমার দে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Dramaturgy is taken as a part of the discipline of Poetics…"[1] কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বচর্চার প্রাক্‌লগ্নে কাব্যতত্ত্বের ছায়া থেকে সরে স্বতন্ত্র এক অস্তিত্বের দাবি জানিয়েছিল নাট্যতত্ত্ব। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* এবং ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর মতো বইয়ের উপস্থিতিই তা বুঝিয়ে দেয়। সুশীল কুমার দে-র মতে—

> ...the school of Dramaturgy had an existence separate from the orthodox school of Poetics. …there are reasons to believe that in older times *Dramaturgy and Poetics formed separate disciplines, the former being probably the earlier in the point of time, as well as in substance.*[2]

নাটক প্রধানত অভিনয়-নির্ভর Performing Art। কিন্তু নাটকের লিখিত টেক্সট সাহিত্যতত্ত্বের আওতার বাইরে নয়। তাই এই অভিসন্দর্ভে উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত ভাবনার পাশাপাশি যা পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির মনোভঙ্গি। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হলে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের সমালোচক, লেখক ও নাট্যনির্মাতারা? সেই সম্পর্কিত আলোচনা এবং বিশ্লেষণই এই অধ্যায়ের মূল অভীষ্ট।

---

[1] S. K. De, *History of Sanskrit Poetics Vol. II* (London: Luzac & CO., 1925), 2.

[2] De, *History of Sanskrit Poetics*, 2. [নজরটান আরোপিত]

৬.১ উনিশ শতকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিন সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিক: ভরত, ধনঞ্জয় এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ

> Three works stand pre-eminent in the treatment of dramaturgy in Sanskrit viz. *ভরতনাট্যশাস্ত্র*, *দশরূপ* (with *অবলোক*) and the *সাহিত্য-দর্পণ*।[3]

এভাবেই পি ভি কানে *History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থ হিসেবে ভরত, ধনঞ্জয় এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের গ্রন্থকে চিহ্নিত করেছেন। তাই উনিশ শতকের বাঙালি কীভাবে পাঠ ও প্রয়োগ করেছিল সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বকে তা বুঝে নিতে গেলে, আগে দেখে নেওয়া প্রয়োজন এই তিন তাত্ত্বিকের রচনা কীভাবে গৃহীত হয়েছিল বাঙালির সমালোচনা-ভুবনে।

৬.১.১ *দশরূপ* (ধনঞ্জয়)

ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর টীকা *দশরূপাবলোক*-এর রচয়িতা ধনিক। ধনিকের পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ধনিক এবং ধনঞ্জয় একই ব্যক্তি। কেউ বলেন তিনি ধনঞ্জয়ের ভাই ছিলেন। ধনঞ্জয় ও ধনিক একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা— এই বিতর্কের উল্লেখ পাওয়া যায় সতীশচন্দ্র রায়ের 'রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ' প্রবন্ধে। *সাহিত্য* পত্রিকার অষ্টম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* ও তার টীকা *দশরূপাবলোক* উভয়েরই উল্লেখ আছে—

> বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয় পণ্ডিত যে মুঞ্জরাজার সভাপণ্ডিত থাকিয়া দশরূপক নামের অলঙ্কার গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না; কেন না, তিনি দশরূপের শেষে "বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন" ইত্যাদি শ্লোকে আত্মপরিচয়

---

[3] P. V Kane, *History of Sanskrit Poetics* (Delhi: Motilal Banarasidas Publishers, 1971), 244.

> দিয়াছেন। কিন্তু দশরূপের বৃত্তি অংশ, যাহা 'দশরূপাবলোক' বলিয়া খ্যাত...। এখন সকলের মনেই এই সন্দেহ উদিত হইতে পারে যে, "দশরূপ"-গ্রন্থকার ধনঞ্জয় ও "দশরূপাবলোক"-কার ধনিক, একই ব্যক্তি কি না?[4]

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী আবার ধনিককে *দশরূপ*-এর টীকাকার বলে চিহ্নিত করেননি। তাঁর মতে, বিষ্ণুর দুই পুত্র— ধনিক ও দণ্ডিক। এর মধ্যে দণ্ডিকই *দশরূপ*-এর ভাষ্য রচনা করেন।[5]

ধনঞ্জয় ও ধনিক উভয়ের সময়কাল, ধনঞ্জয় ও ধনিক একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা— এসব প্রশ্নই উনিশ শতকের *দশরূপ*-সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রীয় পটভূমি নির্মাণ করেছিল। তবে উনিশ শতকীয় বাঙালির ধনঞ্জয়-চর্চা মুখ্যত এই জাতীয় বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ ছিল। ধনঞ্জয়ের *দশরূপ* উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে তেমন গুরুত্ব পায়নি বলেই আপাতভাবে মনে হয়।

অথচ নাট্যতত্ত্বের বই হিসেবে *দশরূপ* একসময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। E.F. Hall তাঁর সম্পাদিত *দশরূপ*-এর ভূমিকায় বলেছেন—

> Although but moderate in antiquity, the Dasa-rupa has long been the favourite authority, among the Hindus, for everything connected with the theatre, and it has not been

---

[4] সতীশচন্দ্র রায়, "রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ," *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন* ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ৭৪৩।

[5] "দশরূপক" গ্রন্থ-প্রণেতা ধনঞ্জয় দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকে লিখিত আছে, তিনি মুঞ্জের সভায় অধিষ্ঠানকালে ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুঞ্জ বোধ হয় প্রসিদ্ধ ধাররাজ ভোজের পিতৃব্য। দণ্ডিক দশরূপকের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। দণ্ডিক ও ধনিক উভয়েরই পিতার নাম বিষ্ণু। ধনিক রাজশেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব তিনি দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে জন্ম গ্রহণ করেন। [উৎস: শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, "অলঙ্কারশাস্ত্র," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১৮৯।]

> superseded by any more modern performance of similar character.[6]

স্বয়ং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অন্তর্গত নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রধানত ধনঞ্জয়-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও উনিশ শতকে নাটক বিষয়ে বা রসতত্ত্ব বিষয়ে ধনঞ্জয়ের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিঋদ্ধ তেমন কোনও বিস্তারিত আলোচনা চোখে পড়ে না।

অবশ্য গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার দাবি মেনে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার আগে দ্রুত এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যাওয়া যায় না যে, উনিশ শতকে ধনঞ্জয় একেবারেই উপেক্ষিত ছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ধনিকের টীকা সহ ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল Dr. E.F. Hall-এর উদ্যোগে[7]। এই গ্রন্থপ্রকাশ উনিশ শতকের সময়পরিধিতে ধনঞ্জয়ের তত্ত্বপ্রস্থানকে জেনে নেওয়ার আগ্রহেরই সূচক— এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন— বিরাশিটি সংস্কৃত নাটকের নাম পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে তেত্রিশটি পূর্ণ গ্রন্থাকারে পাওয়া গেছে। অন্যগুলির নাম পাওয়া যায় *দশরূপ* এবং *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ[8]। আবার যোগীন্দ্রনাথ বসু 'ভবভূতি' প্রবন্ধে *বাল-রামায়ণ*-এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে যখন বলেন, "ইহা হইতে সমুদ্ধৃত শ্লোকসমূহ প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ দশরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে"[9], তখন তিনি যে *দশরূপ*-এর টেক্সট সম্পর্কে অনুপুঙ্খ ধারণার অধিকারী

---

[6] E. F. Hall ed, "Preface," in *Dasarupam by Dhanabjaya: With Dhanika's Commentary* (Calcutta: The Asiatic Society, 1989), 1.

[7] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩১৮।

[8] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১২১।

[9] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "ভবভূতি," *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ): ৫১৩।

ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশের প্রথম ও তৃতীয় বর্ষে 'শ্রীহর্ষ' শীর্ষক রচনায় রামদাস সেন এবং তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় *রত্নাবলী* রচয়িতা হর্ষের পরিচয় নিয়ে পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করেছিলেন। *দশরূপ* গ্রন্থে *রত্নাবলী* থেকে যে সব উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছিল, তাঁদের দুজনের লেখনীতেই সেই প্রসঙ্গ এসেছে।

রামদাস সেন জানিয়েছিলেন ধনঞ্জয় *দশরূপ* গ্রন্থে *রত্নাবলী* এবং *নাগানন্দ* থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন[10]। রামদাস সেনের এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয় অবশ্য ধনঞ্জয় বা *দশরূপ* ছিল না। ছিল শ্রীহর্ষের পরিচয় ও সময়কাল সংক্রান্ত বিতর্ক। এই বিষয়ে *বঙ্গদর্শন*-এর পাতায় রামদাস সেনের যে মত প্রকাশিত হয়েছিল তার বিরোধিতা করেই বছরদুয়েক পরে *বঙ্গদর্শনে* 'শ্রী রাজ' নামে প্রবন্ধ লেখেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনিও ধনঞ্জয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা রামদাস সেনের ধনঞ্জয় সংক্রান্ত মন্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়—

> ...আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপক
> নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[11]

কেবল *নাগানন্দ* বা *রত্নাবলী* থেকে উদ্ধৃতি নয়, *দশরূপ*-এ যে রাজশেখরের নামও উল্লিখিত হয়েছে, সেই তথ্যের হদিশ *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাকবি রাজশেখর'

---

[10] মালবেশ্বর মুঞ্জের সভাসদ ধনঞ্জয় কৃত "দশরূপ" এবং ভোজদেব প্রণীত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। [উৎস: রামদাস সেন, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৫৮৪।]

[11] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ১৮।

প্রবন্ধে পাওয়া যায়[12]। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীও জানিয়েছেন ধনিকের রচনায় রাজশেখরের নাম আছে[13]।

অর্থাৎ রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রমুখের লেখাগুলি পড়লে বোঝা যায় ধনঞ্জয়ের কেবল সময়কাল এবং পরিচয়ই উনিশ শতকের বাঙালির মনোযোগের একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল না। কারণ, ধনঞ্জয় কোন কোন গ্রন্থ থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, কোন কোন আলংকারিকের নামোল্লেখ করেছেন, *দশরূপ*-এর অনুপুঙ্খ পাঠ ব্যতীত উনিশ শতকের সমালোচকদের তা নিশ্চয়ই জানা সম্ভব ছিল না!

সুতরাং গুরুত্বের দিক দিয়ে উনিশ শতকে *দশরূপ* একেবারে উপেক্ষিত ছিল না। ধনঞ্জয়ের ইতিবাচক দিক ছিল তার আয়তনগত পরিমিতি এবং গঠনগত সাবলীলতা। তিনি *দশরূপ*-এ প্রকৃতপক্ষে ভরতের নাট্যতত্ত্বেরই পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করেছিলেন। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* নাট্যতত্ত্বের সবচেয়ে বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ বিবৃতি হলেও একে আত্মস্থ করার প্রধান অন্তরায় ছিল এর জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা। এই নেতিবাচক দিকটি অন্তত আংশিকভাবে দূর করেছিল *দশরূপ*। কেইথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> It was inevitable that the *complicated and confused work of Bharata* should be superseded for many purposes by *something more accessible and easy to follow*, and this need was supplied by the Daçarupa of Dhanamjaya, son of Visnu...[14]

---

[12] রাজশেখরের নাম যে সব অলংকার-গ্রন্থে উল্লিখিত তার তালিকায় ধনঞ্জয়ের ‘দশরূপ’-এর উল্লেখ আছে। [উৎস: রামদাস সেন, “মহাকবি রাজশেখর,” *ভারতী ও বালক* ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ৪৭।]

[13] শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, “অলঙ্কারশাস্ত্র,” *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩য় সংখ্যা (কার্ত্তিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দ), ১৮৯।

[14] A. B Keith, *The Sanskrit Drama in its Origin, Development: Theory and Practice* (London: Oxford University Press, 1924), 292-93. [নজরটান আরোপিত]

এইসব কারণেই উনিশ শতকের লেখালিখিতে আপাত অনুপস্থিতি বা স্বল্প-উপস্থিতি সত্ত্বেও তার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেনি *দশরূপ*। রামদাস সেন বা শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁদের গভীর অভিনিবেশ ও অধ্যয়নের বাইরে রাখতে পারেননি ধনঞ্জয়কে।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের অন্তর্গত যে যে রচনায় ধনঞ্জয়ের উল্লেখ পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

ক্রমিক সংখ্যা	লেখক	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল (বঙ্গাব্দ)
১	রামদাস সেন	**শ্রীহর্ষ**	*বঙ্গদর্শন*	১২৭৯
২	শ্রীরাজ	**শ্রীহর্ষ**	*বঙ্গদর্শন*	১২৮১
৩	রামদাস সেন	**মহাকবি রাজশেখর**	*ভারতী*	১২৯৪
৪	সতীশচন্দ্র রায়	**রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ**	*সাহিত্য*	১৩০৪
৫	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	**অলঙ্কার-শাস্ত্র**	*সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা*	১৩০৬

৬.১.২ *নাট্যশাস্ত্র* (ভরত) এবং *সাহিত্যদর্পণঃ* (বিশ্বনাথ কবিরাজ)

আচার্য ভরত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের জনক হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় রসতত্ত্ব-বিষয়ক যে সব বই পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে স্বীকৃত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*। উনিশ শতকের নাটক-বিষয়ক আলোচনায় *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রভাব কতদূর, এই অংশে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা থাকবে।

৬.১.২.১ প্রসঙ্গ: নাটকের শ্রেণিবিভাগ

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর বিংশ অধ্যায়ে রূপক অর্থাৎ নাট্যগ্রন্থের দশটি শ্রেণিবিভাগ এবং দু-ধরনের উপরূপকের উল্লেখ করা হয়েছে। রূপকের দশটি ভেদ হল— নাটক, প্রকরণ, অংক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথি, প্রহসন, ডিম এবং ঈহামৃগ[15]। এছাড়া 'নাটিকা'র উল্লেখ পাওয়া যায় যার নাট্যবস্তু "হবে উদ্ভাবিত, নায়ক রাজা" এবং যা "অন্তঃপুর বা সঙ্গীত সংক্রান্ত ব্যাপার অবলম্বনে রচিত[16]।"

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত 'নাটক পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধে দশপ্রকার রূপকের উল্লেখ পাওয়া যায়[17]। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য', দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য নামে রচিত 'কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা' এবং জটিল সন্ন্যাসী ছদ্মনামে প্রকাশিত 'নাটক-চন্দ্রিকা'— এই তিন প্রবন্ধেই রূপকের দশটি ভাগের কথা আছে। কিন্তু যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, এই প্রাবন্ধিকদের মতে উপরূপকের সংখ্যা আঠারো। তিনটি প্রবন্ধেই এই আঠারোটি ভাগের উল্লেখ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা আছে—

---

[15] নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ।।
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে। (শ্লোক ২-৩)
[উৎস: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিংশ অধ্যায়: দশরূপবিধান," *ভরত নাট্যশাস্ত্র*- তৃতীয় খণ্ড, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ১৯।]

[16] প্রকরণনাটকভেদাদুৎপন্নং বস্তু নায়কো নৃপতিঃ
অন্তঃপুরসঙ্গীতকবার্তামধিকৃত্য কর্তব্যা।।
[উৎস: সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিংশ অধ্যায়: দশরূপবিধান," *ভরত নাট্যশাস্ত্র*- তৃতীয় খণ্ড, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ২৯।]

[17] অজ্ঞাত, "নাটক-পরিচ্ছেদ," *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৮৩।

- দৃশ্যকাব্য আবার, রূপক ও উপরূপক ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রূপক আবার দশবিধ; + যথা নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যয়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন। উপরূপকের আবার অষ্টাদশদশবিধ বিভাগ আছে।[18]

- মুনিবর ভরত দশবিধ নাটকের সূত্র করিয়াছেন। যথা– নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন। এই দশবিধ নাটকের আর একটী নাম রূপক। রূপকের ন্যায় মুনিবর অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের কথা লেখেন। ... এক্ষণে কেবল রূপকের বিষয় লিখিত হইতেছে। ভারত-বর্ষে এই অষ্টবিংশতি প্রকার দৃশ্যকাব্য পূর্ব্বে পাওয়া যাইত।[19]

- দৃশ্য কাব্য নাটক প্রকরণ প্রভৃতি দশপ্রকার রূপক। আর নাটিকা ত্রোটকপ্রভৃতি অষ্টাদশপ্রকার উপরূপক। সমুদায় অষ্টাবিংশতিবিধ।[20]

এই সূত্রেই *বঙ্গদর্শন*-এ 'নাটক-পরিচ্ছেদ'-এর প্রকাশের দু-বছর আগে প্রকাশিত আরেকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে হয়। রামদাস সেন রচিত 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়'। সেখানে লেখক বললেন—

> আলঙ্কারিকেরা নাটক দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, যথা রূপক ও উপরূপক। রূপক দশ ও উপরূপক অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত।[21]

---

[18] হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, "প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য," *ভারতী ও বালক* ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৮৭।

[19] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮২।

[20] দিনাজপুর নিবাসী ভট্টাচার্য্য, "কাব্যের স্বরূপ এবং উপযোগিতা," *আর্য্যদর্শন* ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৪০৫।

[21] রামদাস সেন, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮০ বঙ্গাব্দ): ১৫২।

এই ভাগগুলি নিয়ে আলোচনার সময়ে রামদাস সেন রূপকের দশটি (নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিমা, ইহমৃগ, অঙ্ক, বীথ্য, প্রহসন) ও উপরূপকের আঠারোটি (নাটিকা বা প্রকরণিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশা, ভাণিকা) শ্রেণির কথা লিখেছেন।

এখন প্রশ্ন হল— রূপকের দশপ্রকার বিভাজন ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-তেই পাওয়া যায়। কিন্তু উপরূপকের আঠারোটি ভাগ-এর[22] উল্লেখ *নাট্যশাস্ত্র*-এ পাওয়া যায় না।

আসলে রামদাস সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা এই বিভাজনটি পেয়েছেন পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে। পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত বইয়ের মধ্যে *সাহিত্যদর্পণঃ, নাট্যলক্ষণ রত্নকোশ, ভাবপ্রকাশ, অভিনয়দর্পণ, সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত দামোদর, নাট্যশাস্ত্র সংগ্রহ, নাট্যদর্পণ*[23] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছেন বিনা প্রশ্নে।[24] তবে এই বইগুলির

---

[22] নাটিকা বা প্রকরণিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশা এবং ভাণিকা।

[23] গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, "ভাষা: সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে," *ভরত নাট্যশাস্ত্র- তৃতীয় খণ্ড*, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ৩২৪।

[24] দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। যেমন, *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'নাটক-পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধে রূপকের দশটি ভাগকে পুরোপুরি স্বীকার না করে বাংলা নাটকের তিনটি ভাগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নাটক, প্রহসন এবং মাস্ক। [উৎস: অজ্ঞাত, "নাটক-পরিচ্ছেদ," *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৮২]

আবার, *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় 'জটিল সন্ন্যাসী' 'নাটক-চন্দ্রিকা' প্রবন্ধে বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব থেকে আহৃত এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল শ্রেণিবিভাগের অসারতা বর্ণনা করেছেন। রূপক-উপরূপকের এতগুলি ভাগকে কার্যত নস্যাৎ করেছেন তিনি।

> এই সমস্ত রূপক ও উপরূপককে নাটক বলিলে, কোন রূপ অসুবিধা হইত বলিয়া বোধ হয় না। যদি সহস্র প্রকার নাটক থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা, প্রণালী, উপাখ্যান, নায়ক চরিত

মধ্যে *সাহিত্যদর্পণঃ*-ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' প্রবন্ধের সাহিত্যতাত্ত্বিক ভিত্তি মোটের ওপর *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ওপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উল্লিখিত নাট্যের শ্রেণিভেদ সম্পূর্ণভাবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই অনুসারী। শুধু তাই নয়, *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে নাটকের ভেদসংক্রান্ত দীর্ঘ শ্লোকগুচ্ছও (শ্লোকসংখ্যা ৩-৬)[25] উদ্ধৃত করেছিলেন রামদাস সেন[26]। রূপক ও উপরূপকের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর দীর্ঘ শ্লোকগুচ্ছ উদ্ধৃত করার প্রবণতা[27] আসলে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতি লেখকদের নির্ভরতা স্পষ্ট করে দেয়।

> ও নায়িকার ভাব অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ হইবে, সন্দেহ নাই। এখন এক জন আলঙ্কারিক বাহির হইয়া, ঐ সহস্র প্রকার নাটকের গবৃতি, কবৃ্যতি, হাম্বীর, শঙ্খ, রঙ্গপট্ট, পটমঞ্জরী ও জয়াজয়ন্তী প্রভৃতি হাজার প্রকার নাম দেন ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করেন, আর দেশীয় সভ্যগণ যদি 'আমাদের দেশে সহস্রপ্রকার রূপক ও দুই সহস্র প্রকার উপরূপক আছে বলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচেন, তাহা হইলে ঐ সভ্যগণের বুদ্ধিমত্তা যে কিরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। [উৎস: জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," ১৮৮।]

[25] বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮), ২৩৯-৪০।

[26] যথা সাহিত্যদর্পণ –

> নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
> ঈহামৃগাঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ।।
> নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকং।
> প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খণং রাসকং তথা।।
> সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পকঞ্চ (শিল্পিকং) বিলাসিকা।
> দুর্ম্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশোভাণিকেতি চ।।
> অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।
> বিনা বিশেষং সর্ব্বেষাং লক্ষ্ম নাটকবন্মতং।।

[উৎস: সেন, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়," ১৫২।]

[27] সেন, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়," ১৫২।

আবার নাটকে সংগীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে রামদাস সেন কাব্যের দুটি ভাগের কথা উল্লেখ করেন। শ্রব্য এবং দৃশ্য। এর মধ্যে দৃশ্যকাব্যই হল নাটক। তবে এখানেও তাঁর পথপ্রদর্শক *নাট্যশাস্ত্র* নয়, *সাহিত্যদর্পণঃ*।

> সঙ্গীত দ্বিবিধ, দৃশ্য এবং শ্রাব্য যথা "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" ইহার মধ্যে গীত এবং বাদ্য শ্রাব্য, ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীতমধ্যে পরিগণিত। এইরূপ কাব্যও দ্বিবিধ *যথা সাহিত্যদর্পণে "দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। দৃশ্যং তত্রাভিনয়ং তৎ।*"[28]

এই শ্লোকটি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'দৃশ্যশ্রব্যকাব্যনিরূপণ'-এর প্রথম শ্লোক[29]। এই একই শ্লোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায় পূর্ণচন্দ্র বসুর *সাহিত্য-চিন্তা* গ্রন্থে, *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার পাতায়। 'সাহিত্যে খুন' বিষয়ের 'খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মত' অংশে পূর্ণচন্দ্র বসু লেখেন—

> সকলেই, বোধ হয়, জানেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন - *শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য*। যাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে, এবং যাহার সেই পর্য্যন্তই শেষ নহে, যাহাকে অভিনয়ে পরিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্য্যে এবং ব্যবহারে আবার প্রতিফলিত এবং দশ জনের চক্ষুর সমক্ষে প্রদর্শিত করা হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। দৃশ্য-কাব্যের অন্যতর নাম রূপক- যাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত করে, তাহাই রূপক।[30]

---

[28] সেন, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়," ১৫০।

[29] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ৩৬৫।

[30] পূর্ণচন্দ্র বসু, "খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মত," 'সাহিত্যে খুন,' *সাহিত্য চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ৩০। [নজরটান আরোপিত]

অন্যদিকে *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার প্রথম বর্ষে 'দৃশ্যকাব্য বা নাটক' প্রবন্ধেও *সাহিত্যদর্পণঃ*-কথিত এই শ্রেণিবিভাগের সন্ধান মেলে—

> আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য কাব্য, এবং শ্রব্য কাব্য। ...সোজাসুজি বলিতে গেলে যাহা শুনিতে হয় তাহাই শ্রব্য কাব্য, যাহা দেখিতে হয় তাহাই দৃশ্য কাব্য।[31]

একইরকমভাবে হৃষীকেশ শাস্ত্রী 'মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধে বললেন, "সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্য সকলকে প্রথমে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছেন; শ্রব্য এবং দৃশ্য।"[32] প্রসঙ্গক্রমে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য' প্রবন্ধটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানেও কাব্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে "কাব্য সমূহ সাধারণত দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই ভাগে বিভক্ত।"[33] এর উৎস হিসেবে যদিও 'মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্য শাস্ত্রের নিয়ম' এবং 'প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে'র (বহুবচনাত্মক নির্দেশক 'দিগের'-এর ব্যবহার লক্ষণীয়) উল্লেখ করা হয়েছিল, পৃষ্ঠার ফুটনোটে তথ্যসূত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে কিন্তু ফিরে এল সেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই শ্লোক[34], ভরত বা অন্য কোনও আলংকারিকের লেখা নয়। কেবল এই ভাগটুকুই নয়, দৃশ্যকাব্যের উপবিভাগগুলি[35]

---

[31] অজ্ঞাত, "দৃশ্যকাব্য বা নাটক," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ৭৩।

[32] হৃষীকেশ শাস্ত্রী, "মৃচ্ছকটিক," *বিভা* ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দ): ২৭২।

[33] হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, "প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য," *ভারতী ও বালক* ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ৮৭।

[34] * দৃশ্য শ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতং।
দৃশ্য তত্রাভিনেয়ং যৎরূপায়োপাত্তু রূপকম্।। সাহিত্য দর্পনম্ ।

[35] শ্রাব্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি কেবল মাত্র শ্রবণে এবং দৃশ্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি অভিনয় দর্শনে। দৃশ্যকাব্য আবার, রূপক ও উপরূপক ভেদে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। রূপক আবার দশবিধ; যথা নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যয়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন। উপরূপকের আবার অষ্টাদশবিধ বিভাগ আছে।

প্রতিষ্ঠা করতেও উৎসনির্দেশে সেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই শরণাপন্ন হয়েছেন প্রবন্ধলেখক[36]।

এই উদ্ধৃতিগুলি এবং আরও কিছু দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দেয়, উনিশ শতকের বাঙালিদের নাট্যতত্ত্বচর্চায় ভরতের উপস্থিতি তেমন উজ্জ্বল ছিল না। বরং সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব-চর্চায় ভরতের চেয়ে অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। তাঁর *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদই যেন হয়ে উঠেছে নাট্য-উৎসাহী বাঙালির নাট্য আলোচনার প্রধানতম রেফারেন্স। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ উনিশ শতকের যে সব রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন, "সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে।"[37] অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার*-এর গুরুত্ব নিরূপণের মাপকাঠি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। যোগীন্দ্রনাথ বসু 'ভবভূতি' প্রবন্ধে রামচরিতমূলক নাটকের মধ্যে ভবভূতির রচনাই সবচেয়ে প্রাচীন কিনা এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার উল্লিখিত রামবিষয়ক নাটকের তালিকাকেই প্রামাণ্য ধরেছেন—

---

[36] নাটকস্যাৎ প্রকরণং ব্যায়োগঽঙ্ক স্তথা ডিম:— ইহামৃগ প্রহসণং ভাণ সমবকারক বীথীতি ভরত প্রাহনাট্যেষু দশরূপকং।। গোষ্ঠী সংলাপ শিল্পানি ভানী হল্লীশ রাসকৌ, উল্লাপ, শ্রীগদিত প্রস্থানং নাট্য রাসকং। দুর্ঘল্লিকা লাসিকা চ, কাব্যঞ্চেত্যুপরূপকং --- স্যাৎ সপ্তদশ সংখণ্ড লক্ষণস্তু এ কথ্যতে। সাহিত্য দর্পনম্।

[37] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১২১।

> সাহিত্যদর্পণকার রামচরিতাখ্যায়ক যে সকল নাটকের নামোল্লেখ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় "বালরামায়ণ" তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন।[38]

আবার, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র ষষ্ঠ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যাতে বেরিয়েছিল সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ রচিত 'ভবভূতি' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ। সেখানেও *উত্তররামচরিত*-এর আলোচনা প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ-এ* রাম-সীতা বিষয়ক যত সংস্কৃত নাটক বা আখ্যানের উল্লেখ রয়েছে (*বীরচরিত, উত্তরচরিত, মহানাটক, প্রসন্নরাঘব, অনর্ঘরাঘব, বালরামায়ণ* ইত্যাদি) সেগুলির একটি তালিকা পেশ করেছিলেন সতীশচন্দ্র[39]।

সাহিত্যদর্পণঃ-এর মূল বিষয় তো বটেই, সেখানে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি পর্যন্ত যে একাধিক বাঙালি লেখক ও পণ্ডিতদের নখদর্পণে ছিল, তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। রামদাস সেন রচিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধতেই বলা হয়েছে,

> দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার, কুবলয়ানন্দ, প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।[40]

দশরূপ মূলত নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ বলে হয়তো ওপরে উল্লিখিত অলংকার-বিষয়ক চারটি বইয়ের মধ্যে প্রথমেই এটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু স্বরূপত নাট্যতত্ত্ব-কেন্দ্রিক বই না হলেও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর গুরুত্ব যে কোনও অংশে কম নয়, তা দ্বিতীয় স্থানে এর উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়।

---

[38] যোগীন্দ্রনাথ বসু, "ভবভূতি," *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ): ৫১৩।

[39] সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, "ভবভূতি," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ৬ষ্ঠ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (১৩০৬ বঙ্গাব্দ): ১২৫।

[40] সেন, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়," ১৫৫।

উনিশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক আলোচনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*। সেখানেও বিদ্যাসাগর *দশরূপ* ও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত নাটকগুলির নামোল্লেখ করেছেন[41]।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর তুলনায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ যে উনিশ শতকীয় বাঙালির নাট্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত চিন্তায় অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একাধিক প্রমাণ নানা সাহিত্য-সমালোচনাকেন্দ্রিক গ্রন্থ এবং পত্রিকা-রচনায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে 'নাটক-পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধটি।

৬.১.২.২ প্রসঙ্গ: 'নাটক পরিচ্ছেদ'

১২৮২ বঙ্গাব্দের *বঙ্গদর্শন*-এর শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা 'নাটক পরিচ্ছেদ'। 'নাটক পরিচ্ছেদ'-এর লেখক কার দ্বারা বেশি প্রভাবিত হলেন? ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* নাকি *সাহিত্যদর্পণঃ?* এর উত্তর পেতে 'নাটক পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধের নির্বাচিত কয়েকটি অংশের সঙ্গে *নাট্যশাস্ত্র* এবং *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর তুলনা করা যাক।

[রূপক প্রসঙ্গ]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর ঊনবিংশ অধ্যায় 'কাকুস্বরব্যঞ্জক'-এ নাটক প্রসঙ্গে প্রথম 'দশরূপবিধান' শব্দটি পাওয়া যায়। *নাট্যশাস্ত্র*-কে এখানে দশটি রূপভেদে ভাগ করা হয়েছে। ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে এই দশটি ভাগ রূপক নামে পরিচিত। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "দৃশ্য-কাব্য হইতেছে-- অভিনেয় (অর্থাৎ অভিনয়ের যোগ্য)।

---

[41] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১২১।

...রূপের আরোপ করা হয় বলিয়া ইহা 'রূপক'।..."[42] *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর এই যুক্তিটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় 'নাটক পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধে—

> কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় বা রূপক কহা যায়। অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি দৃশ্যকাব্যের নাম রূপক।[43]

লক্ষণীয়, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ 'রূপক' শব্দের ব্যাখ্যা সরাসরি না থাকলেও এখানে *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে অনুসরণ করেই লেখক রূপকের বিশ্লেষণ করলেন।

[পূর্বরঙ্গ]

মূল নাটকের অভিনয় শুরুর আগে যা-কিছু অনুষ্ঠিত হয় ভরতের আমলে তাকে 'পূর্বরঙ্গ' বলা হত। পূর্বরঙ্গ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন—

> যেহেতু এই রঙ্গপ্রয়োগ পূর্বেই প্রযুক্ত হয়, সেইজন্য এখানে (এইটি) পূর্বরঙ্গ [ফুটনোট: সাহিত্যদর্পণ ৬। ১০ থেকে] নামে জ্ঞাতব্য। ... এর অঙ্গসমূহ সম্যকরূপে যথাক্রমে ততবাদ্য ও ঢাকবাদ্য এবং আবৃত্তিসহকারে অনুষ্ঠেয়।[44]

'নাটক পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধে এই পূর্বরঙ্গ সম্পর্কেই বলা হয়েছে, "...রঙ্গভঙ্গী (রঙ তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌরচন্দ্রিকা) করে তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।"[45]

---

[42] মুখোপাধ্যায় *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৩৯।

[43] অজ্ঞাত, "নাটক পরিচ্ছেদ," *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ১৮২।

[44] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "পঞ্চম অধ্যায়: পূর্বরঙ্গবিধান," *ভরত নাট্যশাস্ত্র*- প্রথম খণ্ড, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১০২। [শ্লোক ৭-৮]

[45] অজ্ঞাত, "নাটক পরিচ্ছেদ," ১৮২।

এবার দেখা যাক *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ পূর্বরঙ্গের সংজ্ঞা কী দেওয়া হল। *সাহিত্যদর্পণঃ*-মতে "নাট্যাভিনয়ের পূর্বে রঙ্গের বিঘ্নশান্তির জন্য কুশীলবগণ যে মঙ্গলাচরণ করেন, তাহাকে পূর্বরঙ্গ বলে।"[46]

স্পষ্টতই, 'নাটক পরিচ্ছেদ'-এর ভাষার সঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ভাষার যে মিল তা থেকে এর ওপর *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়। দু-জায়গাতেই কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ, 'মঙ্গলাচরণ' শব্দটির ব্যবহার এবং 'নট-নটী' বা 'কুশীলব' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। *নাট্যশাস্ত্র*-এ কিন্তু কর্মবাচ্যের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই কর্তা হিসেবে নট-নটী বা কুশীলব শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি এবং 'মঙ্গলাচরণ' শব্দটিও ব্যবহারের করা হয়নি।

[নান্দী]

নাট্যশাস্ত্র-এ পূর্বরঙ্গের বিভিন্ন অংশের কথা বলা হয়েছিল। যেমন, 'প্রত্যাহার' (বাদ্যসমূহের বিন্যাস), 'অবতরণ' (গায়কগণের উপবেশন), 'আরম্ভ' (গানক্রিয়ার সূত্রপাত) প্রভৃতি। এইরকমই একটি অংশ ছিল 'নান্দী'। ভরত অনুসারে—

> যেহেতু (এতে) দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আশীর্বাদযুক্ত (বাক্য)
> সর্বদা প্রযুক্ত হয়, সেইজন্য (এর) নান্দী নামকরণ হয়েছে।[47]

'নাটক পরিচ্ছেদ'-এ 'নান্দী' সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে
> অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী।[48]

---

[46] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৪৩।

[47] বন্দ্যোপাধ্যায়, "পূর্বরঙ্গবিধান," ১০৫।

[48] অজ্ঞাত, "নাটক পরিচ্ছেদ," ১৮৩।

আর *সাহিত্যদর্পণঃ* অনুযায়ী, "...দেব-দ্বিজ-নৃপ ইত্যাদির আশীর্বাদ-সংযুক্ত স্তুতি ভাষণের প্রয়োগ হয় বলিয়া ইহাকে (পূর্বরঙ্গকে) নান্দী বলে।"[49]

দেখা গেল, *সাহিত্যদর্পণঃ*-মতে পূর্বরঙ্গই নান্দী, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। ভরতমতে নান্দী পূর্বরঙ্গের অনেকগুলি অংশের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে 'নাটক পরিচ্ছেদ' অনুসারে পূর্বরঙ্গের পরের অংশের নাম নান্দী।

অর্থাৎ 'নান্দী' প্রসঙ্গে তিনটি টেক্সটে তিনরকম ভিন্ন মত পাওয়া গেল। তবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এ যে 'স্তুতিভাষণ' শব্দটি পাওয়া যায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'নাটক পরিচ্ছেদ'-এর 'স্তুতিগান' শব্দে।

[অভিনয়ের শ্রেণিবিভাগ]

নাট্যশাস্ত্র-তে অভিনয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছিল

> ৯। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
> জ্ঞেয়স্ত্বভিনয়ো বিপ্রাশ্চতুর্ধা পরিকল্পিতঃ।।
>
> 'হে ব্রাহ্মণগণ, অভিনয় চারভাগে পরিকল্পিত বুঝতে হবে; (যথা) আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।'[50]

এই শ্রেণিবিভাগকেই অনুসরণ করেছিল *সাহিত্যদর্পণঃ*।

> 'ওই অভিনয় কি'- এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়— অবস্থার অনুকরণ হইতেছে অভিনয়। ইহা চারি প্রকারের— আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।[51]

---

[49] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৪৫।

[50] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "অষ্টম অধ্যায়: উপাঙ্গবিধান," *ভরত নাট্যশাস্ত্র* – প্রথম খণ্ড, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ১৯৭।

[51] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৩৯।

নাটক-পরিচ্ছেদ-এও প্রায় একইভাবে বলা হয়েছে, ‘অভিনয় চারি প্রকার -- আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।’[52]

অর্থাৎ, এখানে তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি।

[প্রস্তাবনা]

ভরতবাক্য অনুসারে—

> যাতে নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সঙ্গে নিজের কার্যসংক্রান্ত বিচিত্র বাক্যদ্বারা অথবা বীথ্যঙ্গ দ্বারা বা অন্য প্রকারে সংলাপ করেন, তা পণ্ডিতগণ কর্তৃক আমুখ বা প্রস্তাবনা নামে জ্ঞেয়। [শ্লোক ২৮-২৯ (ক)]... উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবৃত্তক, অবলগিত— এই পাঁচটি আমুখাঙ্গ।[53]

সাহিত্যদর্পণঃ-এ এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> নাটকের যে অংশে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যবিষয় অবলম্বনপূর্বক বিচিত্র বাক্যের দ্বারা নাটক সূচনা বিষয়ে পরস্পর আলাপ করে— তাহা আমুখ বলিয়া পরিচিত, ইহাকে প্রস্তাবনাও বলা হয়;... পারিপার্শ্বিক তাহার (সূত্রধারের) অনুচর। প্রস্তাবনার পাঁচটি ভেদ— উদ্‌ঘাত্যক (উদ্‌ঘাতক), কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।[54]

সাহিত্যদর্পণঃ-এর এই ভাষারই প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ‘নাটক-পরিচ্ছেদ’ প্রবন্ধে—

> নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে, তথায়ই প্রস্তাবনা কহা যায়। সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক। প্রস্তাবনা

---

[52] অজ্ঞাত, “নাটক পরিচ্ছেদ,” ১৮২।

[53] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “দ্বাবিংশ অধ্যায়: বৃত্তিবিকল্প,” *ভরত নাট্যশাস্ত্র – তৃতীয় খণ্ড*, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ৭৩।

[54] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৪৯।

> পাঁচ প্রকার। যথা— উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলপিত।[55]

তবে *সাহিত্যদর্পণঃ* ও ভরতের ভাষা এক্ষেত্রে প্রায় কাছাকাছি হওয়ায় এ যে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এরই অনুসরণ, ভরতের নয়, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, ভরতে যাকে 'প্রবৃত্তক' বলা হয়েছে, *সাহিত্যদর্পণঃ*-মতে তা হল 'প্রবর্ত্তক' এবং 'নাটক পরিচ্ছেদ' *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর পরিভাষাকেই অনুসরণ করেছে।

[কথোদ্ঘাত]

নাট্যের প্রস্তাবনার একটি বিশেষ অংশ কথোদ্ঘাত। কথোদ্ঘাত-এর সংজ্ঞা দিয়ে *নাট্যশাস্ত্র*-এ বলা হয়েছে, 'যাতে কোনো পাত্র সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যার্থ গ্রহণ করে প্রবেশ করে, তাকে কথোদ্ঘাত বলে।'[56] (শ্লোক ৩২)

'নাটক-পরিচ্ছেদ' প্রবন্ধে কথোদ্ঘাতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা এইরকম—

> সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে কথোদ্ঘাত নামক প্রস্তাবলা কহা যায়। যথা রত্নাবলীতে- ...সূত্রধারের এই বাক্য [বিধাতা যদি অনুকূল হন তবে কি দ্বীপান্তরিত কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা দিগন্তরগত প্রিয় বস্তু তাঁহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পারে] শুনিয়া নেপথ্য হইতে যৌগন্ধরায়ণ বাক্যের সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, "সকলি সত্য!..."[57]

এবার দেখা যাক *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সংজ্ঞা,

> সূত্রধারের বাক্য বা তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবেশ হইলে, তাহাকে কথোদ্ঘাত বলে। বাক্য গ্রহণ করিয়া; যেমন রত্নাবলী

[55] অজ্ঞাত, "নাটক পরিচ্ছেদ," ১৮৪।

[56] বন্দ্যোপাধ্যায়, "বৃত্তিবিকল্প," ৭৪।

[57] অজ্ঞাত, "নাটক পরিচ্ছেদ," ১৮৪।

> নাটকে – সূত্রধার ‘দ্বীপাদন্যস্মাদপি’ ইত্যাদি পাঠ করিলে – (নেপথ্যে) “সাধু ভরতপুত্র! সাধু! ঠিকই বলা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি? অন্য দ্বীপ হইতেও” – ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ।[58]

অর্থাৎ কথোদ্‌ঘাতের মূল সংজ্ঞা তিনক্ষেত্রে একই রকম, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে ‘নাটক-পরিচ্ছেদ’-এ প্রদত্ত কথোদ্‌ঘাতের উদাহরণটি পর্যন্ত *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে অবিকল তুলে নেওয়া! এর পরে নিশ্চয়ই উনিশ শতকের এই প্রবন্ধে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রাধান্য সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

[বিদূষক]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ বিদূষকের গতিভঙ্গিমা সংক্রান্ত আলোচনা আছে[59]। কিন্তু বিদূষকের সংজ্ঞা পৃথকভাবে দেওয়া নেই। তাই *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নাটক-চন্দ্রিকা’ প্রবন্ধে বিদূষকের লক্ষণ আলোচনা-প্রসঙ্গে *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকেই শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে—

> সংস্কৃত নাট্যসূত্রে বিদূষকের যেরূপ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিখিত হইল; যথা—
>
> “কুসুম-বসন্তাদ্যভিধঃ
> কর্ম্মপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
> হাস্যকরঃ কলহ-রতি-
> বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ।। (সাহিত্য দর্পণ)
>
> ...সাহিত্যদর্পণ-ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বসন্ত-কালের অথবা কোন পুষ্পের নামে যাহার নামকরণ হয়, যিনি কর্ম্ম, বপু, বেশ ও ভাষাদি দ্বারা হাস্যকারী হয়েন এবং কলহ-প্রিয় ও ভোজন-পটু;

---

[58] মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ,* ২৫০।

[59] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “ত্রয়োদশ অধ্যায়: গতিপ্রচার,” *ভরত নাট্যশাস্ত্র* – দ্বিতীয় খণ্ড, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ৯৪।

> অধুনাতন নাট্য-শাসন-প্রণেতৃগণ তাঁহাকেই বিদূষকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।[60]

শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনামূলক গ্রন্থেও নাটক বিষয়ে আগ্রহী বাঙালির অনুপুঙ্খ *সাহিত্যদর্পণঃ*-পাঠের উদাহরণ মেলে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল বিহারিলাল সরকার রচিত 'শকুন্তলা-রহস্য'। এখানে দুষ্যন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলার একবেণীধারণ যে তার বিরহ-বিধুরতার লক্ষণ তা বোঝাতে গিয়ে *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে—

> নাটকে দেখিবে,— সেই বিরহবিধুরা এক-বেণী-ধরা শকুন্তলার জীবনময়ী মূর্ত্তি।... একবেণীধারণ বিরহবিধুরতার অন্যতম লক্ষণ। যথা,—
>
> "তত্রাঙ্গ-চেলমালিন্যমেকবেণীধরং শিরঃ"
>
> সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ, ২২১ সূত্র[61]

৬.১.২.৩ প্রসঙ্গ: নাটকের হত্যাদৃশ্য ও *সাহিত্যদর্পণঃ*

উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ণচন্দ্র বসু রচিত *সাহিত্য-চিন্তা* নামে একটি গ্রন্থ। এই বইতে বর্ণিত কাব্য-লক্ষণ ঘোষিতভাবে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদকেই অনুসরণ করেছে—

> বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—
>
> "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"
>
> রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। যাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না জন্মে তাহা রসই নহে।[62]

---

[60] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১২৮৭ বঙ্গাব্দ): ৫৫৪।

[61] বিহারিলাল সরকার, *শকুন্তলা-রহস্য* (আষাঢ় ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ১৪২।

[62] পূর্ণচন্দ্র বসু, "খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মত," 'সাহিত্যে খুন,' *সাহিত্য চিন্তা* (কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ৩০।

দৃশ্যকাব্য বা নাটকে কোন কোন দৃশ্য দেখানো অনুচিত বা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ তা আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ণচন্দ্র বসু আবারও *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন[63] এবং সেই উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন—

> যাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, যাহা সহৃদয় জনগণের রুচির প্রতিবিরোধী হয়, যাহা বাহ্যদৃশ্যে ও ব্যবহারে লজ্জাকর, এমন সকল অনুষ্ঠান কাজেই দৃশ্যকাব্যে সংযোজিত হইতে পারে না।
>
> ...নাটকে কী কী পরিবর্জ্জনীয়, আলঙ্কারিক তাহা বলিতেছেন— দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদিবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদ, এবং নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াকর ব্যাপার, শয়ন এবং অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ (Blockade) এবং স্নান ও শরীরে অনুলেপন।
>
> তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের আলঙ্কারিকেরা নাটকে হত্যাব্যাপার নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।[64]

‘আমাদের আলঙ্কারিক’ এই বহুবচনের আড়ালে যে একক ব্যক্তি এখানে প্রাধান্য পেয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথ কবিরাজ।

---

[63] সাহিত্যদর্পণকার বলিতেছেন:--

> দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
> বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা।।
> দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
> শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যুপরোধনম্।।
> স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জ্জিতো নাতিবিস্তরঃ।

[উৎস: বসু, “খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মত,” ৩২।]

উপরোক্ত শ্লোকগুলি *সাহিত্যদর্পণ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শ্লোক ১৬-১৮। [উৎস: মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, ২৪২]

[64] বসু, “খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিক মত,” ৩২।

৬.১.২.৪ উৎস-নির্দেশ

ভারতী পত্রিকায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধের হরিসাধন মুখোপাধ্যায় *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের রূপভেদ নির্ণয় প্রসঙ্গে 'ভরতের নাট্য শাস্ত্রোক্ত নিয়ম'-এর প্রসঙ্গ এনেছিলেন—

> ভরত-ঋষি ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পর মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি পুস্তকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কেননা ইহার মূল ঘটনা – বীজ, সন্ধি প্রভৃতি সমস্তই ভরতের নাট্য শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে অনুপ্রাণিত। মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সূত্রানুসারে ধরিতে গেলে মৃচ্ছকটিক নাটক শ্রেণী-পরিভুক্ত না হইয়া "প্রকরণের" মধ্যে আসিয়া পড়ে।
>
> ...মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্য শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এবং প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে কাব্য সমূহ সাধারণতঃ দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই ভাগে বিভক্ত। *... শ্রাব্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি কেবল মাত্র শ্রবণে এবং দৃশ্য কাব্যের ভাবোপলব্ধি অভিনয় দর্শনে। দৃশ্যকাব্য আবার রূপক ও উপরূপক ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রূপক আবার দশবিধ; + যথা নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যয়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন। উপরূপকের আবার অষ্টাদশবিধ বিভাগ আছে।[65]

উপরের উদ্ধৃতির * এবং + চিহ্নযুক্ত অংশগুলি লক্ষণীয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের মূল প্রবন্ধে ভরত-প্রণীত 'নাট্য শাস্ত্রের মূল সূত্র'গুলির কথাই গুরুত্ব পেল। কিন্তু লক্ষ করা দরকার, এই দুই স্থানের ফুটনোটে তথ্যসূত্র হিসেবে কিন্তু *নাট্যশাস্ত্র*-এর শ্লোক তুলে দেওয়া হল না, মূল প্রবন্ধের গতিপথ অনুসারে যা অতি-স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। তুলে দেওয়া হল *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোক।

---

[65] হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, "প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য," *ভারতী ও বালক*, ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ), ৮৭।

ভরত-কথিত বীজ, সন্ধি, শ্রব্য-দৃশ্য কাব্যের ভেদ, দশপ্রকার রূপক— এই সব কিছুর কথা এ প্রবন্ধে থাকলেও এই বিশেষ অংশটি প্রমাণ করে দেয় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর তুলনায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতিই লেখকের নির্ভরতা বেশি ছিল। সুতরাং অনুমান করে নেওয়া যায়, যেসব গ্রন্থে বা প্রবন্ধে ভরতের উল্লেখ বা ঋষি ভরত-প্রণীত পরিভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানেও লেখকেরা ভরতের মূল টেক্সটকে সরাসরি নিজেদের লেখায় আনেননি। *নাট্যশাস্ত্র*-কে হয়তো খানিক পাশ কাটিয়ে গেছেন।

৬.১.২.৫ কঞ্চুকী প্রসঙ্গ

এই অনুমানকেই আরও দৃঢ় ভিত্তি দেয়, *জন্মভূমি* পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারিলাল সরকার রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল ও পদ্মপুরাণ' শীর্ষক প্রবন্ধ। নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিহারিলাল বলেছেন—

> কঞ্চুকী-চরিত্রের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নাটককারকে ভাবিতে হয় না।
> "অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
> সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে"
>
> ইহাই কঞ্চুকী-চরিত্র-লক্ষণের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। যে সব অলঙ্কার গ্রন্থে এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কালিদাসের পরে রচিত। মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাটক সূত্রাদি অবশ্য কালিদাসের পূর্ব্বরচিত। *তাহাতে কঞ্চুকীর উল্লেখ আছে কি না, আমরা বলিতে পারি না*। কালিদাসের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকেরা কালিদাসের কঞ্চুকী দেখিয়া, অথবা মহর্ষি ভরতপ্রণীত সূত্রাবলম্বনে কঞ্চুকী-লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন কি না, তাহাও বলা দুষ্কর।[66]

রেখাঙ্কিত অংশটিতে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ কঞ্চুকীর উল্লেখ নিয়ে স্পষ্টতই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এখন, *নাট্যশাস্ত্র*-এ কি সত্যিই কঞ্চুকীর কোনোরকম উল্লেখ নেই?

[66] বিহারিলাল সরকার, *শকুন্তলা-রহস্য* (কলকাতা: ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ৬৫। [নজরটান আরোপিত]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর 'গতিপ্রচার' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'কাঞ্চুকীয়ের গতি' নামক অংশে বলা হয়েছে—

> কাঞ্চুকীয়স্য কর্তব্যা বয়োঽবস্থাবিশেষতঃ।
> অবৃদ্ধস্য প্রয়োগজ্ঞো গতিমেবং প্রযোর্জয়েৎ।। ১১২
> অর্ধ্বতালোথিতৈঃ পাদৈবিষ্কম্ভৈ; ঋজুভিস্তথা।
> সমুদ্বহংস্তথাঙ্গানি পঙ্কলগ্ন ইবব্রজেৎ।। ১১৩

> অনুবাদ: কাঞ্চুকীয়ের গতি বয়স ও অবস্থা বিশেষে করণীয়। প্রয়োগাভিজ্ঞ ব্যক্তি অবৃদ্ধ (কাঞ্চুকীয়ের) গতি এভাবে প্রয়োগ করবেন: অর্ধতাল পর্যন্ত উত্থিত পদে এবং ঋজু বিষ্কম্ভ সহকারে পঙ্কে পতিত ব্যক্তির ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহন করে গমন বিধেয়।[67]

অর্থাৎ দেখা গেল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* এমন একটি গ্রন্থ যেখানে মঞ্চে কঞ্চুকীর গতিভঙ্গি কীরকম হবে, সেই সংক্রান্ত নির্দেশনা অবধি আছে। তাই ভরতে কঞ্চুকীর উল্লেখ সম্পর্কে যে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করেন, তিনি অন্য যে অলংকারগ্রন্থই পাঠ করে থাকুন না কেন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* যে সম্পূর্ণরূপে এবং অভিনিবেশসহ পাঠ করেননি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬.১.২.৬ নাটকের উৎপত্তি ও ভরত

নাট্যশাস্ত্র-এর 'তাণ্ডব লক্ষণ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

> ব্রহ্মা প্রথম নাটক লিখে তার অভিনয় করালেন।[68]

---

[67] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "ত্রয়োদশ অধ্যায়: গতিপ্রচার," *ভরত নাট্যশাস্ত্র – দ্বিতীয় খণ্ড*, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ৯০।

[68] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "চতুর্থ অধ্যায়: তাণ্ডব লক্ষণ," *ভরত নাট্যশাস্ত্র – প্রথম খণ্ড*, অনু. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ৫৪।

কী এই নাটক? ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-মতে, ভরত ব্রহ্মাকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘কোন নাটক অভিনীত হবে’ তখন ব্রহ্মা দুটি নাট্যাভিনয়ের আদেশ দেন। একটি হল ‘উৎসাহজনক ও দেবগণের অত্যন্ত প্রীতিকর’ ‘অমৃতমন্থন’ নামক সমবকার। অন্যটি হল ‘ত্রিপুরদাহ’ নামক ডিম। *নাট্যশাস্ত্র*-এর বয়ান অনুসারে “বহু পর্বতসমন্বিত ও ভূত, গণ, রমণীয় কন্দর ও জলপ্রপাত যুক্ত হিমালয়ের উপরে” এই দুইয়ের অভিনয় হয়েছিল।[69]

কিন্তু উনিশ শতকের অধিকাংশ লেখায় প্রথম সংস্কৃত নাট্যরচনা হিসেবে ‘ত্রিপুরদাহ’ বা ‘অমৃতমন্থন’-এর উল্লেখ সেভাবে পাওয়া যায় না। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রথম বা চতুর্থ অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই দুটি নাটকের উল্লেখ থাকাটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের একাধিক সমালোচক নাটকের উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাসের *বিক্রমোর্ব্বশী* নাটকে উল্লিখিত ভরত-রচিত ‘লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর’ নাটকের কথা বলেছেন। যেমন, *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত ‘প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য’ প্রবন্ধে হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ঋষি প্রবর ভরতপ্রণীত “লক্ষ্মী স্বয়ম্বর” নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি ভরত, দেব সভায় অভিনীত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে এই দৃশ্যকাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।[70]

---

[69] বন্দ্যোপাধ্যায়, “তাণ্ডব লক্ষণ,” ৫৫।

[70] হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, “প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য,” *ভারতী* ১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (কলকাতা: আষাঢ় ১২৯৭ বঙ্গাব্দ), ৮৬।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক। সুরেশচন্দ্র বল রচিত *নব্যভারত* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব’[71] প্রবন্ধে বলা হয়েছে—

> *প্রথম নাটক দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গে অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতনামা মুনি।* স্বয়ং বাগদেবী সরস্বতী নাটকের রচয়িত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, অপ্সরাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটকে এইরূপ একটি গল্প আছে। বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়ের একটি কথোপকথন আছে। তাহাতে এক শিষ্য অপরকে স্বর্গে গুরু-প্রবর্ত্তিত নাটকাভিনয়ের বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে লাগিলেন, *তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সরস্বতী দেবী প্রণীত “লক্ষীস্বয়ম্বর”* [য] *নামক নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন।* ... উর্ব্বশী লক্ষী [য] চরিত্র এবং মেনকা বারুণীচরিত্র অভিনয় করিতেছিলেন।...[72]

আবার, এও উল্লেখ্য যে, *আর্য্যদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নাটক-চন্দ্রিকা’ প্রবন্ধে একইভাবে ‘লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর’ নাটকের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে ব্যাসদেবের তুলনায় ভরতের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে কালিদাসের *বিক্রমোর্ব্বশী*-র প্রসঙ্গ এনেছেন লেখক—

> মুনিবর ভরত অত্যন্ত প্রাচীন, ইনি সত্যকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটক প্রস্তুত করেন এবং সেই নাটক উর্ব্বশীকে শিক্ষা দিয়া ইন্দ্রের সভায় উক্ত নাটকের অভিনয় করান।

[71] এই প্রবন্ধের শিরোনামে এবং রামদাস সেনের প্রবন্ধ-শিরোনাম (হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়)-এর ‘হিন্দু’ শব্দটি কিছুটা মনোযোগ দাবি করে। সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক আলোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে যে পত্রিকাগুলি (*বঙ্গদর্শন, প্রচার, নব্যভারত*), অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের সম্পাদকরা ছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে, যে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্ব হিন্দু জাতীয়তাবাদে প্রচারের অন্যতম প্রকরণ হয়ে উঠছিল উনিশ শতকে, সেই সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্বের প্রধানতম প্রতিমূর্তি হয়ে যেন বাঙালির কাছে দেখা দিয়েছিল *সাহিত্যদর্পণঃ* গ্রন্থটি।

[72] সুরেশচন্দ্র বল, “হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব,” *নব্যভারত*, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (কলকাতা: অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ), ৩৯৬। [নজরটান আরোপিত]

> তিনি [কালিদাস] বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে ভরত-মুনি-প্রণীত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের উল্লেখ করেন। এজন্য স্পষ্টই বোধ হয় যে, মহাত্মা ভরতই এই শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা।[73]

লক্ষণীয় বিষয় হল, এঁরা কিন্তু কেউই নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে বলতে গিয়ে 'ত্রিপুরদাহ' বা 'অমৃতমন্থন' নাটকের উল্লেখ করেননি। *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল—

> পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যখন সত্যযুগ আরম্ভ হল এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হল এবং জনগণ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হল... তখন মহান ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মাকে বললেন – আমরা এমন একটি আনন্দদায়ক বস্তু চাই যা (যুগপৎ) শ্রব্য ও দৃশ্য। *যেহেতু বেদচর্চা শূদ্রগণের শ্রবণযোগ্য নয়, সেইজন্য অপর একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী।*
>
> *তিনি তাঁদেরকে তথাস্তু বলে দেবরাজকে বিদায় দিয়ে যোগস্থ হয়ে চতুর্বেদ স্মরণ করলেন।* (শ্লোক ৮-১৩)[74]

শূদ্রসহ 'সকল বর্ণের উপযোগী' 'পঞ্চম বেদ'রূপে নাটকের উদ্ভবের এই পৌরাণিক ঘটনা সামাজিক দৃষ্টিকোণের সাপেক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এর উল্লেখ উনিশ শতকে বিরল। ইন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্র রচনার কথা সুরেশচন্দ্র বল বা হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বলেননি। বরং কালিদাসের *বিক্রমোর্ব্বশী*-তে উল্লিখিত ভরত রচিত 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর'-এর কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, *নাট্যশাস্ত্র*-এর কোথাও কিন্তু এই নাটকের উল্লেখ নেই।

---

[73] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক-চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮২।

[74] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভরত নাট্যশাস্ত্র – প্রথম খণ্ড*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০), ২-৩। [নজরটান আরোপিত]

শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের নাটক-বিষয়ক রচনায় ভরতের উল্লেখ *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। যে সব রচনায় ভরতের উল্লেখ পাওয়া গেছে তাদের একটি তালিকা নিচে উদ্ধৃত করা হল—

লেখক	**প্রবন্ধের নাম**	**পত্রিকা/ গ্রন্থ**	**প্রকাশকাল**
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	**প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য**	*ভারতী*	চতুর্দশ বর্ষ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ
সুরেশচন্দ্র বল	**হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব**	*নব্যভারত*	অষ্টম বর্ষ, কার্ত্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ
শিবধন বিদ্যার্ণব	**প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র**	*ভারতী*	দ্বাবিংশ বর্ষ, অগ্রহায়ণ এবং মাঘ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ
অজ্ঞাত	**মাসিক সাহিত্য সমালোচনা**	*সাহিত্য*	নবম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ
বিহারিলাল সরকার	**অভিজ্ঞানশকুন্তল ও পদ্মপুরাণ**	*জন্মভূমি* (পত্রিকা) *শকুন্তলা-রহস্য* (গ্রন্থনাম)	আষাঢ় ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

এদের মধ্যে প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই ভরতের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। ভরত যে *নাট্যশাস্ত্র*-এর আদি প্রবক্তা সেই স্বীকৃতি থাকলেও ভরতের গ্রন্থের গভীরতর আলোচনায় প্রায় কেউই প্রবেশ করেননি। নাট্যকার ভরতের কথা তুলে ধরা হলেও, নাট্যতাত্ত্বিক ভরত খানিক অনুল্লেখের আড়ালেই চলে গেছেন বলে মনে হয়। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-ই যার কেন্দ্রীয় বিষয়, এমন রচনা অত্যন্ত বিরল।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম কেবল *ভারতী* পত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত শিবধন বিদ্যার্ণব রচিত 'প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র'। এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুই হল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোচনা। *সাহিত্য* পত্রিকার নবম বর্ষের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' অংশে এই প্রবন্ধেরই প্রকাশ-সংবাদ দিয়ে বলা হয়েছিল— "প্রবন্ধটি সুলিখিত

ও আলোচ্য।... এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হইলে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসের এক অংশ উপকৃত হইবে।"[75]

উনিশ শতকে ভরত ও ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে শিবধন বিদ্যার্ণবের এই প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বসহ উল্লেখের দাবি রাখে। এটিই সম্ভবত উনিশ শতকে প্রকাশিত একমাত্র রচনা যেখানে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণসহ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিত আলোচনার পরিকল্পনা ছিল। এই প্রবন্ধটির অনুপ্রেরণা ছিল 'বোম্বে নগরীর নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয়' থেকে প্রকাশিত ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। এর চারবছর আগে NSP থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ, যেটি কাব্যমালা সংস্করণ নামে পরিচিত। 'প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র' প্রবন্ধে লেখকের মুখবন্ধ অংশে তারই উল্লেখ রইল—

> কিছু দিন হইল বোম্বে নগরীর নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় হইতে নাট্যশাস্ত্র নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শোনা যায় নাট্যশাস্ত্র ইয়োরোপীয় কাব্যানুরাগী কোবিদগণের যথেষ্ট প্রীতি ও সমধিক সমাদর আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে; এই শুভযোগে আমরাও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নাট্যবিদ্যার অতীত গুণগরিমা স্মরণ করিয়া কতকটা সান্ত্বনা এবং গৌরব অনুভব করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।[76]

'ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নাট্যবিদ্যার অতীত গুণগরিমা স্মরণ' করতেই ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর সংক্ষিপ্তসার বাঙালি পাঠকের কাছে বাংলা ভাষায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রাপ্ত বইগুলির মধ্যে *নাট্যশাস্ত্র*-ই যে সবচেয়ে প্রাচীন সে কথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলেও, ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব তথা

---

[75] অজ্ঞাত, "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা," *সাহিত্য* ৯ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ৬৫২।

[76] শিবধন বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," *ভারতী* ২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ): ৭৩২।

অলংকারশাস্ত্রের একেবারে গোড়ার দিকের বই যে *নাট্যশাস্ত্র*, সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন লেখক। তিনি বলেছিলেন—

> অপরাপর অপেক্ষাকৃত নবীন অলঙ্কারগ্রন্থে নাটকের যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাটকের ব্যাখ্যা সম্ভবত তাহার মূল।[77]

সামজিক অবস্থানগত সমস্ত অসাম্যকে একপ্রকার নস্যাৎ করে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের কাছে নাট্যকলাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল *নাট্যশাস্ত্র*। লেখক *নাট্যশাস্ত্র*-এর এই তাৎপর্য সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন—

> নাট্যশাস্ত্রোক্ত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এইরূপ, 'নাটক দেব দৈত্য সকলেরই যথাযথ শুভাশুভ কল্পনার দ্বারা কর্ম্ম স্বভাব এবং বংশের মর্যাদা রক্ষা করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে *দৈত্য বা দেবগণের প্রতি পক্ষপাত থাকার বিধি নাই*। ... লোকত্রয়ের ভাবানুকীর্ত্তনই নাট্য। ... সুতরাং *উহা উত্তম মধ্যম অধম জনগণের কর্ম্মের আশ্রয়*, হিতোপদেশপ্রদ, ধৃতিক্রীড়াসুখকর এবং শোকদুঃখাকুল বিশ্বের বিশ্রামহেতু।'[78]

এখানে প্রথমেই *নাট্যশাস্ত্র* সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

> নাট্যশাস্ত্র সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। নাট্যকলা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব এই সমস্ত অধ্যায়ে যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[79]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর যে যে অধ্যায় ও বিষয় নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা ছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল—

নাটকের আবির্ভাব সম্পর্কে *নাট্যশাস্ত্র*-এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে বলা হয়েছিল—

> সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড যখন কামলোভানুগত গ্রাম্যধর্ম্মে সমাচ্ছন্ন হইল, যখন বিশ্বভুবন ক্রোধাদি

---

[77] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩৬।

[78] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩৬। [নজরটান আরোপিত]

[79] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩৩।

> দুর্জ্জয় শত্রুর বশীভূত সুখদুঃখসঙ্কুল হইল, দেবদানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতির দ্বারা যখন লোকপালাধিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপ সমাক্রান্ত হইল, তখন বিশ্বহিতৈষী মহেন্দ্রাদি দেবগণের করুণ প্রার্থনায় সদয় প্রজাপতি সার্ব্ববর্ণিক দৃশ্যশ্রব্য ক্রীড়নীয়ক স্বরূপ নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টি করেন।[80]

নাট্যশাস্ত্র-এর অনুসরণে এখানে 'পঞ্চম বেদ' হিসেবে নাটককে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে পাঠ, সামবেদ থেকে সংগীত, যজুর্ব্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ব্ব থেকে রস নিয়ে যে এই পঞ্চম বেদের উৎপত্তি, সে কথা জানাতেও ভোলেননি লেখক। এছাড়া যে যে বিষয় এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছিল, সেগুলি হল:

- প্রথম অধ্যায়:

ইন্দ্রের ধ্বজমহোৎসবে প্রথম নাট্যাভিনয়, দেবদৈত্যদের সমবেত অভিনয় দর্শন, দৈত্যদের ক্রোধ, নাট্যবিঘ্ন উৎপাদন, ইন্দ্রধ্বজের দ্বারা অসুরসহ সকল নাট্যবিঘ্নকে 'জর্জরীভূত' করা, ব্রহ্মা কর্তৃক বিঘ্নশান্তি—

> ব্রহ্মা নাটকে উপস্থিত এইসব বিঘ্ন দেখে "দেবস্থপতি বিশ্বকর্ম্মার প্রতি এক সুলক্ষণসম্পন্ন নাট্যমন্দির নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন, বিশ্বকর্ম্মা অনতিবিলম্বে সর্ব্বলক্ষণযুক্ত রঙ্গালয় প্রস্তুত করিয়া প্রজাপতিকে জানাইলেন, প্রজাপতি মহেন্দ্রাদি দেবগণসহ তৎক্ষণাৎ নাট্যমণ্ডপ পরিদর্শন করতে গেলেন, ব্রহ্মা স্বয়ং রঙ্গপীঠের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।
>
> ...দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা সামনীতির দ্বারা দৈত্য এবং বিঘ্ন সকলকে বশীভূত করিলেন এবং সকলে মিলিয়া নাট্যবেদের পবিত্র রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটনাবৈচিত্র্যে ও রচনানৈপুণ্যে নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তিসমাচার বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।[81]

[80] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩৩।

[81] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩৫-৩৬।

- দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রেক্ষাগৃহলক্ষণ
  - তিন প্রকার নাট্যমণ্ডপ– উত্তম, মধ্যম, অধম – এই প্রকার নাট্যমণ্ডপের গঠন এবং তাদের সুবিধে অসুবিধে।
  - নাট্যমণ্ডপ স্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা– যেমন, ভিত্তিনির্ম্মাণ সমাপন, সুধালেপন, স্তম্ভ স্থাপন, রঙ্গশীর্ষ প্রস্তুত, দারুকর্ম্ম[82], রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, মত্তবারণী, নেপথ্যগৃহ– প্রভৃতি পরিভাষার বিশ্লেষণ ও এগুলি নির্মাণের নির্দেশিকা।

- তৃতীয় অধ্যায়: রঙ্গদেবতাপূজা (বিস্তারিত আলোচনা নেই)
- চতুর্থ অধ্যায়: তাণ্ডব লক্ষণ
- পঞ্চম অধ্যায়: পূর্বরঙ্গবিধান (বিস্তারিত আলোচনা নেই)
- ষষ্ঠ অধ্যায়: রসবিকল্প
- সপ্তম অধ্যায়: ভাবব্যঞ্জক
- অষ্টম অধ্যায়: উপাঙ্গ অভিনয়ের বর্ণনা

দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায় ছাড়া প্রথম থেকে অষ্টম পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েরই বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের দুটি সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের *ভারতী*-র মাঘ সংখ্যার পর এই প্রবন্ধের পরবর্তী কিস্তিগুলি প্রকাশিত হয়নি। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হলে উনিশ শতকের বাঙালির ভরতচর্চার এক পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞান হয়ে থাকত। পূর্ণাঙ্গ না হলেও প্রবন্ধটি যে বাঙালির ভরত-চর্চার উল্লেখযোগ্য দলিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে ব্যতিক্রম প্রকৃতপক্ষে নিয়মকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। ভরত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা-সংবলিত একটিমাত্র প্রবন্ধের কথাই যে এই অভিসন্দর্ভে উঠে এল, তা থেকে

[82] "নাগদন্ত, গবাক্ষদ্বার, স্তম্ভ, কপোতালী প্রভৃতি নির্ম্মাণই দারুকর্ম্ম। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠের দ্বারা ঐ সকল প্রস্তুত করিতে হয়। সমস্ত দ্বার, গবাক্ষ এবং ছিদ্র প্রভৃতি বায়ু চলাচলের পথ এরূপভাবে কর্ত্তব্য যাহাতে নাট্যমণ্ডপের ধ্বনিনির্গমের বাধা ঘটাইতে পারে। কারণ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিনির্গমের পথ থাকিলে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের গভীরতা থাকে না।"

প্রমাণিত হয়, উনিশ শতকীয় নাট্যতত্ত্ব-চর্চার পরিসরে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-কে বহু-আলোচিত গ্রন্থ বলা যায় না, বহুপঠিত তো নয়ই।

কিন্তু ভরত রচিত *নাট্যশাস্ত্র*-এর সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতির পরেও, ভরতের মূলগ্রন্থের প্রতি উনিশ শতকের পণ্ডিত-সমালোচকদের কেন এই অনীহা বা উপেক্ষা?

৬.১.২.৭ ভরতের প্রতি উপেক্ষা এবং *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রতি বাঙালির পক্ষপাতের কারণসমূহ:

আসলে, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* সম্পর্কে উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ‘অনীহা’ বা ‘উপেক্ষা’ বা ‘অবজ্ঞা’র মতো শব্দবন্ধকেই প্রথমে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানো দরকার। যে গ্রন্থ সহজলভ্য, অথচ যার প্রতি পাঠকের মনোযোগ তেমন নিবিড় নয়, কেবল সেই গ্রন্থ সম্পর্কেই অবহেলার অভিযোগে পাঠকগোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করা যায়। এখন প্রশ্ন হল, উনিশ শতকে ভরতের নাট্যশাস্ত্র কি আদৌ সহজলভ্য ছিল?

এর উত্তর পেতে গেলে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রকাশ-ইতিহাসের দিকে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর অংশবিশেষের প্রথম প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা থেকে। এফ হলের সম্পাদনায় *Bibliotica Indica*-র ‘দশরূপক’ অংশে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ এবং চতুর্বিংশ অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই একই বছরে এফ হলের সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*।

এরপর দীর্ঘদিন ভারত থেকে *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রকাশের কোনও খবর পাওয়া যায় না। যথাক্রমে ১৮৮০, ১৮৮১ এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে P. Regnaud-এর সম্পাদনায় প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল Guimet Musium-এর বিবরণীর দুটি খণ্ড (*Annales Musee*

Guimet I & II) এবং *Rhetorique Sanscrit. Annales Musee Guimet I*-এ রোমান হরফে প্রকাশিত হয়েছিল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর 'বাগভিনয়' শীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায়। সেখানে মূলত দশ প্রকারের কাব্যদোষ, দশটি গুণ এবং ভরত উল্লিখিত চারটি অলংকারের আলোচনা ছিল। এই বিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ডে রোমান হরফে প্রকাশিত হয় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর ছন্দ-বিষয়ক দুটি অধ্যায় (পঞ্চদশ অধ্যায়– ছন্দবিভাগ, ষোড়শ অধ্যায়– ছন্দবিচিতি)। সঙ্গে ছিল ফরাসিতে লেখা এই অংশগুলির টীকা। আর *Rhetorique Sanscrit* গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছিল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়— 'রসবিকল্প' ও 'ভাবব্যঞ্জক'। ১৮৮৮ সালে জে গ্রসেটের সম্পাদনায় প্যারিস থেকেই প্রকাশিত হয় *Bibl. de la Faculte de Letteres de Lyon*। এই বইয়ের 'Contribution a l'etude de la musique hindoue' নামক অংশে প্রকাশিত হয় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর 'যন্ত্রসঙ্গীতবিধি' নামক অষ্টবিংশ অধ্যায়।

তবে ১৮৯৪ সালের আগে পর্যন্ত ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর কোনও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। অংশবিশেষের প্রকাশের যে সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলিও মূলত প্যারিস থেকে। ১৮৬৫-তে *Bibliotica Indica*-র পর ভারতে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রকাশ প্রায় তিন দশকের জন্য স্থগিত ছিল। *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি অবশ্য ভারত থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল (কাব্যমালা সংস্করণ, ১৮৯৪, ১-৩৭ অধ্যায়)। কাব্যমালা সংস্করণের প্রকাশকালে *নাট্যশাস্ত্র*-এর টেক্সট খুব একটা সহজলভ্য ছিল না এবং সঠিক পাঠ উদ্ধারে রীতিমতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এই গ্রন্থের প্রকাশকের বক্তব্য থেকেই সে কথা বোঝা যায়—

> সম্প্রতি এই শাস্ত্রের বিরল প্রচারবশত বহু কষ্টে দুই খানি মাত্র পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং দুই পুস্তকেই এক প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত

> হইয়াছে; সুতরাং অজ্ঞাত এবং সন্দিগ্ধ পাঠের বাহুল্যে শুদ্ধিপরিশ্রমও অশুদ্ধিসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।[83]

এরপর আবার প্যারিস থেকে ১৮৯৮ সালে জে গ্রসেটের সম্পাদনায় *Annales de l'Universite de Lyon*-এর অংশ হিসেবে 'Traite de Bharata surle Theatre' নামে রোমান হরফে *নাট্যশাস্ত্র*-এর প্রথম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। গোটা উনিশ শতক জুড়ে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশের আর কোনও হদিশ পাওয়া যায় না।

এর সঙ্গে যদি *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রকাশতথ্যের তুলনা করি তবে দেখা যায় উনিশ শতকের সময় পরিসরের মধ্যেই *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর অন্তত তিনটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে' *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। যেখানে ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* বা ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর টেক্সটের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় ঘটবে ১৮৬৫-তে, সেখানে প্রায় চার দশক আগেই বাংলায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বনাথ কবিরাজের টেক্সট। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই মুদ্রিত সংস্করণটি নিঃশেষিত হওয়ার খবরও পাওয়া যায়। শুধু একবার নয় ১৮৬৫-এর মধ্যেই অন্তত দু-বার প্রকাশিত হয় *সাহিত্যদর্পণঃ*। ১৮৫০ সালে ড. রোয়ার *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। আবার ১৮৬৫-তে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ

[83] বিদ্যার্ণব, "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র," ৭৩২।

করেন বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ ড. বেলেন্টাইন্। তাঁর মৃত্যুর পর তা শেষ করেন প্রমদাদাস মিত্র।[84]

সুতরাং উনিশ শতকের বাঙালির নাট্য-বিষয়ক আলোচনা ভরত বা ধনঞ্জয়ের তুলনায় *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ওপরই বেশি নির্ভর করে থাকবে, এই-ই স্বাভাবিক ছিল। বাঙালির ভরতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা কেবল বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ভারতের নাট্যতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে ভরত-সম্পর্কিত আলোচনা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বেশ কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে এর পাণ্ডুলিপির দুষ্পাঠ্যতার কারণে। কেইথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> The work, which we have under the title *Bharatiya Natyaçästra* is *extremely badly preserved in the manuscript tradition*, a fact due in part to the comparatively late date of any commentary upon it.[85]

নাট্যশাস্ত্র-এর পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি, আর তারই সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে উনিশ শতকের বাংলার নাট্যচর্চায় পুরোধা তাত্ত্বিকের আসন লাভ করেছিলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ।

সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* ছিল অতিকথন দোষে দুষ্ট। দীর্ঘ ৩৭-৩৮ অধ্যায়ব্যাপী এত বহুমুখী বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছিল যে পরবর্তীকালের কোনও লেখকের পক্ষে একে অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে পড়ে। সংহতি বা পরিমিতিগুণ *নাট্যশাস্ত্র*-এর ছিল না বললেই চলে। সেই অভাবটি দূর করার চেষ্টা করেছিল চার অধ্যায়ে (চারটি প্রকাশে) বিন্যস্ত ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*। *দশরূপ*

---

[84] ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা," *নব্যভারত* ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ): ৩১৫।

[85] A. B Keith, *The Sanskrit Drama in its Origin, Development: Theory and Practice* (London: Oxford University Press, 1924), 291. [নজরটান আরোপিত]

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত ও সুগ্রথিত। কিন্তু *সাহিত্যদর্পণ*-এর মতো তা অনায়াসবোধ্য নয়। সেই কারণেও উনিশ শতকের বাঙালির নাট্যতত্ত্বচর্চা অনেকখানি *সাহিত্যদর্পণঃ*-কেন্দ্রিক হয়ে রইল শেষ পর্যন্ত।

৬.২ উনিশ শতক: সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণার অধ্যায়?

> পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি কি না – ইহা রূপক, কি উপরূপক, -- নাটক, কি প্রকরণ, কি ব্যাযোগ কি ত্রোটক; -- ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি – এ সকল তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি! মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংস্কৃতি প্রভৃতি নির্ব্বাচনে আমরা অসমর্থ। নায়ক ললিত কি শান্ত, ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত – নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা, মুগ্ধা কি প্রৌঢ়া – কোথায় তিনি বাসকসজ্জা, কোথায় উৎকণ্ঠিতা, কোথায় বিপ্রলব্ধা, কোথায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা—তাঁহার হাব ভাব হেলা, লীলা বিলাস বিচ্ছিত বিভ্রম বিকৃতাদি কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—তাহার বিচার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহ। কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কিনা—কোন্ অঙ্কে কোন রস প্রধান –কোথায় কোন্ ভাব, -- হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব, -- নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারী ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব ; --কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন্ বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমরা সোজা কথায় তাঁহাকে বুঝাইতে চাহি – এই কবির সৃষ্টি ভালো লাগে, কি ভালো লাগে না; পাঠক যদি ইহার অধিক আকাঙ্ক্ষা না করেন তবে আমাদিগের অনুবর্ত্তী হউন।[86]

[86] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১০৮-০৯।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুপঠিত ও বহুচর্চিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ থেকে। পত্রিকাপাঠে পাওয়া গেলেও গ্রন্থপাঠে অবশ্য এই অংশটি অনুপস্থিত। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কয়েকটি কাব্যতত্ত্বগত পরিভাষার প্রতি লেখকের প্রগাঢ় অনাস্থা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, নাটক, প্রকরণ, ব্যায়োগ, ত্রোটক বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য প্রভৃতি। এই পরিভাষাগুলি কিন্তু প্রায় সবই ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর অন্তর্গত।

নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্বে উল্লিখিত শ্রেণিবিন্যাসের প্রতি এই বিতৃষ্ণা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের একার নয়। প্রায় সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে একাধিক বিখ্যাত ব্যক্তির বয়ানে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা গোপন থাকেনি। এই প্রসঙ্গে আরেকজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা যে চিঠিতে *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর বিধি সম্পর্কে তাঁর আনুগত্যহীনতা প্রকাশ পায়, সে চিঠি বেশ পরিচিত এবং *সাহিত্যদর্পণঃ* সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে নিজের নাটকে 'something of a foreign air' এর উপস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েই মধুসূদন ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর নাটকের টার্গেট অডিয়েন্স তাঁরাই "…whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking."[87] অতএব এই পরিস্থিতিতে তাঁর লক্ষ্য হল – "To throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit."[88]

এই মন্তব্য যিনি করেন, বলা বাহুল্য, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব খুব একটা অনুকূল ছিল না।

---

[87] ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পা., *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী* (কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), ১২৩।
[88] গুপ্ত, *পত্রাবলী*, ১২৩।

৬.৩ সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি আগ্রহের সূচনা

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মধুসূদন দত্তের মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের বিমুখতা সত্ত্বেও উনিশ শতকে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যতত্ত্ব সর্বাঙ্গীণ উপেক্ষার সম্মুখীন হয়নি। *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর আলোচনাসূত্রে এই অভিসন্দর্ভে উঠে এসেছে নাটক বিষয়ক তিনটি রচনার কথা— 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়', 'নাটক পরিচ্ছেদ' এবং 'প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য'। শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট এই তিনটি প্রবন্ধের মূল আলোচ্য ছিল সংস্কৃত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধে ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যতাত্ত্বিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যেমন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*-র ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় ভাগে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' নামক যে প্রবন্ধ লেখেন সেখানে ভরত এবং ধনঞ্জয়ের উল্লেখ আছে। *ভারতী* পত্রিকায় দ্বাবিংশ বর্ষে প্রকাশিত হয়েছে *ভরতের নাট্যশাস্ত্র*-এর বিস্তারিত আলোচনা।

ক্রমিক সংখ্যা	লেখকের নাম	প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা/গ্রন্থ	বর্ষ এবং সংখ্যা
১	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	**উত্তরচরিত**	*বঙ্গদর্শন*	প্রথম বর্ষ, আষাঢ় ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৮৮-৯১, ১০৮-১১৭, ১৬৩-১৭০, ২০১-২০৮, ২৬৮-৭৮)
২	অজ্ঞাত	**যাত্রা**	*বঙ্গদর্শন*	প্রথম বর্ষ, পৌষ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৪৫৬-৬৪)
৩	রামদাস সেন	**হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়**	*বঙ্গদর্শন*	দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রাবণ ১২৮০ বঙ্গাব্দ ১২১ (পৃ. ১৪৯-১৫৮)

৪	অজ্ঞাত	**নাটক পরিচ্ছেদ**	*বঙ্গদর্শন*	চতুর্থ বর্ষ, শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গাব্দ (পৃ. ১৮২-১৮৬)
৫	কালীপদ ঘোষ	**কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল**	*ভারতী*	তৃতীয় বর্ষ, পৌষ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৩৭০)
৬	বাণীনাথ নন্দী	**অভিনয়ের উপযোগিতা**	*নব্যভারত*	সপ্তম বর্ষ, ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ (পৃ. ২৫৩)
৭	সিদ্ধেশ্বর রায়	**বঙ্গ সাহিত্যে নাটক সৃষ্টি**	*নব্যভারত*	সপ্তম বর্ষ, মাঘ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৪৬৯)
৮	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	**প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য**	*ভারতী*	চতুর্দশ বর্ষ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৮৬, ১৭৫, ৩৩০, ৫৭১)
৯	সুরেশচন্দ্র বল	**হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব**	*নব্যভারত*	অষ্টম বর্ষ, কার্ত্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৩৯১-৯২)
১০	শিবধন বিদ্যার্ণব	**প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র**	*ভারতী*	দ্বাদশ বর্ষ, অগ্রহায়ণ এবং মাঘ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৭৩২-৪২, পৃ. ৮৪৯-৮৭২)
১১		**মাসিক সাহিত্য সমালোচনা**	*সাহিত্য*	নবম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩০৫ বঙ্গাব্দ (পৃ. ৬৫২)
১২	বিহারিলাল সরকার	**অভিজ্ঞানশকুন্তল ও পদ্মপুরাণ**	*জন্মভূমি (পত্রিকা) শকুন্তলা-রহস্য (গ্রন্থনাম)*	আষাঢ়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

উনিশ শতকে প্রকাশিত নাটক-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ

ওপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যদিও উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালির নাট্যচর্চায় সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ভূমিকা ছিল খুবই অল্প। ‘উত্তরচরিত’-এর মতো যে দু-একটি প্রবন্ধে নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেখানেও নাট্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছিল

নেতিবাচকভাবে। এই চিত্র কিন্তু পাল্টে যেতে থাকে ১৮৭২-এর পরবর্তী সময়ে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্র-এর শ্রেণিবিভাগকে নস্যাৎ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরের বছরই ওই একই পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়' প্রবন্ধে উনিশ শতকের প্রথমদিকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য উপেক্ষিত ছিল বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন রামদাস সেন। এর পরবর্তীকালে প্রকাশিত সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কমবেশি সব রচনাই নাট্যতত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের কথা। ১৮৭২ সালের পর থেকেই কেন এভাবে বদলে গেল সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চার অভিমুখ? ১৮৭২-এর পর থেকে মোটের ওপর সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বকে উপেক্ষা করতে পারেনি উনিশ শতকের বাঙালি। কেন পারেনি তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন কোন পথে কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছিল উনিশ শতকের বাঙালির নাট্যচর্চা।

৬.৪ উনিশ শতকে বাঙালির নাট্যচর্চার বিভিন্ন ধারা

মনে রাখা প্রয়োজন, উনিশ শতকের সাতের দশক বাঙালির জাতীয় থিয়েটার-সন্ধানের সময়কালও বটে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক। ধনীগৃহের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেই সাধারণ বাঙালির জন্য উন্মুক্ত হয় থিয়েটারের দ্বার। এই বছর শ্যামবাজার নাট্যসমাজ মঞ্চস্থ করে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'। 'লীলাবতী'র সাফল্যের পর ৭ ডিসেম্বর চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে অভিনীত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। এই ঐতিহাসিক অভিনয় দিয়েই বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের পথ-চলার শুরু।

বাংলা থিয়েটার এই নতুন যুগে প্রবেশের আগে বাঙালির নাট্যচর্চার ধারা মূলত তিনটি দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার* বইতে সুবীর

রায়চৌধুরী ১৮৭২-এর পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির নাট্যচর্চার এই তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১) বিদেশি থিয়েটারের ধারা: এই পথের অনুবর্তন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা সকলেই মূলত ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি।

২) স্বদেশি লোকনাট্য বা যাত্রার ধারা: এই ধারাটি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রভাবের যুগে শিক্ষিত মহলে এই ধারার সমাদর ক্রমেই কমে আসছিল।

৩) সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের ধারা

এই তিনটি ধারা কীভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল, তার ফল কীভাবে নির্ধারণ করেছিল সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চার গতিপ্রবাহকে তা দেখে নেওয়া যাক।

৬.৫ 'ক্লাসিক' সংস্কৃত রীতির প্রতি প্রকট পক্ষপাত

বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটারটি নির্মিতই হয়েছিল ইংরাজি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় দর্শকদের জন্য। ১৮৩১-এ নারকেলডাঙার 'হিন্দু থিয়েটার'-এর অভিনয় প্রদর্শন শুরু হয়েছিল দুটি নাটক দিয়ে। শেক্সপিয়ারের *জুলিয়াস সিজার* এবং ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এর ইংরাজি অনুবাদ। অর্থাৎ তথাকথিত পরিশীলিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত থিয়েটার-নির্মাতারা অভিনয়যোগ্য বলে মনে করেছেন হয় শেক্সপিয়ারের মতো ক্লাসিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ইংরেজ লেখকের নাটককে, অথবা সংস্কৃত নাটকের ইংরাজি অনুবাদকে। উইলিয়াম জোন্স, ম্যাক্সমুলার প্রমুখের প্রাচ্যসংস্কৃতি চর্চা ততদিনে সংস্কৃত নাটকের গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করে দিয়েছে তথাকথিত 'শিক্ষিত' বাঙালির মননে।

কিন্তু এ দুই পথের বাইরে বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার সন্ধানের প্রচেষ্টা ১৮৭২-এর আগে ছিল না বললেই চলে। লেবেদেফের থিয়েটারের নামকরণ[89] থেকে চরিত্রনির্মাণ[90], মঞ্চসজ্জা[91] থেকে বিজ্ঞাপন[92]– সব ক্ষেত্রেই বাঙালি দর্শক টানার সোৎসাহ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লেবেদেফের প্রচেষ্টার উত্তরাধিকার বা সাফল্য প্রশ্নাতীত না হলেও, নিজে রাশিয়ান হয়ে বাঙালিকে 'বাংলা থিয়েটার' উপহার দেওয়ার যে অদম্য প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছিল, বাঙালিদের নিজস্ব নাট্যচর্চায় তার আশ্চর্য অনুপস্থিতিই চোখে পড়ে।

অবশ্য বাংলার নিজস্ব থিয়েটার বা 'জাতীয় থিয়েটার' গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বাঙালি যে একেবারেই অনুভব করতে পারেনি, এমন নয়। নিজের প্রহসন লেখা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করতে গিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন—

> …we have not as yet got ***a body of sound classical dramas to regulate the national taste***[93]

জাতীয় রুচি যথাযথভাবে গড়ে ওঠার আগেই দেশীয় ছাঁদে লঘু চালের প্রহসন লিখে তা প্রকাশ করে ফেলায় মধুসূদন অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর রচনাগুলি দেশের মানুষের উপযুক্ত রুচিগঠনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে। মধুসূদনের মতে, জাতীয় রুচি গড়ে দিতে সাহায্য করবে 'সাউন্ড ক্লাসিকাল ড্রামা'। স্পষ্টতই এই

---

[89] বেঙ্গলি থিয়েটার

[90] চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা জাতীয় কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছিল বাঙালি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য।

[91] আলপনা, কলাপাতা প্রভৃতির ব্যবহার।

[92] 'Decorated in Bengalee Style' এবং 'Indian Serenade' এই শব্দদুটি বিজ্ঞাপনে ব্লক লেটার ব্যবহার করে লেখা হয়েছিল। প্রথম অঙ্ক সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল 'Entirely Bengalese' এবং তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল 'translated entirely into/Bengalese'

[93] গুপ্ত, *পত্রাবলী*, ১২৯। [নজরটান আরোপিত]

‘সাউন্ড ক্লাসিকাল ড্রামা’ বলতে মধুসূদন কোনও দেশীয় ভাষার নাটক বোঝাননি। বুঝিয়েছেন ‘ধ্রুপদি’ সাহিত্য বলে পরিচিত ইংরাজি বা সংস্কৃত নাটককে। আসলে পরাধীন, অবমানিত ও ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা বর্বরতার অভিযোগে অভিযুক্ত বাঙালি জাতি তখন এই ‘ধ্রুপদি’ রুচিকেই করে তুলতে চাইছিল নিজের আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই মাতৃভাষায় নাটক অভিনয়ের তাগিদ অনুভব করলেও ‘মাতৃভাষার নাটক’ বলতে প্রধানত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকেই গ্রহণ করল ব্রিটিশ-শাসিত বাঙালি। ১৮৫৭ সালের ৩০ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-এর অনুবাদ। এই নাটক সম্পর্কে *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকা লিখেছিল—

> The play announced was a *genuine Bengallee one*, being a translation of the well-known dramatic execution of Kally Doss – The Sacoontollah.[94]

অর্থাৎ কালিদাসের *শকুন্তলা*-ই সে সময়ের বিচারে ‘খাঁটি বাংলা’ নাটক। ওইবছরেই জোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার* (রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত) এবং কালিদাসের *বিক্রমোর্ব্বশী* (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত)।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্যের জেরে বাংলায় নাটক (‘native drama’) করার এজেন্ডা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল যে দল, তারাই প্রতিষ্ঠা করে বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮)। এই থিয়েটারের পথ চলার শুরুও কিন্তু খাঁটি বাংলা নাটকের অভিনয় দিয়ে হয়নি। হয়েছিল একটি সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের দ্বারা— শ্রীহর্ষের

---

[94] সুবীর রায়চৌধুরী ও স্বপন মজুমদার সম্পা., *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার* (কলকাতা, দে'জ, ১৯৯৯), ৩১। [নজরটান আরোপিত]

রত্নাবলী (রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত)। একইভাবে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে অভিনীত হয় কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ধনীব্যক্তিদের গৃহে অভিনীত নাটকের তালিকা দেখলেই সংস্কৃত নাটকের প্রতি তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালির পক্ষপাতটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদেশি শাসক প্রদত্ত 'অসভ্য দেশীয় মানুষ'-এর তকমাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে নিজেদের 'ধ্রুপদি' আত্মপরিচয়কে সামনে আনার তাগিদ তৎকালীন বাঙালি অনুভব করেছিল। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজি ক্লাসিক নাটকের পাশাপাশি যে ধরনের নাটককে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল, তা হল প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। ধ্রুপদিয়ানা অর্জনের ঐকান্তিক এই আগ্রহের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল মৌলিক বাংলা নাটক।

৬.৬ উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব: অবজ্ঞা থেকে অনুধ্যান— কারণ সন্ধান

১৮৭২-এর আগে বাংলায় সংস্কৃত নাটকচর্চার যে বাহুল্য দেখা যায়, তা দেখে মনে হতে পারে, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের চর্চারও গুরুত্ব পাওয়ার কথা এই সময়ের বাংলায়। কিন্তু তা ১৮৭২-এর পূর্বে এত দূর অবহেলিত হল কেন? কেনই বা বাংলা মৌলিক নাটকচর্চার প্রাচুর্যের সময়েই সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব গুরুত্ব পেতে লাগল? কী রহস্য লুকিয়ে আছে এই আপাত স্ববিরোধিতার আড়ালে?

আসলে এক ক্লাসিক ভাষাসংস্কৃতিজাত সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনা অন্য এক দেশীয় ভাষার তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরে তখনই প্রবেশ করে, যখন দেশীয় মানুষের কাছে ওই ক্লাসিক ভাষার সাহিত্যতত্ত্ব পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেন লেখক-সমালোচকের দল। ১৮৭২ এর আগে সংস্কৃত নাটক বহুল পরিমাণে মঞ্চস্থ হলেও তা ছিল ধনীব্যক্তি ও বাবুদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমাবদ্ধ। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ

ছিল নিষিদ্ধ। নাটকের মতো 'সূক্ষ্মরুচি'র শিল্পে জনসাধারণের অধিকারই স্বীকৃতি পায়নি তখন। উনিশ শতকের প্রথম দিক জুড়ে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত থিয়েটার-বোদ্ধাদের দেশীয় অভিনয়রীতি, দেশীয় রুচি, সাধারণ দর্শক— এই সবকিছুর প্রতিই চরম অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য চোখে পড়ে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে উইলসন অনূদিত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের সময়ে 'অকারণ কোলাহল' হওয়ায় *এশিয়াটিক জার্নাল*-এ এমন একজন সমালোচক 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' ছদ্মনামে লিখেছিলেন—

> We recommend our Hindu patriots and philanthropists to instruct their countrymen by means of schools and when they are fitted to appreciate the dramatic compositions of refined nations, it will be quite time enough to erect theatre… [95]

দেশবাসীর শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তীব্র শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ করেই যে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, তারা 'dramatic compositions of refined nations'-এর রসাস্বাদনের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত তাদের জন্য ইংরাজিতে নাটক রচনা করা বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা যে পণ্ডশ্রম মাত্র, সে কথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে ভোলেননি—

> A theatre among the Hindus with the degree of knowledge they at present possess will be like building a palace in the waste.[96]

এই উন্নাসিকতা, ইংরাজি শিক্ষার এই অহমিকা সেইসময়ের বাঙালির নাট্যচর্চা এবং সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চারও নির্ধারক হিসেবে কাজ করেছিল। দেশীয় মানুষের বোধশক্তি দ্বারা ইংরাজি নাটকের মর্মগ্রহণ অসম্ভব বলে মনে করেছেন যে 'শিক্ষিত' সমাজ; দেশীয় দর্শকের কাছে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বকে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদও কি অনুভব করবেন তাঁরা?

---

[95] Hemendranath Das Gupta, *The Indian Stage* (Calcutta: 1934), 283-84.

[96] Gupta, *Indian Stage*, 283-84.

সাধারণ মানুষের প্রতি এই অপরিমিত অবজ্ঞাই উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চাকে প্রায় মুছে দিয়েছিল। কিন্তু এই অবজ্ঞার মনোভঙ্গি উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ দর্শককে আর অবজ্ঞার উপায় ছিল না। তাই খাঁটি বাংলা নাটকচর্চার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃত নাটকচর্চার দুয়ারও হয়তো খুলে দিতে চাইলেন উনিশ শতকের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা। হয়তো তাঁরা চাইছিলেন বাংলা নাটক নিজের আলোকিত গন্তব্য খুঁজে নেওয়ার আগে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের উত্তরাধিকারেও উদ্ভাসিত হোক বাঙালির মননভূমি। অতএব বাংলাতেই রচিত হতে থাকল সংস্কৃত নাটক-বিষয়ক আলোচনা। নাটক-বিষয়ক আলোচনা গুরুত্ব পেলে উপেক্ষিত থাকতে পারে না নাট্যতত্ত্বও। অতএব বাংলায় সংস্কৃত নাটকচর্চার অনিবার্য ফল হিসেবেই চর্চিত হচ্ছিল সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বও।

উপসংহার

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বচর্চার নিরিখে উনিশ শতক ছিল এক আলোছায়াময় সন্ধিক্ষণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচার-পদ্ধতিকে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, কেউ আবার নস্যাৎ করতে চেয়েছেন তার গুরুত্ব।

তৃতীয় থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ভারতে নির্মিত বিভিন্ন সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রস্থান সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হল এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে। উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির ভারতীয়-কাব্যতত্ত্বপাঠের বিবরণ দেওয়া হল প্রথম অধ্যায়ে। উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয়-কাব্যতত্ত্বপাঠের প্রেক্ষাপট কীভাবে আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল— তা জানতে এই অংশটি জরুরি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রইল অলংকারবাদ, অলংকার এবং অলংকারবাদী আচার্যদের সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির চিন্তাসূত্রের পরিচয়। *সাহিত্যদর্পণঃ*-রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং *কাব্যপ্রকাশ*-রচয়িতা আচার্য মম্মটের আলোচনা যেভাবে উনিশ শতকের বাংলায় উঠে এসেছে তার পরিচয় বিধৃত রইল তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে থাকল উনিশ শতকীয় দৃষ্টিতে ভারতীয় রসতত্ত্ব এবং একাধিক রসের পর্যালোচনা। ভারতীয় নাট্যতত্ত্বকে কীভাবে পরিগ্রহণ করেছিল উনিশ শতক তার দলিল রইল অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ দেখা গেল, উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গি থেকে তার কারণ অনুমান কঠিন নয়। উনিশ শতকের বাঙালি চাইছিল তার আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য। সাহিত্যতত্ত্বে তার নিজস্ব তাত্ত্বিক অবস্থান নির্মাণে ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব যে সহায়ক হয়ে উঠবে, এই তো স্বাভাবিক! কিন্তু ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে যেখানে তার নেতিবাচক দৃষ্টি দেখা যায়, সেই কারণগুলি

আরও নিবিড় অনুসন্ধান দাবি করে। সংস্কৃত রসতত্ত্বের প্রতি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্যের কারণ কী? ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণের প্রতিবন্ধক হিসেবে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে—

১. অপরিচিতি

১৮৩৫-এ মেকলের মিনিটের মাধ্যমে ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাদানই সরকারি নীতি হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছিল। ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ যে ক্রমহ্রাসমান হয়েছিল— এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উনিশ শতকে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই পাশ্চাত্যশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বিদগ্ধ ব্যক্তিরই সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ছিল ঠিকই। কিন্তু এই সময় থেকে সংস্কৃত সম্পর্কে আগ্রহ খুব ধীরে হলেও, কমে আসছিল। বিদ্যাসাগর এ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

> এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা-পড়ার চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।[1]

আবার বিদ্যাসাগরেরই অনুরোধে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি শিক্ষক নিয়োগ করা হলে সংবাদ প্রভাকর-এর প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

> সংস্কৃত কালেজে পূর্ব্বে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার পাঠনা হইত এইক্ষণে আর তদ্রূপ হয় না, ইংরাজী পাঠনাই অধিক হইতেছে, বোধ

[1] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব," *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২০), ৪১৭।

> হয় অতঃপর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠনাকার্য্য এককালে উঠিয়া যাইবেক।[2]

অথচ, ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে চর্চার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচিতি আবশ্যিক। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ববিষয়ক বইগুলিতে আলংকারিকদের প্রদত্ত সমস্ত উদাহরণই সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকে গৃহীত। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য, বৈদগ্ধ্য, ধ্বনিমাধুর্য, ওজস্বিতা ইত্যাদি সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালির ধারণার অভাবই তাকে একাধারে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের প্রতি বিমুখ করে তুলছিল।

২. সংস্কৃত রসতত্ত্বের পাঠক-মনস্তত্ত্বনির্ভরতা

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্য সমালোচনারীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, উনিশ শতকের বাঙালিরা কবির পারিপার্শ্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইতিহাস, কবির ব্যক্তিগত জীবনসংক্রান্ত তথ্য— এগুলিকেই সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনার মানদণ্ড বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যপাঠের এই নতুন প্রথা ধীরে ধীরে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিমূর্ত 'বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র মানদণ্ড'টিকে[3] বিলুপ্ত করে দিচ্ছিল। দশম শতাব্দী-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রসতত্ত্বের কেন্দ্রীয় চিন্তন প্রধানত অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি কাব্য-নাটকের মধ্যস্থিত উপাদান হলেও রসের অভিব্যক্তি ঘটে সহৃদয় কাব্যপাঠকের হৃদয়ে। সুতরাং ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের নতুন ধারাটি[4] মূলত মনস্তত্ত্বনির্ভর। রসবাদ আসলে সাহিত্য-পাঠকের মনস্তত্ত্বনির্ভর একটি তত্ত্ব, যা পাঠকের হৃদয়গত ভাবের দিকে লক্ষ রেখে সাহিত্যের কিছু

[2] *সংবাদ প্রভাকর,* ৩ বৈশাখ, ১৭৭৯ শকাব্দ।

[3] বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "অলঙ্কার-শাস্ত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১২৫।

[4] পুরনো ধারাটির প্রতিনিধিস্থানীয় তাত্ত্বিক ছিলেন বামন, দণ্ডী রুদ্রট প্রমুখ।

সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করে। পাশ্চাত্যে কিন্তু পাঠকের মনস্তত্ত্ব সাহিত্যপাঠের পরিসরে গুরুত্ব পেয়েছে অনেক পরে, বিংশ বা একবিংশ শতকে। লেখকের মনস্তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে Surrealism (পরাবাস্তবতাবাদ) বা Stream of Conciousness (চেতনাপ্রবাহী রীতি)-র বিকাশও উনিশ শতকে হয়নি[5]। ফলে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত বাঙালিরা যে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে আত্মিক যোগ তেমন খুঁজে পাবেন না, এটাই স্বাভাবিক।

৩. সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের সংকীর্ণতা, উদারতার অভাব, নির্দেশাত্মক প্রকৃতি

অলংকার-শাস্ত্রকে উনিশ শতকের বাঙালি কেবল কিছু figure of speech এবং সাহিত্যরচনা সম্পর্কে প্রাচীন পণ্ডিত-নির্দেশিত কিছু নিয়মাবলির সমষ্টি বলে মনে করতে শুরু করেছিল। অলংকারশাস্ত্রের এই নির্দেশাত্মক ধরন তাদের এই বিদ্যায়তনিক চর্চা থেকে বিমুখ করেছিল। উনিশ শতকের সমালোচকেরা বার বার অলংকার-শাস্ত্রের চুলচেরা বিভাজনের আতিশয্য ও অর্থহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকক্ষেত্রে, বিশেষত, কাব্যদোষ ও গুণ বিচারে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের যে নির্দেশাত্মক (Prescriptive) চেহারা ফুটে উঠেছে, যে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয়েছে সাহিত্যসৃষ্টিকে— তা উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীক্ষিত বাঙালির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল নিঃসন্দেহে। উনিশ-শতকীয় লেখনী আলংকারিক-নির্দেশিত পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে তৈরি করতে চাইছিল নতুন পথ, যে পথে থাকবে নিজস্বতার আলোকদীপ্তি। সেই কারণেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্য* লেখার মুহূর্তে ভেঙে বেরোতে চাইছিলেন *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর নিয়মতন্ত্র। বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশিত নিয়মাবলির

[5] আন্দ্রেঁ ব্রেতো Manifesto of Surrealism প্রকাশ করেন ১৯২৪ সালে।

বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন না বলে তিনি বিদ্রোহের সুর তুলেছিলেন রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে। সমসাময়িক সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি।[6] এই দ্রোহই উনিশ শতকের স্বাতন্ত্র্য। সম্পদও বটে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ শোনা গেছে কিশোরীমোহন রায়ের কলমে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে *ভারতী* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যাতে তিনি লিখেছেন—

> প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র... যেন একার্থক সাহিত্য সমালোচনা। কালের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান প্রত্যেক সুপরিচিত সাহিত্যের অভিনব শ্রীর উল্লেখ তাহাতে নাই...। অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্যের যে দোষ ও গুণ ভাগ আলোচিত হইয়াছে তাহা ধরাবাঁধা কয়খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার মাত্র; তাহাকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলা যায়,— পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা অত্যাবশ্যক বুঝিলেও সেই বিধিনিষেধ গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করিয়া যাইতেন, একটুও এদিক্ ওদিক্ নড়িবার যো ছিল না। ...তাই এখনকার অভিনব সাহিত্য সমালোচনার স্বভাবের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার তুলনা করিতে যাইলে বিভ্রাটে পড়িতে হয়।[7]

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' প্রবন্ধে মধুসূদনের মতো সংস্কৃত-জানা অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনোভাবের পরিচয় দিয়েই বলা হয়েছে "সংস্কৃত ইংরেজওয়ালারা বলেন, অলঙ্কারশাস্ত্রে রসবোধ না হইয়া কেবল কতকগুলা নীরস বাগাড়ম্বর শিক্ষা হয় মাত্র।"[8] এই প্রবন্ধে আলংকারিকদের 'রুচিশাস্ত্রের ফিলাজফার' বলে সম্মানিত করা হলেও তাঁদের কাজ হিসেবে সাহিত্যরচনার 'মূল নিয়মগুলি' দেখিয়ে

---

[6] "Some other Pandits, literary stars of equal magnitude, say— 'হাঁ, উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয়নি।..." [উৎস: যোগীন্দ্রনাথ বসু, "একবিংশ পত্র," *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫), ২৩০।]

[7] কিশোরীমোহন রায়, "সমালোচক," *ভারতী* ২১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ): ২৫৩।

[8] অজ্ঞাত, "অলঙ্কারশাস্ত্র," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮।

দেওয়ার কথাই বলা হয়েছিল।[9] এমনকি একথাও বলা হয়েছিল যে, “অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও কাব্যে বা বক্তৃতায় সুরুচিবিরুদ্ধ কোন দোষ দেখিলেই চটিয়া যান।”[10] ‘রস’ প্রবন্ধে তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ আলংকারিকদের উদারতার অভাব সম্পর্কে লেখকের উষ্মা গোপন থাকেনি।[11] *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত ‘বাঙ্গালি কবি কেন’ প্রবন্ধেও এ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলা হয়েছিল— “যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা হিন্দু সন্তানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতকমধ্যে গণ্য।”[12] সুশীলকুমার দে পর্যন্ত মনে করেছেন ভারতীয় তাত্ত্বিকদের সমস্ত সাহিত্যিক টেক্সটকে কয়েকটি সাধারণ যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলার প্রবণতার ফলে ব্যক্তিকবির স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতা ও বিচিত্রমুখী প্রতিভা এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আকস্মিকতার দিকগুলি অবহেলিত হয়েছিল—

> By their universality, they negate its accidentality: by their abstraction, its empiricity: by their mechanism, its organic character. Thus, Sanskrit Poetics, attempting to solve the riddle of Poetry did harshly solve it, but delighted itself with the pleasure of abstract thought and formal calculation.[13]

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে কবিদের ব্যক্তিগত রচনাকৌশলের ভিন্নতা ও বিশেষত্ব উপেক্ষিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সুশীলকুমার দে। তেমনি পাঠকের ব্যক্তিগত রুচিভেদের প্রশ্নটি সামনে এনেছিল ‘বঙ্গসাহিত্য’ প্রবন্ধটি—

---

[9] অজ্ঞাত, “অলঙ্কারশাস্ত্র,” ২০।

[10] প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল নিয়মের অনভিজ্ঞতাহেতু ভিন্নতা জন্মে। সেই মূল নিয়মের প্রদর্শক আলঙ্কারিক। [উৎস: অজ্ঞাত, “অলঙ্কারশাস্ত্র,” ২০।]

[11] প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনে যাহাই থাকুক না, আধুনিক আলঙ্কারিকেরা নবাধিক রস স্বীকারে একান্ত অসম্মত। [উৎস: অজ্ঞাত, “রস,” *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮৪-৮৫।]

[12] অজ্ঞাত, “বাঙ্গালি কবি কেন,” *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।

[13] S.K. De, “The Problem of Poetic Expression,” *Some Problems of Sanskrit Poetics* (Calcutta: Firma KLM, 1981), 52.

> ...কে বলিতে পারে যে, যে সকল রসাত্মক বাক্য আমরা এক্ষণে "কিছুই নয়" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি – অন্য সময়ে আমরা তাহাকে প্রকৃত কবিতা নামের যোগ্য মনে করিব না; আবার এক্ষণে আমরা যে সকল কাব্যকে বাক্‌দেবীর পদ্মবনের এক একটি প্রকৃত পদ্ম ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে ধরিতেছি, সময়ে সেই সকল কাব্যকেই আমরা পদ দ্বারা দলিত করিব না? তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাহিত্যদর্পণকারের কথার সার্থকতা কি? যদি রস-অনুভূতিরই এত বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা হইলে কোন নিয়ম দ্বারা আমরা কবিতার প্রকৃতি নিরূপণ করিব?[14]

অর্থাৎ কখনও আলংকারিকরা ব্যক্তিগত কবিপ্রতিভাকে উপেক্ষা করেছেন, এ জাতীয় মনোভাববশত; কখনও বা আলংকারিকদের দ্বারা বৌদ্ধিকচর্চার উদার ক্ষেত্রটি নিয়মতান্ত্রিক সংকীর্ণতায় বদ্ধ হওয়ার ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। এবং এ কারণেই 'সংস্কৃতওয়ালা' এবং 'ইংরেজিওয়ালা' অর্থাৎ প্রাচ্যঘেঁষা ও পাশ্চাত্যঘেঁষা চিন্তকদের মধ্যে এক জাতীয় বিভাজন ও দ্বৈরথ উপস্থিত হয়।

৪. কাব্যতত্ত্ব বনাম অলংকার-শাস্ত্র

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও পাশ্চাত্যসাহিত্যের Rhetoric যে এক নয়, একথাও বুঝতে অক্ষম হয়েছিল উনিশ শতকের তথাকথিত 'শিক্ষিত' বাঙালির একাংশ। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও পাশ্চাত্যসাহিত্যের Rhetoric-কে অভেদরূপে দেখার দৃষ্টান্ত লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়* থেকে *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' প্রবন্ধ— সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। *কাব্যনির্ণয়*-এর প্রচ্ছদে বইটিকে বর্ণনা করা হয়েছে 'A Treatise on Rhetorical Composition' বলে। বইটির সূচনায় অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের

---

[14] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ২২৪-২৫।

তরফ থেকে লেখা যে চিঠিটি ছাপা হয়েছিল সেখানে এবং বইটির বিজ্ঞাপনে একে ‘Book on Bengali Rhetoric’ বা ‘Hindu Rhetoric’ বলেই অভিহিত করা হয়েছে[15]। ‘অলঙ্কারশাস্ত্র’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যখন বলেন ‘ইংরেজিওয়ালারা অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর চটা কেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। এককাল ইউরোপে অলঙ্কারশাস্ত্রের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল’[16], তখনও ইংরাজি Rhetoric এবং সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের পার্থক্যের দিকটি সম্পর্কে লেখকের স্পষ্ট ধারণার অভাবই ফুটে ওঠে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র যাকে বলা হয়, তা কেবল রচনারীতি, রচনাকৌশল, কাব্যের দোষগুণ-নিরূপণ এবং অলংকারের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অনেকখানি বেশি। কীভাবে লৌকিক জগতে ব্যবহৃত কিছু সাধারণ শব্দ কাব্যে অ-লৌকিক মহিমা নিয়ে উপস্থিত হয়, পাঠকের হৃদয়েই বা কীভাবে তার রসাস্বাদন হয়— এই জাতীয় মূলগত প্রশ্নের উত্তর খোঁজাও অলংকারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সত্য উনিশ শতকের বাঙালির দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-নির্মাণে আলংকারিকদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও গভীর মননশীলতার দীপ্তি তাঁদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল।

৫. শ্রেণিবিভাজনের বাহুল্য ও পারিভাষিক জটিলতা

পূর্বোক্ত সমস্যার সঙ্গে ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাজনের বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এর পৌষ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গালি কবি কেন’ প্রবন্ধটির লিখনভঙ্গিমায়

---

[15] লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৯৮), [1].

[16] অজ্ঞাত, “অলঙ্কারশাস্ত্র,” *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): পৃষ্ঠা ১৮।

রসের নানা বিভাগ-উপবিভাগ সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা যে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ, এমন কথা বলা যায় না। প্রবন্ধকার বলেছেন—

> প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভূত ছিল, এখনও সেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম আছে, কিন্তু রসের যারপরনাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় নাই বটে... কিন্তু শাখাপ্রশাখার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে।[17]

এই প্রবন্ধেই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত নটি রসের মধ্যে 'শান্তিরস'-এর 'একটি শাখা' হিসেবে 'চৌষট্টিবিধ' 'ভক্তিরস'-এর উল্লেখ করা হয়েছে।[18] উপরন্তু, এই প্রবন্ধে 'রস' শব্দটিকে যেভাবে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে[19] তাতে, রসতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বিরাগ না প্রদর্শিত হলেও, রসের তত্ত্বগত সংজ্ঞা সম্পর্কে যে উপেক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বিদ্যাসাগর স্বয়ং সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দৃশ্যকাব্যের অতিরিক্ত শ্রেণিবিভাজনকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে

---

[17] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন: মাসিক পত্র ও সমালোচন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮৫।

[18] অজ্ঞাত, "বাঙ্গালি কবি কেন," *বঙ্গদর্শন* ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।

* এই তথ্যের উৎস হিসেবে লেখক *হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-র উল্লেখ করলেও এ তথ্য যে শ্রীরূপগোস্বামী প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের অনুসারী নয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, এই রসতত্ত্ব অনুযায়ী ভক্তিরস শান্তিরসের কোনও শাখা নয়, ভক্তির স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি যেটি, এই তত্ত্বানুসারে, একমাত্র মুখ্য স্থায়িভাব। কৃষ্ণরতি বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনের গুণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। 'এইরূপে ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার' (*চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ৯)– শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। প্রথাগত ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের শৃঙ্গার ছাড়া অবশিষ্ট সাতটি রস বৈষ্ণব রসতত্ত্বে গৌণ স্থায়িভাবের অন্তর্গত।

[19] 'গোপাঙ্গনাদিগের অনুরাগ জীবন্ত, কেন না এ রস পরকীয়...জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসাইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপ ভালবাসাইয়া বৈষ্ণব ধর্মকে এক অপূর্ব রস করিয়া রাখিলন। সে রস যদিও দেবদেবী লইয়া... সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া, সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন...।' [উৎস: অজ্ঞাত, "বাঙ্গালি কবি কেন," *বঙ্গদর্শন: মাসিক পত্র ও সমালোচন* ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৩৯৩।]

সংস্কৃত আলংকারিক-নির্দেশিত আঠেরোটি শ্রেণির বদলে সমস্ত দৃশ্যকাব্যকে ‘নাটক’ নামে অভিহিত করলেই তা যুক্তিযুক্ত হত—

> আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্ব্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্য কাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এত সামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্য কাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্য কাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দ্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।[20]

‘জটিল সন্ন্যাসী’ ছদ্মনামধারী *আর্য্যদর্শন* পত্রিকার লেখকও সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের অর্থহীন শ্রেণিবিভাজনের আতিশয্যকে শ্লেষবিদ্ধ করেছেন—

> এই সমস্ত রূপক ও উপরূপককে নাটক বলিলে, কোন রূপ অসুবিধা হইত বলিয়া বোধ হয় না। যদি সহস্র প্রকার নাটক থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা, প্রণালী, উপাখ্যান, নায়ক চরিত ও নায়িকার ভাব অবশ্যই পৃথক্ পৃথক্ হইবে, সন্দেহ নাই। এখন এক জন আলঙ্কারিক বাহির হইয়া, ঐ সহস্র প্রকার নাটকের গবূতি, কব্যূতি, হাম্বীর, শঙ্খ, রঙ্গপট্ট, পটমঞ্জরী ও জয়াজয়ন্তী প্রভৃতি হাজার প্রকার নাম দেন ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করেন, আর *দেশীয় সভ্যগণ যদি ‘আমাদের দেশে সহস্রপ্রকার রূপক ও দুই সহস্র প্রকার উপরূপক আছে বলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচেন, তাহা হইলে ঐ সভ্যগণের বুদ্ধিমত্তা যে কিরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল লোক নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা ও*

---

[20] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৪।

পদার্থজ্ঞান-রহিত, তাহারাই ঐরূপ সূত্র করিয়া সামাজিকগণের অরুচি-ভাজন হইয়া পড়েন। [21]

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে অতিরিক্ত শ্রেণিবিভাজনের ফলে বাড়ছিল পারিভাষিক জটিলতাও। এই প্রসঙ্গে *সাহিত্য* পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'সহযোগী সাহিত্য' অংশের অন্তর্গত 'কন্টেম্পোরারি রিবিউ' শীর্ষক রচনাটি উল্লেখ্য। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোর যে মহাসম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার কথা সর্বজনবিদিত, সেখানে ধর্মভাবনার পাশাপাশি নানা দেশের সাহিত্য-শিল্প-দর্শনচিন্তাও আলোচিত হয়েছিল। *Contemporary Review*-এর জানুয়ারি সংখ্যায় শিকাগো-মহাসম্মিলনের সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনার বিবরণী-সমৃদ্ধ 'Literary Conferences'[22] নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। *সাহিত্য* পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের একটি বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছিল। সমালোচক সেখানে পরিভাষাগত জটিলতায় সমাকীর্ণ সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র সম্পর্কে বলেন—

এদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রই আমাদের আশ্রয়স্থল, কিন্তু তাহা পারিভাষিকে এরূপ প্লাবিত যে, প্রকৃত তত্ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার।[23]

এইভাবেই উনিশ শতকে তৈরি হচ্ছিল সংস্কৃত-অলংকারশাস্ত্রবিরোধী বাঙালির নিজস্ব স্বর। উপরের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের পরোক্ষ গৌরবদ্যুতিতে নিজেদের গৌরবান্বিত ভাবছিলেন উনিশ শতকীয় বাঙালির একাংশ। কিন্তু সেই অহংবোধের অসারতা প্রমাণেও সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন কোনও কোনও বাঙালি। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে রস, ব্যভিচারী ভাব, সাত্ত্বিক ভাব, নাট্যবস্তুর অর্থপ্রকৃতি

---

[21] জটিল সন্ন্যাসী, "নাটক চন্দ্রিকা," *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ১৮৮। [নজরটান আরোপিত]

[22] রচয়িতা 'ইংরেজি সাহিত্যের বৃটিশ প্রতিনিধি' ওয়াল্টার বেসান্ট

[23] অজ্ঞাত, "সহযোগী সাহিত্য," *সাহিত্য* ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩০০ বঙ্গাব্দ), ৮৭৭-৮৮১।

(বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য), বৃত্তি (কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি), সন্ধি (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি) নায়ক (ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত)— প্রভৃতি বিভাজনের বাহুল্যে বিরক্ত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই *উত্তররামচরিত* নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠককে অলংকারশাস্ত্র বিস্মৃত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন—

> পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। আমরা আলঙ্কারিক নহি। অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের বিশেষ ভক্তি নাই। এই উত্তরচরিত বাস্তবিক নাটক লক্ষণাক্রান্ত কি কি না— ইহা রূপক, কি উপরূপক,— নাটক, কি প্রকরণ, কি ব্যায়োগ কি ত্রোটক—; ইহার বস্তু কি, বীজ কি, বিন্দু কি, পতাকা কোথায়, কোথায় প্রকরী, কার্য্য কি— এ সকল তত্ত্বের সমালোচনে আমরা প্রবৃত্ত নহি! মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি নির্ব্বাচনে আমরা অসমর্থ। নায়ক ললিত কি শান্ত, ধীরোদাত্ত কি উদাত্ত— নায়িকা স্বকীয়া কি সামান্যা, মুগ্ধা কি প্রৌঢ়া— কোথায় তিনি বাসকসজ্জা, কোথায় উৎকণ্ঠিতা, কোথায় বিপ্রলব্ধা, কোথায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা— তাঁহার হাব ভাব হেলা, লীলা বিলাস বিচ্ছিত বিভ্রম বিকৃতাদি কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে— তাহার বিচার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি বিধান করিতে ইচ্ছুক নহ। কথিত আছে ইহা করুণরসপ্রধান নাটক। বাস্তবিক তাহাই যথার্থ কিনা— কোন্ অঙ্কে কোন রস প্রধান— কোথায় কোন্ ভাব,— হাস্য শোকাদি স্থায়ীভাব,— নির্ব্বেদ গ্লানি শঙ্কাদি ব্যভিচারী ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব;— কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি কোন্ বৃত্তি কোথায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পাঠকের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি একেবারে বিস্মৃত হউন, নচেৎ নাটকের রসগ্রহণ করিতে পারিবেন না।[24]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ওপরের এই অংশটি 'উত্তরচরিত'-এর কেবল পত্রিকাপাঠে পাওয়া যায়। *বিবিধ প্রবন্ধ*-এর গ্রন্থপাঠে কিন্তু এই অংশটি বর্জন করেছিলেন

---

[24] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্গদর্শন* ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (আশ্বিন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ১০৮-০৯।

বঙ্কিমচন্দ্র[25]। কেন তিনি বর্জন করেছিলেন এই অংশটি? কেবল কি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে? পত্রিকার পাতায় পাঠকের সঙ্গে ডিসকোর্স যতটা নিবিড় হয়, বইয়ের পাতায় তত হয় না। সেইজন্যও পাঠক সম্বোধনের এই অংশ বাদ পড়তে পারে।

অথবা, অনুমান করা যায়, অলংকার-শাস্ত্রের প্রতি এত তীব্র আক্রমণ পরবর্তীকালের বিবেচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অসমীচীন বোধ হয়েছিল। তিনি *বিবিধ প্রবন্ধ*-এর গ্রন্থপাঠে সুর কিছুটা নরম করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য 'উত্তরচরিত'-এর পরবর্তী অংশে (যা গ্রন্থপাঠেও বজায় ছিল) প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের প্রতি তাঁর উষ্মা ও ব্যঙ্গ মোটেই গোপন থাকেনি।

৬. মৌলিকতার অভাব, তর্ক ও বিবাদের আধিক্য

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব যেমন একাধিক তাত্ত্বিক বা আচার্যের মৌলিক সাহিত্যচিন্তায় ঋদ্ধ, তেমনি এর অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে পূর্বাচার্যদের পুনরাবৃত্তি। তর্কের মাধ্যমে তাঁদের মতের পরিগ্রহণ বা বর্জন। আবার সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে যুক্তি-প্রতিযুক্তির সাহায্যে পূর্বাচার্যদের তাত্ত্বিক-প্রস্থানকে স্বীকার এবং অস্বীকরণের যে ধারাবাহিক পরম্পরা পাওয়া যায়, তাতেও বিরক্ত বোধ করেছেন কোনও কোনও সমালোচক। সংস্কৃত আলংকারিকেরা "নিজের একটিও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কেবল পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া কাল কাটাইয়াছেন;

---

[25] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ১৪১-৬৩।

সামাজিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কাব্য-নাটকাদির উন্নতি কিসে হয়, তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই”[26]— এমন অনুযোগও শোনা গেছে উনিশ শতকে।

৭. রসের সংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক

উনিশ শতকের বাঙালিদের রসতত্ত্ব সংক্রান্ত বিরোধিতার আরও একটি কারণ ছিল রসের সংখ্যা-বিষয়ক সংশয়। কেন কেবল আটটি বা নটি মনোবৃত্তিই স্থায়িভাবের মর্যাদা পাবে, এই প্রশ্ন উনিশ শতকের চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ‘স্থায়ী ভাব’ পরিভাষা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভবভূতির *উত্তররামচরিত* নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

> মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা

---

[26] নাট্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রথম সূত্রকার মহাত্মা ভরত মুনি। তিনি প্রথম সূত্রকার বলিয়া তাঁহার প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে ও অলঙ্কার-সূত্রে অনেক অসঙ্গত কথা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তার পর এদেশে যে সকল আলঙ্কারিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুনিবরের অনুগামী হইয়া চলিয়াছেন; নিজের একটিও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কেবল পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া কাল কাটাইয়াছেন; সামাজিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কাব্য-নাটকাদির উন্নতি কিসে হয়, তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই। [অস্বাভবিক বিষয় নিয়ে কাব্যনাটক রচনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন]।

এক জন আলঙ্কারিক কাব্যলক্ষণ-সম্বন্ধে এই সূত্র করিয়াছেন “কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতং কাব্যং”* আর একজন এই বলিয়া তাহাতে দোষারোপ করিয়াছেন “কবির বাক্য যদি কাব্য হইত, তাহা হইলে কবির সকল কথাই কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

...মহাত্মা মম্মটভট্ট কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন “তদ্‌দোষৌ শব্দার্থৌ সগুণা(?)লঙ্কৃতৌ পুনঃ কাপি” অর্থাৎ যে শব্দার্থ নির্দ্দোষ, সগুণ ও অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্ট তাহার নাম কাব্য।”

দোষদাতা এ লক্ষণকেও এই বলিয়া দোষ দিয়াছেন যদি, অদোষ শব্দার্থ সগুণ ও অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্ট হইলে, কাব্য হয়, তাহা হইলে ‘কুরঙ্গ-নয়না’ এই বাক্যটী কাব্য মধ্যে গণ্য হইত। কারণ কুরঙ্গ-নয়না বাক্যটি অদোষও বটে এবং অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্টও বটে। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন – “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং” উক্ত দোষদাতা ইহাতেও এই দোষ দিয়াছেন, রসাত্মক বাক্য যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে “গোপীভিঃ সহ বিহরতি কৃষ্ণঃ” এ বাক্যটি কাব্য বলিয়া গণ্য না হয় কেন? কাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই রূপে কেবল বিবাদ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ যে কি, তাহা কেহই বিশদভাবে লেখেন নাই। [উৎস: জটিল সন্ন্যাসী, “নাটক চন্দ্রিকা,” *আর্য্যদর্শন* ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), ৫৯-৬০।]

> সৌন্দর্য্যের সৃজন কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ী ভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে বলেন (Passions)। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।[27]

কালপ্রবাহের পরম্পরায় অর্জিত গতানুগতিকতাকে প্রশ্ন করা উনিশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতক যুক্তি-সংশয়-প্রতর্কের কাল। তাই বিচার এবং পুনর্বিচার ছাড়া কোনও কিছুকেই সে গ্রহণ করেনি, নবরসের তত্ত্বকেও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল—

> এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করলেই বিপদ ঘটে।...এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের (রসতত্ত্বে) কোথাও স্থান নাই;— না স্থায়ী, না ব্যভিচারী— কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার স্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ-প্রণয়-দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস।...আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি— আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।[28]

প্রায় এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় *বঙ্গদর্শন*-এর ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রস' নামের আর একটি প্রবন্ধে। সেখানেও বলা হয়েছে—

> সৌন্দর্য অশেষবিধ, সুতরাং রসও অশেষবিধ হওয়া উচিত। ...যদি কেবল মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্যকেই রস বলিয়া স্বীকার করিয়া লই,

---

[27] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ১৬৩।

[28] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ১৬২-৬৩।

> তবে উহা কেন যে নয়টিমাত্র হইবে বুঝিতে পারিলাম না। মনোবৃত্তি অসংখ্য। সুতরাং রসও অসংখ্য হওয়া উচিত। যখন যে মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য আস্বাদনীয় হয়, তখন তাহাই রস হইবে।[29]

'সঙ্গীত ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের কাব্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসঙ্গে বলেছিলেন— "আজকাল নবরসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া রাখি না, অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না।"[30] এইভাবেই উনিশ শতকে নবরসের ধারণা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে ভরত নির্দেশিত আটটি রস, এবং পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত শান্তরস— এই নটি রসেরই আধিপত্য ছিল। অধিকাংশ আলংকারিকই ভরত-কথিত রসসূত্রকে মেনে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবোধের দ্বারা আলোড়িত উনিশ শতকের বাঙালি এই নটি রসের বৈধতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলল, তেমনি প্রশ্ন তুলল স্থায়ী এবং সঞ্চারীভাবের বিভাজন সম্পর্কেও। 'অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ' (৩.১৮৩)— *সাহিত্যদর্পণঃ* -এর এই যুক্তি অথবা 'বহুনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে' (৩.২৪) অভিনবগুপ্তের এই যুক্তিতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁদের মনে হয়েছিল—

> তাঁহারা (আলংকারিকরা) মনের ভাবসকলকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু কোনস্থলেই কি নিয়মে ভাগ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের মতে স্থায়ী ভাব নয়টির অধিক হইতে পারে না।...

---

[29] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭৫।

[30] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সঙ্গীত ও কবিতা," সমালোচনা (কলকাতা: পিপেল্‌স্‌ প্রেসে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ), ৯২।

> সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসপরিচ্ছেদ পাঠ করিলে, কতকগুলি প্রশ্ন স্বতঃ আমাদের মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রস কাহাকে বলিতেন? মনের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টিকে বাছিয়াই স্থায়ীভাব বলিলেন কেন? এই নয়টি ভিন্ন, আরও অনেকগুলি ভাব ত মনোমধ্যে স্থায়ী হইতে পারে।[31]

এই প্রবন্ধে লেখকের নাম অনুপস্থিত। কিন্তু 'উত্তরচরিত'-এর সঙ্গে বক্তব্যের আশ্চর্য মিল দেখে মনে হয় এটি বেনামে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা। ভবতোষ দত্ত ও বিজলী সরকার সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এর রচনাসূচিতেও (*বঙ্গদর্শন-পরম্পরা*) এই লেখাকে বঙ্কিমের রচনা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় আলংকারিকরা কেন নয়টি স্থায়িভাবকেই মুখ্য করে তুলেছেন তার উত্তর সন্ধানের প্রয়াস এই প্রবন্ধে লক্ষ করা যায়। শেষপর্যন্ত প্রবন্ধকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন দেশকাল-সমাজের প্রভাবে এক-একটি বিশেষ সময়ে এক-একটি বিষয় পাঠকসাধারণের কাছে আদৃত হয়। যেমন, কখনও প্রেম, কখনও যুদ্ধ, কখনও স্বদেশ-অনুরাগ, কখনও বিস্ময়, আবার কখনও শোক। অলংকারগ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে বিশেষ করে নটি মনের ভাব নিয়েই 'গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হইত'। ফলে,

> আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যখন অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছিল যে এই নয়প্রকার মনের ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা জনসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইবে, এইজন্য তাঁহারা উক্ত নয়টিকেই প্রধান ভাব বা রসমধ্যে স্থির করিয়াছেন। নচেৎ এই নয়টিকেই উচ্চস্থান দিবার আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।[32]

---

[31] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭২।

[32] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৮৮২): ১৭৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নটি রসের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে এই নটি মূল রসের বাইরেও "অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে," কিন্তু "অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই"[33]।

এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, ভারতের সব রসতাত্ত্বিক যে আটটি বা নটি রসের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয়। আচার্য ভরত বলেছিলেন আটটি রসের কথা। অভিনবগুপ্ত ছিলেন নবরসবাদী। সাহিত্যদর্পণকার এই নটি রস ছাড়াও 'মুনীন্দ্রসম্মত' দশম রস বাৎসল্যের উল্লেখ করেছেন। আবার, ভোজের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র রস। তিনি শৃঙ্গারেরই ভেদ হিসেবে মোট বারোটি রসের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় রসতত্ত্বের ক্ষেত্রে দ্বাদশরসবাদী মতের উদ্ভব হয়েছিল। সেখানে ভরত-কথিত অষ্টরসের সঙ্গে বাৎসল্য-লৌল্য-ভক্তি-কার্পণ্য— এই চারটিকে অতিরিক্ত রস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভবভূতি *উত্তররামচরিত*-এ বলেছেন, "একইমাত্র রস, উহা— করুণ।"[34] নয়টিকেই কেন রস বলা হবে, সপ্তদশ শতকেই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন *রসগঙ্গাধর*-রচয়িতা জগন্নাথ।[35] সুতরাং রসের সংখ্যা নিয়ে সংশয় এবং প্রশ্ন যে উনিশ শতকেই প্রথম উঠেছিল, এমন নয়। তবে উনিশ শতকের সংস্কৃতজ্ঞ এবং সমালোচকরা সেই বিকল্প-রসভাবনার খুব গভীরে প্রবেশ করেননি বলেই মনে হয়। সেই কারণে এই প্রশ্নচিহ্নগুলি পুনরায় উঠে আসে তাঁদের

---

[33] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ঐতিহাসিক উপন্যাস," 'সাহিত্য,' *রবীন্দ্ররচনাবলী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), ৪৪৮।

[34] অশোকনাথ শাস্ত্রী, *রস ও ভাব* (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ), ২১৬।

[35] শাস্ত্রী, *রস ও ভাব*, ২১৭।

বয়ানে। ভারতীয় রসতত্ত্বে রসের সংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক সম্পর্কে পূর্বধারণা থাকলে তাঁরা আবার এই নটি রসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন না বলেই মনে হয়।

৮. বীরত্বের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী জাগরণের যে ঢেউ উঠেছিল তার প্রভাবে শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যনাটকে আবদ্ধ না থেকে বীররসাত্মক বা স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্যনাটকের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা বাঙালির মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'হৃদয়ে গভীর প্রেম'-এর পাশাপাশি 'বাহুতে দুর্জ্জয় বল'[36] অর্জনের প্রণোদনা দেখা যাচ্ছিল বাঙালি যুবকদের মধ্যে। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলার মাহাত্ম্য। ফলে শৃঙ্গারের চেয়ে তৎকালীন বাঙালি বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিল বীররসকে, বা স্বদেশপ্রেমকে। বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রিকার পাতায় শোনা গেল বীরত্বের জয়গান। বীরত্বপূর্ণ কাজে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হল বাঙালিকে—

> বঙ্গবাসী! ভীরু! দৃঢ়তাবিবর্জিত! বাস! যদি তোমাদের শরীরে মনুষ্যত্ব থাকে যদি তোমাদের ধমনীতে আর্য্যশোণিত একদিনও প্রবাহিত দুইয়া থাকে, যদি তোমাদের উন্নতির দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি থাকে, তবে তোমরা জগৎসেঠের নিকট অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভীষণ প্রতিহিংসা অভ্যাস কর। সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে আকাশ হইতে নক্ষত্র-মণ্ডল এবং পৃথিবী হইতে গগণস্পর্শিনী [য] গিরিরাজি উৎপাটিত করিয়াও সিন্ধুজলে ভাসাইয়া দেও এবং বক্ষঃস্থল পাতিয়া ইন্দ্রের বজ্র গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত হও।

---

[36] কিন্তু শক্তি চাহি— হৃদয়ে গভীর প্রেম এবং বাহুতে দুর্জ্জয় বল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রমণীয় কোমলতা মাত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, বলের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই। কিন্তু প্রেমে এবং বলে একীকৃত না হইলে মানব-চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে না। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে [য] কোমলতা বলে পরিপুষ্ট হয় নাই। এই জন্য আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনে এত বিলম্ব; ...আমাদের প্রেম যতই গভীর হৌক্ বলের অভাবে অলস এবং নিস্তেজ। নহিলে, হৃদয়ই তো বাহুতে বল দেয়।

> এই প্রতিজ্ঞা সংসাধনে জীবন সমর্পণ কর, কথায় বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর।[37]

বাঙালির নিজের ভীরুতার কারণ খোঁজাও আসলে সেই বীরত্বপ্রীতিরই অন্যদিক। 'বাঙ্গালীর ভীরুতা', 'বাঙ্গালী সৈনিক' প্রভৃতি প্রবন্ধে পাওয়া যায় সেই অনুসন্ধিৎসারই প্রতিফলন—

> ভীরুতা অন্যান্য জাতি মধ্যে, ব্যক্তি বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর ইহা জাতিগত রোগ, বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরু আর কোন জাতিই নহে। এবম্প্রকার জাতিগত ভীরুতা কেবল আমাদের দৈহিক দুর্ব্বলতা ও কুশিক্ষার ফল। যে কোন কার্য্যে কায়িক বলের আবশ্যক সে কার্য্যে বঙ্গবাসিগণ কখনই প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না। বাঙ্গালী প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার দুর্ব্বলতা অনুভব করে, তাই বাঙ্গালীর সাহস নাই, তাই সে দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ পাঠান বা প্রমত্ত গোরা দেখিলে ভয় পায় ও তাহাদিগকে দানব বা দৈত্যের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে।... তাহারা প্রহার করিলে প্রতিশোধ লইতে আমাদের সাহস হয় না। প্রহার অপমান সকলই আমরা সহ্য করি– দুর্ব্বল বলিয়া সহ্য করি– মরিতে ভয় করি বলিয়া সহ্য করি। ... আমরা আমাদের দেশের দোষ দিয়া বলিয়া থাকি যে এদেশের জলবায়ু খারাপ তাই আমরা দুর্ব্বল। ... কিন্তু যথার্থই কি কেবল জলবায়ুর দোষে আমরা দুর্ব্বল?[38]

'বাঙ্গালী সৈনিক' প্রবন্ধে আবার বাঙালির মনে ভীরুতার বীজ বপন করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-নির্মিত বাঙালিদের ভীরুতার কাল্পনিক ন্যারেটিভকেই দায়ী করা হয়েছে—

> ...এই অসীম বুদ্ধিকৌশল থাকাতে, বাঙ্গালী উচ্চ অঙ্গের সৈনিক হইতে সক্ষম, ইহাই আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। ... কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট দুই বেলা আমাদের কাল্পনিক ভীরুতা ও অযৌক্তিক অপদার্থতার কথা বার বার শুনিয়া, আমাদের মনের বলও যেন স্বতঃ

---

[37] অজ্ঞাত, "পলাশীর যুদ্ধ," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ বঙ্গাব্দ): ৬৭।

[38] লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, "বাঙ্গালীর ভীরুতা," *আর্য্যদর্শন* ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৯১ বঙ্গাব্দ): ৩৩৩-৩৪।

> পরতঃ দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে। মনের অপরাপর বৃত্তির ন্যায়, সাহসিকতাও অনুশীলনসাপেক্ষ। ...বীরত্বভাব মনে জাগরূক রাখিতে গেলে, অভ্যাস, শিক্ষা ও আদর্শের প্রয়োজন। ...সাহসিকতা বা ভীরুতা কতক পরিমাণে লোকের সু বা কু-সংস্কার সাপেক্ষ। কোনও পরাধীন জাতিকে সর্ব্বদাই তাহাদের ভীরুতা ইত্যাদির কথা লইয়া ব্যঙ্গ করিলে, কালে সে জাতি সত্য সত্যই ভীরুস্বভাব হইয়া যায়।[39]

অন্যদিকে তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লেখকেরা বাঙালির কাপুরুষতার অভিযোগ অপনোদন করতে চাইছিলেন বল, বীরত্ব ও সাহসের আরাধনার মাধ্যমে—

> বাঙ্গালিদিগের যে বিষয়ে যতদূর উন্নতি হউক না কেন, কাপুরুষ বলিয়া যে তাহাদের কলঙ্ক আছে, সে কলঙ্কের অপনয়ন না হইলে, তাহারা মানবজাতির মধ্যে কস্মিন্‌কালে গণনীয় হইবে না।
>
> বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যই তাহাদের পৌরুষাভাবের প্রধান কারণ। ...সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে বল ও সাহস একত্র বর্ত্তমান থাকে। ...এক্ষণে আমাদের যুবকদিগের নিকট এই নিবেদন যে যাঁহার শরীরে বল ও সাহস আছে, তিনি রাজকীয় সৈনিক বা সৈনিকনায়ক হইবার চেষ্টা করুন। ...যদি কৃতকার্য্য হন, বাঙ্গালার বহুকালের কলঙ্ক অপনয়ন করার উপায় করিতে পারিবেন ও বাঙ্গালিজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালিরা যতই লেখাপড়া শিখুন না কেন, বণিক্‌ বৃত্তিতে ও শিল্পে যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করুন না কেন, যতকাল তাহাদের মধ্যে কতক যোদ্ধা না হইবে, ততকাল অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে।[40]

বাঙালির বল, উদ্যম প্রভৃতি নিয়ে আশার কথাও ব্যক্ত হচ্ছিল একাধিক লেখকের কলমে—

---

[39] অজ্ঞাত, “বাঙ্গালী সৈনিক,” *সাহিত্য* ১ম বর্ষ (১২৯৭ বঙ্গাব্দ): ২৯৯-৩০০।

[40] তা.প্র.চ “ বাঙ্গালিদিগের পৌরুষ,” *বঙ্গদর্শন* ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১২৮৯ বঙ্গাব্দ): ৯৭-১০৩।

> আজ বাঙ্গালার যেরূপ দুর্দ্দশা চিরদিন কিছু এরূপ ছিল না। একদিন বঙ্গেশ্বর বিজয়সেন সিংহল জয়ের জন্য রণপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন... আজ বাঙ্গালার সে দিন কোথায়...
>
> ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার জীবন যতবার স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল ততবারই করালগ্রাস আসিয়া অকালে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। কঠিনগাত্রবদ্ধ বাষ্পের ন্যায় বাঙ্গালীর উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি এতদিন বদ্ধ ছিল; আজ সুনিয়ম ও সুশাসনের বলে সে উদ্যম সে উৎসাহ দেখা দিয়াছে। নববলে বলীয়ান্ বাঙ্গালা এই মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদিন তাহার ইতিহাস ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে তাহার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।[41]

এইভাবেই বীরত্ব হয়ে উঠছিল উনিশ শতকের বাঙালির কাঙ্ক্ষিত গুণ, আর তার বিপরীতে শৃঙ্গার হয়ে উঠছিল উনিশ শতকের অশ্রদ্ধার লক্ষ্যবিন্দু। অথচ সংস্কৃত রসতত্ত্বে ভরতের সময়কাল থেকেই তো শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। এমনকি ভোজের মতো কোনও কোনও আলংকারিক শৃঙ্গারকেই একমাত্র রসের মর্যাদা দিয়েছেন। উনিশ শতকের শৃঙ্গারের প্রতি এই বিতৃষ্ণা যেন সামগ্রিকভাবে রসতত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণায় পরিণত হচ্ছিল। শৃঙ্গারের প্রতি বিমুখতা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল সংস্কৃত রসশাস্ত্রের প্রতি বিমুখতায়।

৯. সংস্কৃত রসশাস্ত্রের শৃঙ্গার-রসনির্ভরতা, সেই সূত্রে উনিশ শতকে সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে উপেক্ষা

শৃঙ্গারকে আদি বা প্রধান রস হিসেবে মেনে নিতে ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানিজম আক্রান্ত পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙালি সমাজের যে রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছিল, তা সেই যুগের একাধিক লেখা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ‘উত্তরচরিত’ প্রবন্ধেই আদিরসকে ‘কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং কেন রতিই স্থায়িভাবগুলির মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হবে, কেন স্নেহ-দয়া প্রভৃতি স্থায়িভাব হিসেবে মর্যাদা পাবে না সে

[41] দেবেন্দ্রবিজয় বসু, “বাঙ্গালীর আশা,” *ভারতী* ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২): ৫২-৫৯।

সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা প্রকাশ করেছিলেন। *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'রস' প্রবন্ধেও অনুরূপ বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়—

> স্ত্রী-বিষয়ক অনুরাগ রস হইল; কিন্তু অনুরাগ কি স্ত্রী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি বর্ত্তিতে পারে না? না, বর্ত্তিলে স্থায়ী হইতে পারে না? আমরা তো দেখিতেছি অপত্যস্নেহ, বন্ধুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতি অনুরাগের নানা অঙ্গ, এবং সকলগুলিই স্থায়ী। যদি স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগভিন্ন রস না হয়, তাহা হইলে স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী নীরস অথবা নীচরস বলিয়া পরিগণিত হইবে।[42]

এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে 'রতি' এই শব্দটি প্রধানত 'স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ' অর্থে ব্যবহৃত হলেও কেবল ওই অর্থেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল না। আচার্য মম্মট তাঁর *কাব্যপ্রকাশ*-এ দেবাদিবিষয়ক রতিকে ভক্তি বলেছেন[43]। এ থেকেই বোঝা যায় যে কোনও ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা 'রত' থাকার ভাবকেই ব্যাপক অর্থে রতি বলা হত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে 'সৌন্দর্যের মোহঘটিত' অনুরাগই 'মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্'[44] বলে স্বীকার করে নেন, তিনিই আবার শৃঙ্গার কেন আদিরস হবে সে নিয়ে 'উত্তরচরিত'-এ ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। এই বঙ্কিমই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় বারবার কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের মধুররসাশ্রিত কোনোরকম সম্পর্কের সম্ভাবনাকেই নাকচ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এমনকি রাধাচরিত্রের সর্বাত্মক অর্বাচীনতা

---

[42] অজ্ঞাত, "রস," ১৭২।

[43] রতির্দেবাদিবিষয়া – *কাব্যপ্রকাশ* ৪. ৩৫-৬

[44] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র: দ্বিতীয় খণ্ড – বৃন্দাবন," *বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ), ৪৫৮।

প্রমাণ করে কৃষ্ণের আদর্শ 'মানবচরিত্র'-কে সর্বপ্রকার কলঙ্কস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে চান।[45] এই বিশুদ্ধতাবাদী মনোভঙ্গির ফলশ্রুতিতে তিনি শৃঙ্গারের প্রতি বিরূপতা পোষণ

---

[45] যেমন,

- মহাভারতে ব্রজগোপীদের কথা কিছুই নাই ...কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটা আছে। ...এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৫৪]
- এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৫৪]
- "রম্" ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে "রম্" ধাতু বুঝিয়াছি; যথা "রতিপ্রিয়া" অর্থে আমি "ক্রীড়ানুরাগিণী" বুঝিয়াছি। আদৌ "রম্" ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। ... আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত কেন না 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে।... ইহাতে আদিরসের নামগন্ধ নাই। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৫৮]
- উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্ব্বী। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে – তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৬৭]
- ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীগণের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষার প্রমাণস্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, ... শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন...কাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৬৭]
- রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখন কৃষ্ণউপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধাভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৬৮]
- রাধাকে প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই। উইলসন সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত।... সর্ব্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। [চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণচরিত্র," ৪৬৮]

করেছেন। বিশুদ্ধতাপন্থী মানসিকতার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়, লালমোহন বিদ্যানিধির *কাব্যনির্ণয়* বইটিতে। সেখানে নটি স্থায়িভাবের তালিকার সূচনা ভরত উল্লিখিত প্রথম স্থায়িভাব রতি দিয়ে নয়। উৎসাহ দিয়ে। তালিকাটি এইরকম— "উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, অনুরাগ (রতি), হাস, জুগুপ্সা ও শম।"[46] লক্ষণীয় 'রতি' শব্দটির উল্লেখেই যেন লেখকের অনীহার ইঙ্গিত রয়েছে। তাই কি 'অনুরাগ' শব্দ দিয়ে 'রতি'-কে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছেন তিনি? প্রথমে বন্ধনীমধ্যে যদিও বা শব্দটি রয়েছে, পরে আবার আলাদা করে স্থায়িভাবগুলির উল্লেখের সময় 'রতি' শব্দটিকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন তিনি এবং অনুরাগের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অন্যান্য স্থায়িভাবের সংজ্ঞার চেয়ে সংক্ষিপ্ততর[47]। তার চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল, অন্যান্য প্রতিটি স্থায়িভাবের (রসের) অন্তত দু-একটি করে উদাহরণ *কাব্যনির্ণয়*-এ থাকলেও 'রতি'-র (অনুরাগের) আলোচনায় এসেই লেখক আদিরসাত্মক উদাহরণ দেওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে লিখলেন "উদাহরণ স্পষ্ট"[48]। *কাব্যনির্ণয়* ছাত্রপাঠ্য বই ছিল বলে তাকে এইভাবে 'রতি'র স্পর্শমুক্ত করে তোলার প্রয়োজন ছিল, এ যুক্তিও এক্ষেত্রে খাটে না। এ বইটি যেমন 'Bengali Normal School'-গুলির পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং ১৮৬৮ সালে বাংলা বিএ স্তরের পরীক্ষার পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়েছিল[49], তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*-ও রচিত হয়েছিল মূলত 'সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের

---

[46] মনের অনুকূল বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতাকে (অর্থাৎ নায়কনায়িকাদির মনের ভাববিশেষকে) অনুরাগ বলে। [উৎস: লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), ৩০।]

[47] মনের অনুকূল বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতাকে (অর্থাৎ নায়কনায়িকাদির মনের ভাববিশেষকে) অনুরাগ বলে। [উৎস: বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়*, ৩৩।]

[48] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়*, ৩৩।

[49] ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১১ দ্রষ্টব্য।

উপকার'-এর জন্য[50]। সেখানে কিন্তু 'রতি' বা 'শৃঙ্গাররস'-এর উল্লেখে লেখকের কোনোরকম দ্বিধার আভাস পাওয়া যায় না। তবে কি *কাব্যনির্ণয়*-এ এইধরনের শব্দব্যবহারে আড়ষ্টতা লালমোহন বিদ্যানিধির বিশুদ্ধতাবাদী মনোভাবেরই ফলশ্রুতি? আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, স্থায়িভাবের আলোচনার প্রথমেই উৎসাহ নামক স্থায়িভাবের উদাহরণে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেমের কবিতা 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' উদ্ধৃত করেছেন লালমোহন। শোকের উদাহরণেও রয়েছে ভারতের হৃতগৌরবের জন্য আক্ষেপসূচক একটি অংশ।[51]

এইসময়ে সাহিত্য-আলোচনায় স্থায়িভাব বা রস হিসেবে 'রতি' বা 'শৃঙ্গার' বা 'মধুররস'-কে একপ্রকার এড়িয়ে গিয়ে বা তার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে বাঙালি বীররস বা দেশপ্রেমের জয়গান গাইতে চেয়েছিল। এর পিছনে পাশ্চাত্য পিউরিটানিজম যেমন ছিল, তেমনি ছিল স্বদেশচেতনায় সদ্য উদ্বুদ্ধ বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার প্রয়াস। যে প্রয়াসের অন্যতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে *আনন্দমঠ* উপন্যাসে সত্যানন্দের বয়ানে যেখানে তিনি চৈতন্যদেবের বিষ্ণুকে 'শুধু প্রেমময়' এবং সন্তানের বিষ্ণুকে 'শুধু শক্তিময়' বলে উল্লেখ করেন।[52] মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সূচনায় 'বীররসে ভাসি মহাগীত'

---

[50] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, "বিজ্ঞাপন," *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ৮৪।

[51] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়*, ২৯।

[52] সঙ্গে সঙ্গে এও জানান, 'প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। ...কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন।' বিষ্ণুর অনন্তশক্তিময় ঐশ্বর্যরূপটিই তাই সন্তানের উপাস্য। সত্যানন্দের মতে চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম 'অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র', 'নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হয়েছিল, এ তাহারই লক্ষণ।' [উৎস: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "আনন্দমঠ," *বঙ্কিম রচনাবলী: প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ), ৬৮৮।]

গাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আখ্যানকাব্য লেখার প্রণোদনাও ওই একই প্রয়াসের ফল। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশ যখন দাবি করছে প্রেমের ভাবালুতামুক্ত নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ বীররসাত্মক সাহিত্য, তখন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে শৃঙ্গারের অতিপ্রাধান্য এবং বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মধুররসের অতিরেক অনেক বাঙালিকেই ঈষৎ যেন বিরক্ত করে তুলেছিল। *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখক বলেন—

> ...বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব-আদি কবিরা আদিরসটিকেই তাঁহাদের কল্পনা-কাননের সকল পুষ্প দিয়াই সাজাইয়াছিলেন। ...কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে ইহাও বলা উচিত যে, সে সকল কবিতার গভীরতা নাই, তাহাদের মধ্যে কোনটিতেই মহানভাবের আভাসমাত্রও নাই। তাঁহাদের কবিতা পাঠে...কেবল এইমাত্র বোধ হয় যে, প্রণয় আমাদের যৌবনকালের একটি উপাদেয় লীলাস্বরূপ।[53]

একইভাবে *ভারতী* পত্রিকায় সরলা দেবী তাঁর 'মুদ্রারাক্ষস'-এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটকে আদিরসের প্রাধান্য নিয়ে অভিযোগ তুলে বলেছিলেন—

> যে বেগবতী চিত্তবৃত্তি সর্ব্বকালে সকল মনুষ্যের কার্য্যের মূল এবং যাহাদের সংখ্যা অসংখ্য তাহাদের গুটীকতমাত্রকে লইয়া সকল কবিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সহৃদয়তা স্ফূর্তি পায় না।[54]

বিদ্যাসাগরও প্রায় একইভাবে সংস্কৃত কবিদের সম্পর্কে বলেছেন—

> তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন। পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত,

---

[53] চ—, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ১৫৬-৫৭।

[54] সরলা দেবী, "মুদ্রারাক্ষস," *ভারতী* ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ১২০।

লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়ী নহে।[55]

এ কথা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, উনিশ শতকের সমাজ বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বকে আদিরসের প্রাধান্য থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে চেয়েছিল। অথচ সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বজুড়ে চিরকাল রতি এবং শৃঙ্গারেরই অবিসংবাদিত আধিপত্য। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এ শৃঙ্গার আদি বা প্রধান রস তো বটেই, অগ্নিপুরাণের লেখক, *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*-প্রণেতা ভোজ উভয়েই একটিমাত্র প্রধান রসকে স্বীকার করেছেন, সে রস হল— শৃঙ্গার। ভানুদত্ত কাব্যতত্ত্বে শৃঙ্গাররসের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান স্বীকার করে নিয়েছেন। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে 'রতি' সর্বদা কৃষ্ণবিষয়ক হলেও সেখানে ভক্তিরসের শাখাগুলির মধ্যে সখ্য বা বাৎসল্যের তুলনায় মধুরের শ্রেষ্ঠতা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। রূপগোস্বামী প্রণীত *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*-তে বিধৃত বৈষ্ণব রসতত্ত্বে মধুরের এই কেন্দ্রীয় অবস্থান লক্ষ করেই সুশীলকুমার দে লিখেছিলেন—

> A new turn was given to the theory by Rupa Gosvamin's Ujjavala-nila-mani, *which attempted to deal with rasa in terms of the Vaisnava idea of ujjvala or madhura rasa, by which was meant the srngara rasa*, the term ujjvala having been apparently suggested by Bharat's description of that rasa.[56]

শৃঙ্গারের এই প্রাধান্যের জন্যই তাঁর মনে হয়েছিল, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব 'belong properly to the province of Erotics rather than Poetics'[57]। এখন, বলা বাহুল্য, উনিশ

---

[55] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১২৪।

[56] Sushil Kumar De, *Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol II* (London: Luzac & Co., 1925), 335. [নজরটান আরোপিত]

[57] De, *History of Sanskrit Poetics Vol II*, 337.

শতকের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এই শৃঙ্গারপ্রধান ভারতীয় বা গৌড়ীয় রসতত্ত্বকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এবং পূর্বোল্লিখিত নানা কারণের মিলিত অভিঘাতেই উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি খানিকটা প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল।

এই বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য পুরোপুরি স্থায়ী হয়নি। বিশ শতকের বাংলায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের পুনরালোচনার একটি পরিসর নতুন করে তৈরি হতে থাকে। মূলত প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগে *সবুজপত্র*-এর প্রকাশের সময় থেকেই নতুন করে চর্চিত হতে থাকে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব। *সবুজপত্র*-এ ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'অভিনবের ডায়রি', অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী লেখেন 'অলঙ্কারের সূত্রপাত'। ১৯২৩ এবং ১৯২৭-এ লন্ডন থেকে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় সুশীলকুমার দে-র ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রমলব্ধ *Study in the History of Sanskrit Poetics*। ১৯২৬-এ ধারাবাহিকরূপে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়-ফাল্গুন) প্রকাশিত হতে থাকে অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্যজিজ্ঞাসা*। ১৯২৮ নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় শশাঙ্কমোহন সেনের *বাণীমন্দির*। ১৯৩৯-এ বেরোয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের *কাব্যবিচার*। প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকের ঔদাসীন্য বদলে গেল বিশ শতকের অভিনিবেশে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ গবেষণার অন্যতর পরিসরের অপেক্ষা এবং সম্ভাবনা রেখে যায়।

সম্ভাবনার পাশাপাশি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের সীমাবদ্ধতারও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রথমত, সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণেই উনিশ শতকের সব প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও পত্রিকাকে এই গবেষণার পরিধির অন্তর্গত করা যায়নি। উনিশ শতকে

বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা কোনও খণ্ডিত গবেষণাক্ষেত্র নয়। বিশ শতকে বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বপাঠও এই অবিচ্ছিন্ন পরম্পরারই অন্তর্ভুক্ত। গবেষণা-পরিধির বাইরে বলে সেই অংশটির আলোচনাও এই অভিসন্দর্ভে অনুপস্থিত রইল। কিন্তু কেবল উনিশ শতক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকেই উঠে আসে সংস্কৃত তথা ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালির বহুস্বরিক প্রতিক্রিয়া, তার দ্বিধা-দোলাচল। ডায়াক্রনিক কাঠামোয় দেখে নেওয়া যায় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙালির পরিবর্তমান দৃষ্টিকোণ। এক কালখণ্ডের তাত্ত্বিক-মনীষার প্রতি আরেক কালখণ্ডের সেই দৃষ্টিক্ষেপণে তৎকালীন সমাজ-রাজনৈতিক প্রতিবেশও জুড়ে যায়। উনিশ শতকের বাঙালি তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানবিন্দু থেকে কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বকে দেখেছিল, সেই ধারণা বাঙালির সামগ্রিক ইতিহাসচেতনা ও সংস্কৃতিচেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বইকি। এই অভিসন্দর্ভে বিধৃত রইল সেই স্বরূপ অনুসন্ধানেরই একাংশ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

- গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত। *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*। কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, জয়গোপাল। *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। কলকাতা: ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৪।
- গোস্বামী, জয়গোপাল। *সাহিত্যমুক্তাবলী: অলঙ্কার (প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।
- ঘোষ, দয়ালচন্দ্র। *প্রসাদ প্রসঙ্গ (সজীবনী-প্রসাদী-সঙ্গীত কাব্য)*। কলিকাতা: ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৬।
- চট্টোপাধ্যায়, রামাক্ষয়। *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিত্ব* । কলকাতা: রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *পঞ্চভূত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী– অচলিত সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সমালোচনা*। কলকাতা: পিপেল্‌স্ প্রেসে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

- দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। *মধুসূদন রচনাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী: দ্বিতীয় ভাগ*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।
- বসু, চন্দ্রনাথ। *শকুন্তলাতত্ত্ব অর্থাৎ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমালোচনা*। কলিকাতা: নূতন আর্য্য যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ক্যানিং লাইব্রেরিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *কাব্য-চিন্তা*। কলিকাতা: ডন্ প্রেস, ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *কাব্য-সুন্দরী*। কলিকাতা: জি সি বসু এন্ড কোম্পানি, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *সাহিত্য-চিন্তা*। কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- বসু, যোগীন্দ্রনাথ। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*। কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫।
- বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অক্ষয়কুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯০।
- বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। হুগলী: বুধযন্ত্রে কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯৮।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র । *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১*। কলকাতা: দে'জ, ২০২০।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*। মদনমোহন কুমার সম্পাদিত। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭।
- মুখার্জি, রাজকৃষ্ণ। *নানা প্রবন্ধ*। কলকাতা: নব গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৮৮৫।

- মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ (উত্তর চরিত, রত্নাবলী এবং মৃচ্ছকটিকের সমালোচন)*। হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১।
- সরকার, বিহারিলাল। *শকুন্তলা-রহস্য*। কলিকাতা। (প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্য অজ্ঞাত)

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

- গুপ্ত, অতুলচন্দ্র। *কাব্যজিজ্ঞাসা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, রূপ। *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*। শ্রীধর-দেবগোস্বামী সম্পাদিত। কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫।
- ঘোষ, অভ্র। *উনিশ শতক চর্চা*। কলকাতা: অক্ষর, ২০১৭।
- ঘোষ, সতী। *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৫৭।
- চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৬।
- চক্রবর্তী, শ্যামাপদ। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি, ২০০৬।
- চক্রবর্তী, শ্যামাপদ। *কাব্যের রূপ ও রস*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৭৯।
- চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ সম্পাদিত। *আনন্দবর্ধন-বিরচিতঃ ধ্বন্যালোকঃ (প্রথম উদ্দ্যোতঃ)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।
- চক্রবর্ত্তি, নরহরি। *ভক্তিরত্নাকর*। বহরমপুর: রাধারমণ যন্ত্রে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত প্রকাশিত ও মুদ্রিত, ৪০২ চৈতন্যাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত। *শ্রীদণ্ড্যাচার্য্যবিরচিতঃ কাব্যাদর্শঃ*। টীকা – প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।

- চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী। *ভক্তিরসের বিবর্তন (কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক: ৭৭)*। কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭২।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *রূপ, রস ও সুন্দর: নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*। কলকাতা: ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া, ১৯৮১।
- চৌধুরী, হিমাংশুচন্দ্র। *বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। *পদরত্নাবলী: অর্থাৎ মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংকলন*। অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় কর্তৃক সংগ্রথিত ও সম্পাদিত। কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
- তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। *বাংলার বৈষ্ণব দর্শন*। কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *সাহিত্যের স্বরূপ*। কলকাতা: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার। *কাব্যালোক*। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।
- দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *কাব্যবিচার*। কলকাতা: চিরায়ত, ১৯৯৬।
- দাস, করুণাসিন্ধু। *কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-বিচার পদ্ধতি*। কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৪।

- দাস, করুণাসিন্ধু। *সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
- দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।
- দেশপাণ্ডে, জি টি। *অভিনবগুপ্ত*। রত্না বসু অনূদিত। নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ভূমিকা*। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, ১৯৯৩।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: সপ্তম পর্ব্ব— রসতত্ত্ব*। কলিকাতা: প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর। *রাজানক কুন্তকাচার্য্যের বক্রোক্তিজীবিত*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত। *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র- চতুর্থ খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৯৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র- তৃতীয় খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র- দ্বিতীয় খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র- প্রথম খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০।
- বসু, নন্দিতা। *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৬।
- বসু, রত্না অনূদিত। *অভিনবগুপ্ত: জি টি দেশপাণ্ডে*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।
- বসু, স্বপন এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত। *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *কাব্য-মীমাংসা*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮২।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলংকারশাস্ত্র*। কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের ভূমিকা*। কলকাতা: চলন্তিকা প্রেস [এন ডি], ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া, ১৯৬১।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *সাংস্কৃতিকী প্রবন্ধ সপ্তক*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৯১।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *সাহিত্য মীমাংসা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব রস-সাহিত্য*। কলকাতা: কমলা বুক ডিপো, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত। *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (সম্পা. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, টীকা ও বঙ্গানুবাদ: রামচন্দ্র তর্কবাগীশ)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮।
- মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন। *রসসমীক্ষা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১।

- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। *কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯০।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *পদাবলী-পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।
- মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণি*। কলকাতা: ভারতী প্রকাশন, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
- রায়, অলোক এবং গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত। *উনিশ শতকের বাংলা*। কলকাতা: পারুল, ২০১২।
- রায়, অলোক। *উনিশ শতক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।
- রায়, অলোক। *বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা: উনিশ শতক*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১।
- রায়, কালিদাস। *পদাবলী-সাহিত্য*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়, সতীশচন্দ্র অনূদিত। *রস-মঞ্জরী* [ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ]। কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- রায়, সতীশচন্দ্র অনূদিত। *রসমঞ্জরী*। কলকাতা: মডেল লাইব্রেরি, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, সুবীর ও স্বপন মজুমদার সম্পাদিত। *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*। কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৯।
- শাস্ত্রী, অশোকনাথ। *রস ও ভাব: ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে রস ও ভাবের সামগ্রিক আলোচনা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

- সান্যাল, অবন্তীকুমার ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য*। কলকাতা: কলকাতা বিদ্যাভবন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ*। কলকাতা: করুণা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৯৫।
- সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী: পদ ও পদকার*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ১৯৮৬।
- সেন, নীলরতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৫।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও কালীপদ ভট্টাচার্য। *ধ্বন্যালোক ও লোচন, মূল: আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৬।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। *সাহিত্যপাঠের ভূমিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬০।
- সেনশাস্ত্রী, ত্রিপুরাশঙ্কর। *বৈষ্ণব সাহিত্য: বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৪।

ইংরাজি

- Chakravarti, Ramakanta. *Vaisnavism in Bengal (1486-1900)*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1985.
- Das, Sisirkumar. *The Mad Lover: Eassays on Medieval Indian Poetry*. Calcutta: Papyrus, 1984.
- De, S.K. *Early History of the Vaisnava Faith and Movement: From Sanskrit and Bengali Sources*. Calcutta: General Printers and Publishers, 1942.
- De, Sushil Kumar. *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetic: With notes by Edwin Gerow*. Bombay: Oxford University Press, University of California Press, 1963.
- De, Sushil Kumar. *Some Problems of Sanskrit Poetics*. Calcutta: Firma KLM, 1981.
- De, Sushil Kumar. *Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol II*. London: Luzac & Co., 1925.
- De, Sushil Kumar. *Studies in the History of Sanskrit Poetics*. Calcutta: Firma K.L Mukhopadhyay, 1961.
- De, Sushil Kumar. *The Vakrokti-Jivita: A Treatise on Sanskrit Poetics by Rajanaka Kuntaka*. Calcutta: Firma K.L.M, 1961.
- Devy, G. N. Ed. *Indian Literary Criticism: Theory and Interpretation*. Hyderabad: Orient Longman, 2002.
- Dhananjaya. *Dasarupam*. Edited by F E Hall. Calcutta: Asiatic Society, 1989.
- Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1971.
- Keith, A. Berreiedale. *The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory and Practice*. London: Oxford, 1924.

- Krishnamoorthy, K. *Essays in Sanskrit Criticism*. Dharwar: Karnatak University, 1964.
- Lahiri, P.C. *Concept of Riti and Guna in Sanskrit Poetics in their Historical Development*. Dacca: The University of Dacca, 1937.
- Mishra, Hari Ram. *The Theory of Rasa in Sanskrit Drama with A Comparative Study of General Dramatic Literature*. Chhatarpur: Vindhyachal Prakashan, 1964.
- Mukherji, Ramaranjan. *Literary Criticism in Ancient India*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1990.
- Pollock, Sheldon Ed and Trans. *A Rasa Reader: Classical Indian Aesthetics.* Noida: Permanent Black, 2017.
- Sankaran, A. *Some Aspects of Literary Criticism*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1973.

পত্রিকা

- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (তৃতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (পঞ্চম ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (ষষ্ঠ ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮০ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন* (ষষ্ঠ খণ্ড)। কলকাতা: দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: জনসন প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলকাতা: বীণা প্রেসে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র। *ভ্রমর: মাসিক পত্র (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র। *ভ্রমর: মাসিক পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: ১২৮২ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলকাতা: ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০১ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০২ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (পঞ্চম খণ্ড)*। কলকাতা: ১৮০৩ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮০৪ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (দ্বিতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৯ (অগ্রহায়ণ) - ১৩০০ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (তৃতীয় বর্ষ: প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: ১৩০০ (জ্যৈষ্ঠ) – ১৩০১ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।

- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (তৃতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০১ (জ্যৈষ্ঠ – কার্ত্তিক) বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (চতুর্থ বর্ষ: প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০১ (অগ্রহায়ণ) – ১৩০২ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (সপ্তম ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (দ্বাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (ত্রয়োদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (চতুর্দশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (পঞ্চদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (সপ্তদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে" শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (অষ্টাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "ভারতী যন্ত্রে" শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (ঊনবিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "ভারতী যন্ত্রে" শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (বিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (একবিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কলিকাতা: বসু প্রেসে শ্রীহরিনাথ খাঁ দ্বারা প্রকাশিত, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র। *প্রচার: মাসিক পত্র (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৩-৯৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র। *প্রচার: মাসিক পত্র (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— প্রথম সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (আশ্বিন)।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— পঞ্চম সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (মাঘ)।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— ষষ্ঠ সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (ফাল্গুন)।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত কার্য্যালয়, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ত্রয়োদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (চতুর্দশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (পঞ্চদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ষোড়শ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত- কার্য্যালয়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (সপ্তদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (প্রথম বর্ষ – বৈশাখ থেকে আশ্বিন)*। কলিকাতা: নূতন কলিকাতা যন্ত্রে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় বর্ষ – বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ)*। কলিকাতা: ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় বর্ষ)*। কলিকাতা: ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টম বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (নবম বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্যকল্পদ্রুম: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কল্পদ্রুম কার্য্যালয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।

পরিশিষ্ট: ১

উনিশ শতকীয় পত্রিকায় বাঙালির রস-সংক্রান্ত মন্তব্য

পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি রস সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির মনোভঙ্গি কেমন ছিল তা ব্যক্ত করা হয়েছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একাধিক বা সবকটি রস নিয়ে মন্তব্যও উনিশ শতকের নানা লেখায় চোখে পড়ে। সেরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল:

- ... চণ্ডীকাব্যে যেমন নানা রস আছে, তেমনি বৃহৎ পক্ক রোহিত মৎস্যেও নানা রস আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ রস আছে সে বিষয়ে নানা মত আছে; কেহ কেহ বলেন যে ইহার মস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক; মধ্য দেশে শান্ত, করুণ, আদি ও পশ্চাদ্ভাগে অদ্ভুত, হাস্য ও বীভৎস রস দেখিতে পাওয়া যায়।[1]

- শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্তি – রস এই নয় প্রকার। এই সকল ভাবকে ইংরাজীতে Nine Emotions বলা যাইতে পারে।[2]

- সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রস নয়টি। আদি, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীবিষয়ক রতি আদিরসের স্থায়ী ভাব; হাস হাস্যরসের স্থায়ী ভাব; শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব; উৎসাহ বীররসের স্থায়ী ভাব; বিস্ময় অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব; ভয়, ভয়ানকরসের স্থায়ী ভাব; জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা বীভৎসরসের স্থায়ী ভাব; ক্রোধ, রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব এবং নির্ব্বেদ শান্তরসের স্থায়ী ভাব।[3]

- করুণ, বীর, হাস্য বা যে কোন রসের চিত্র হউক না কেন... যদি অভিনেতা আপনার সত্তা ভুলিয়া, অভিনীত চরিত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে তচ্চরিত্রময় করিতে সমর্থ হন, [তবে নিশ্চয়ই তিনি দর্শকের মন আকর্ষণ করতে, নাটকের মধ্যমে লোক শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন]।[4]

---

[1] শ্রীঅঃ, "তুলনায় সমালোচন," *বঙ্গদর্শন* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ): ৩৭।

[2] শ্রীশিঃ, "কাব্য কবি ও কবিত্ব," *আর্য্যদর্শন* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ২৭।

[3] অজ্ঞাত, "রস," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৭১।

[4] অজ্ঞাত, "অভিনয়ের উপযোগিতা," *নব্যভারত* ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ): ২৫৮।

- বিবিধ রসের অবতারণায় কৃত্তিবাস সিদ্ধহস্ত। রামায়ণ করুণরসপ্রধান...কেবল করুণরসেই নহে, অন্য রস বর্ণনেও কবি পারদর্শী। অঙ্গদ রায়বারে হাস্য বিদ্রূপের, নরক বর্ণনায় বীভৎস রসের, ইন্দ্রজিৎ বধে রাবণের ক্রোধবর্ণনা স্থানে রৌদ্ররস প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অবতারণায় কৃত্তিবাস বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।... অদ্ভুত রসবর্ণনার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।...[5]

- শরৎসরোজিনীর অভিনয়ে কৃতকার্য্যতায় মূল– নানারসসমুদ্ভূতি। ক্রমাগত এক রসের বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য গ্রন্থকার ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, করুণ, বীভৎস প্রভৃতি নানারসের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই নানারসের অবতারণা করিতে গিয়া গ্রন্থকার নাটকের একটি প্রধান ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। নাটকে যেমন নানারসের সমুদ্ভুতি আবশ্যক—তেমনই ইহাতে এক রসের অঙ্গিত্ব অর্থাৎ প্রাধান্যও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শরৎ-সরোজিনীতে কোন রসেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হইল না।[6]

---

[5] বীরেশ্বর গোস্বামী, "কবি কৃত্তিবাস," *ভারতী* ১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দ): ৭৪৪-৭৪৬।

[6] অজ্ঞাত, "প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা: শরৎ-সরোজিনী নাটক, কলিকাতা নুতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। ৺দুর্গাদাস দাস প্রণীত। বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত," *আর্য্যদর্শন* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮২ বঙ্গাব্দ), ৪৪।

উনিশ শতকের বাঙালি-কর্তৃক ইংরাজি ভাষায় ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিকে এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা-পরিধির অন্তর্গত করা হয়নি। উনিশ শতকে ইংরাজিতে লেখা ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক রচনার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেথুন সোসাইটির এক সভায় এটি পাঠ করেছিলেন। রচনাটি লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল *Culcutta Review* পত্রিকায়, Dr. Haeberlin-এর 'কাব্যসংগ্রহ' (১৮৪৭)-এর সমালোচনা-রূপে।

'On Sanscrit Poetry' শীর্ষক এই রচনায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবকে (Sentiment) 'কাব্যের আত্মা' (Soul of Poetry) বলে অভিহিত করেছিলেন। ভাব বা রসের প্রথাগত ন-টি প্রকারের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, সঙ্গে ছিল রসাভাস-বিষয়ক আলোচনা—

> Our rhetoricians have expressed in their criticisms on poetry— their ideas of excellencies and deficiencies— prove that our learned language has been highly finished and perfected.
>
> ***Sentiment*** is in the estimation of our rhetoricians the ***soul of poetry***, Mere sound or harmony will not come up to their standard; though the want of harmony would vitiate the most sentimental of poems. Sentiment is usually divided into ***love, laughter, pity, anger, heroism, fear, disgust, wonder, veneration.*** Every poem ought to excite one or other of these sentiments. But the poet is most easily tempted by the sentiment which attaches one human being to another, it is, however, an honour to sanscrit poetry, that wherever love goes astray, and breaks in sunder the bonds of conjugal fidelity, ***it is reprobated as রসাভাস***, or false sentiment.[1]

[1] Rev. K.M. Banerjea, "On Sanscrit Poetry," *Culcutta Review* (July-December 1851) [উৎস: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "পরিশিষ্ট," *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১৬০।] (নজরটান আরোপিত)

পরিশিষ্ট: ৩

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ‘বিজ্ঞাপন’ (মুখবন্ধ) এবং সাময়িকপত্রের প্রাসঙ্গিক অংশের চিত্র

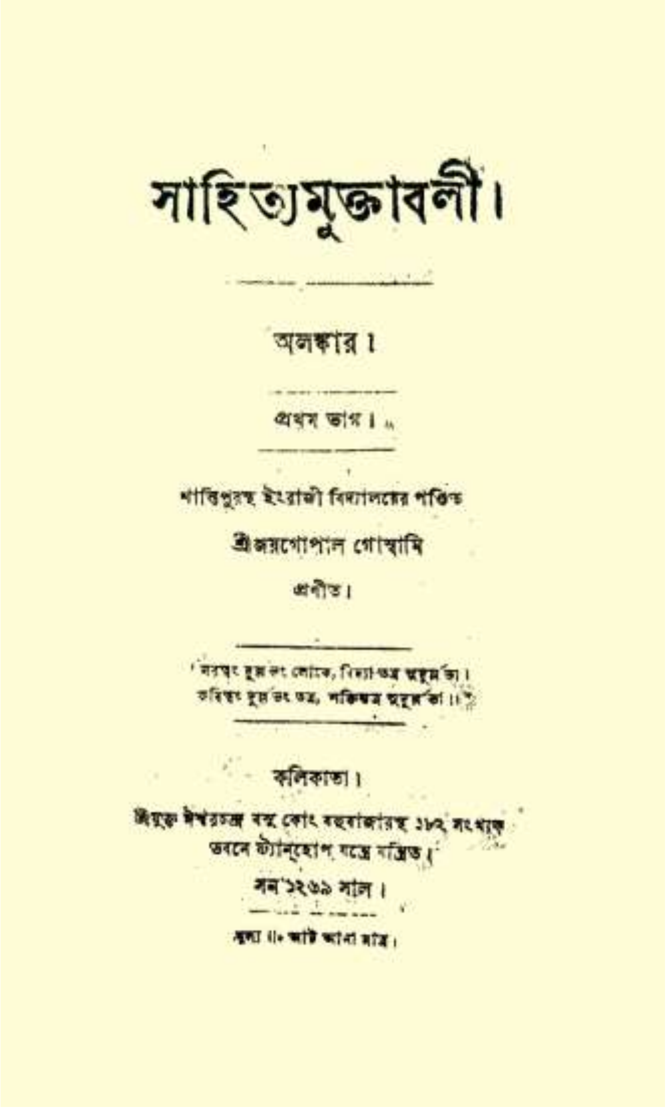

সাহিত্যমুক্তাবলী।

অলঙ্কার।

প্রথম ভাগ।

শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি

প্রণীত।

[illegible]

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

চিত্র: ১

জয়গোপাল গোস্বামী রচিত *সাহিত্যমুক্তাবলী* গ্রন্থের আখ্যাপত্র

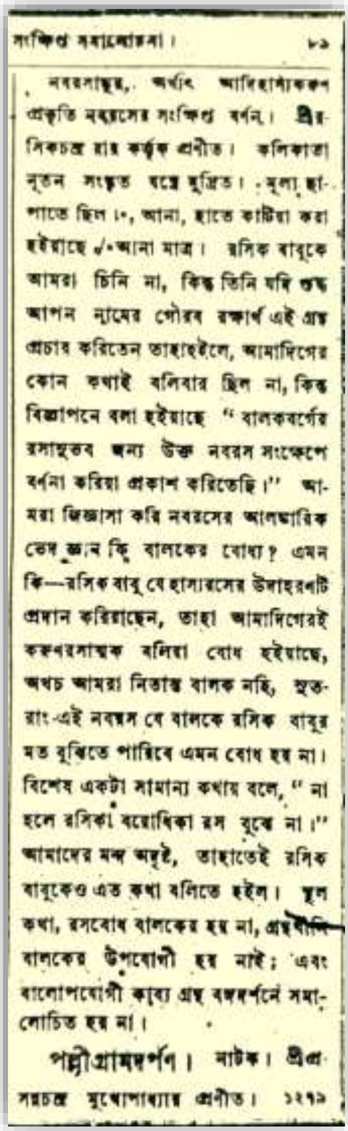

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ৮১

নবরসাঙ্কুর, অর্থাৎ আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। শ্রীর-সিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছা-পাতে ছিল ।০, আনা, হাতে কাটিয়া করা হইয়াছে ৶০ আনা মাত্র। রসিক বাবুকে আমরা চিনি না, কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ আপন ন্যামের গৌরব রক্ষার্থ এই গ্রন্থ প্রচার করিতেন তাহাহইলে, আমাদিগের কোন কথাই বলিবার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে "বালকবর্গের রসাস্বাদন জন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।" আ-মরা জিজ্ঞাসা করি নবরসের আলঙ্কারিক ভেদ জ্ঞান কি বালকের বোধ্য? এমন কি—রসিক বাবু যে হাস্যরসের উদাহরণটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুণরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে, অথচ আমরা নিতান্ত বালক নহি, সুত-রাং এই নবরস যে বালকে রসিক বাবুর মত বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। বিশেষ একটা সামান্য কথায় বলে, "না হলে রসিকা বয়োধিকা রস বুঝে না।" আমাদের মন্দ অদৃষ্ট, তাহাতেই রসিক বাবুকেও এত কথা বলিতে হইল। মূল কথা, রসবোধ বালকের হয় না, গ্রন্থখানি বালকের উপযোগী হয় নাই; এবং বালোপযোগী কাব্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে সমা-লোচিত হয় না।

পল্লীগ্রামদর্পণ। নাটক। শ্রীপ্র-সন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২৭৯

চিত্র: ২

বঙ্গদর্শন-এ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১) প্রকাশিত

নবরসাঙ্কুর গ্রন্থের সমালোচনা

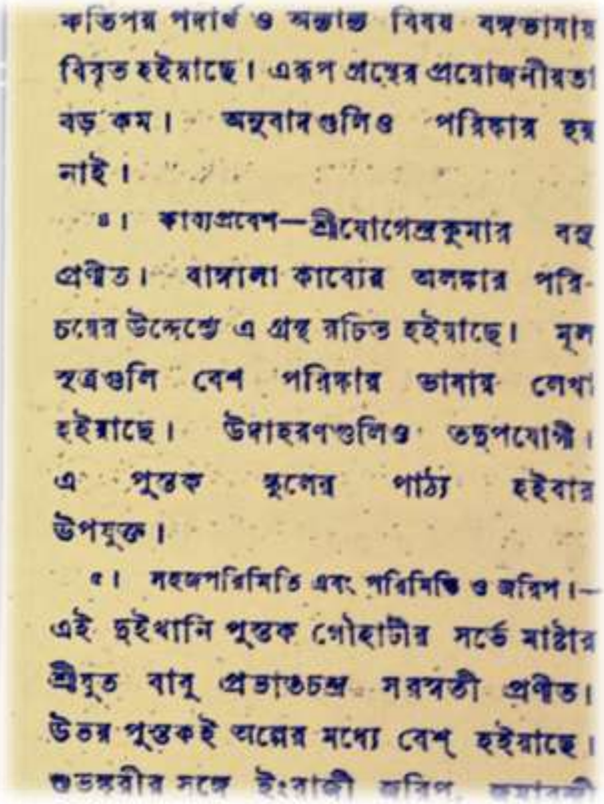

কতিপয় পদার্থ ও অন্যান্য বিষয় বঙ্গভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বড় কম। অনুবাদগুলিও পরিষ্কার হয় নাই।

৪। কাব্যপ্রবেশ—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কার পরি-চয়ের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূল সূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার ভাষায় লেখা হইয়াছে। উদাহরণগুলিও তদুপযোগী। এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

৫। সহজপরিমিতি এবং পরিমিতি ও জরিপ।—এই দুইখানি পুস্তক গৌহাটীর সর্ভে মাষ্টার শ্রীযুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সরস্বতী প্রণীত। উভয় পুস্তকই অল্পের মধ্যে বেশ্ হইয়াছে।

চিত্র: ৩

নব্যভারত-এ (ফাল্গুন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

প্রকাশিত *কাব্যপ্রবেশ* গ্রন্থের

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

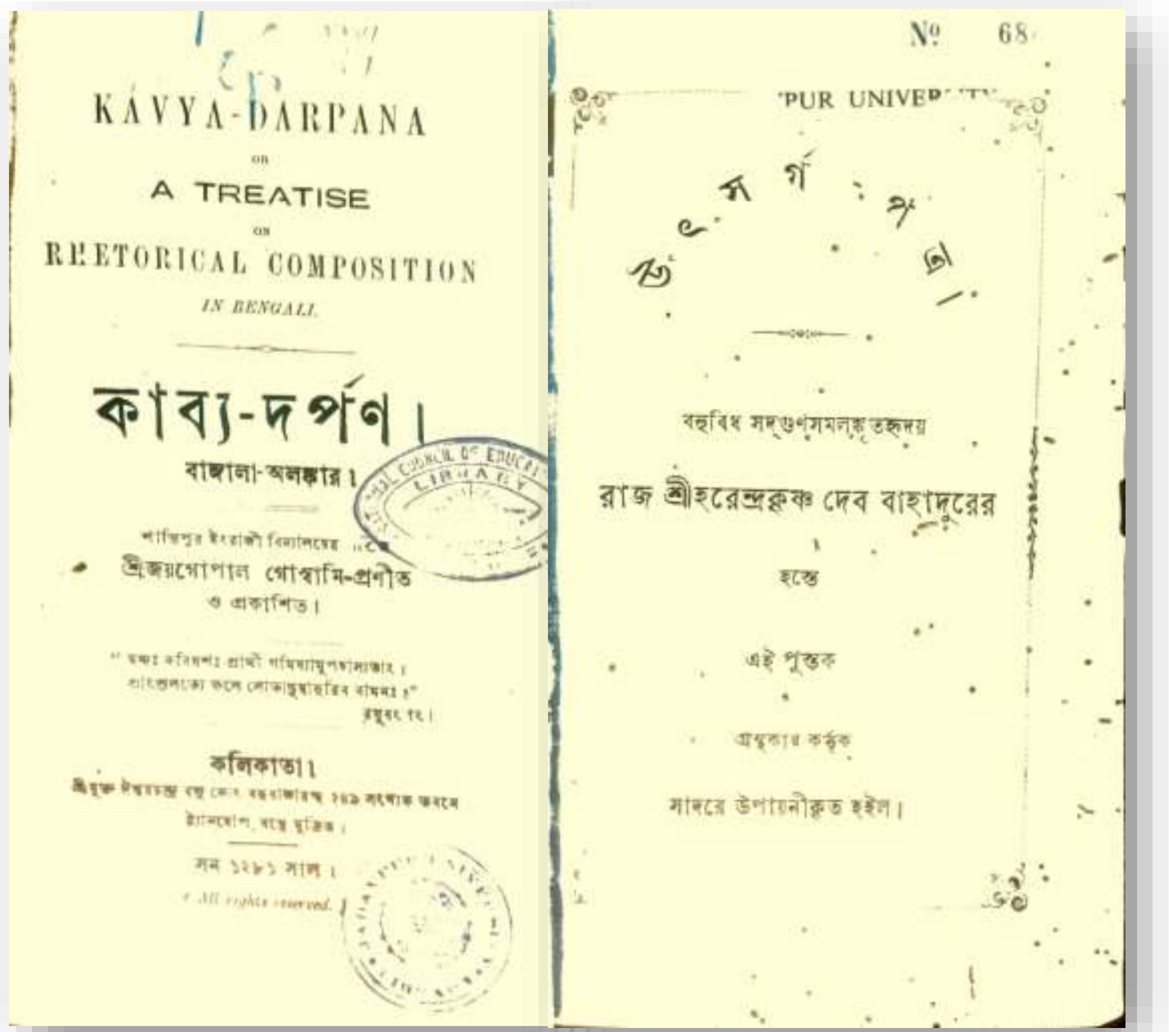

KAVYA-DARPANA

OR

A TREATISE

ON

RHETORICAL COMPOSITION

IN BENGALI.

কাব্য-দর্পণ।

বাঙ্গালা-অলঙ্কার।

শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-প্রণীত

ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৮১ সাল।

All rights reserved.

No. 68

উৎসর্গ-পত্র।

বহুবিধ সদ্গুণসমলঙ্কৃতহৃদয়

রাজা শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের

হস্তে

এই পুস্তক

গ্রন্থকার কর্তৃক

সাদরে উপায়নীকৃত হইল।

চিত্র: ৪

জয়গোপাল গোস্বামী রচিত *কাব্য-দর্পণ* গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও উৎসর্গ-পত্র

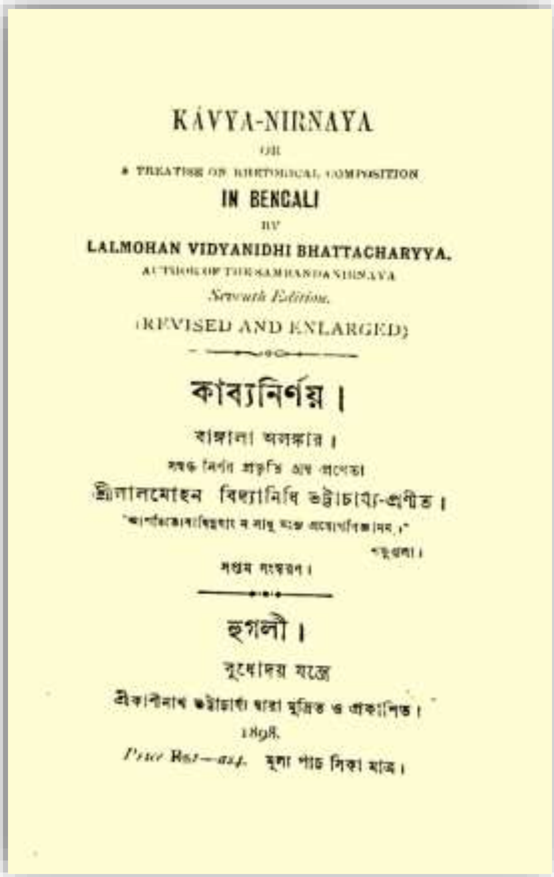

KÁVYA-NIRNAYA

OR

A TREATISE ON RHETORICAL COMPOSITION

IN BENGALI

BY

LALMOHAN VIDYANIDHI BHATTACHARYYA.

AUTHOR OF THE SAMBANDANIRNAYA

Seventh Edition.

(REVISED AND ENLARGED)

কাব্যনির্ণয়।

বাঙ্গালা অলঙ্কার।

সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ।

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

1898.

Price Re. 1—4. মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

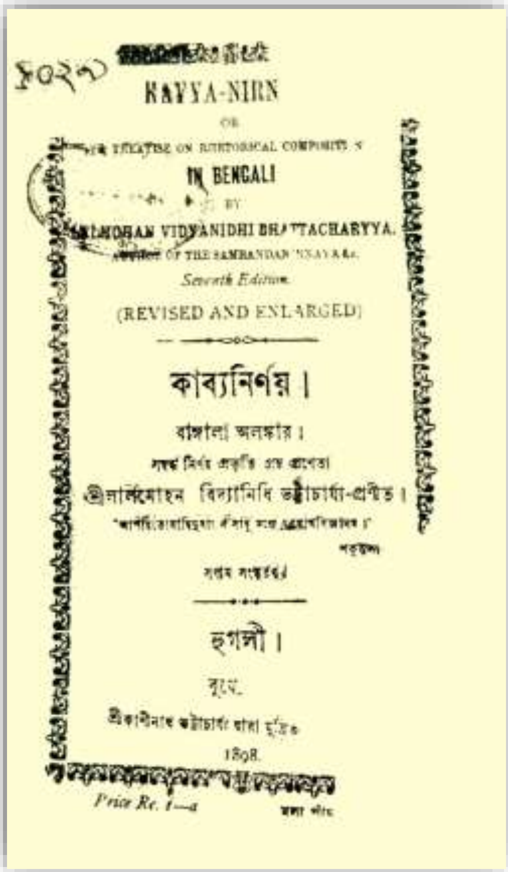

KAVYA-NIRN

OR

TREATISE ON RHETORICAL COMPOSITION

IN BENGALI

BY

LMOHAN VIDYANIDHI BHATTACHARYYA.

OF THE SAMBANDAN

Seventh Edition.

(REVISED AND ENLARGED)

কাব্যনির্ণয়।

বাঙ্গালা অলঙ্কার।

সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ

হুগলী।

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

1898.

Price Re. 1—4

চিত্র: ৫

লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থের আখ্যাপত্র

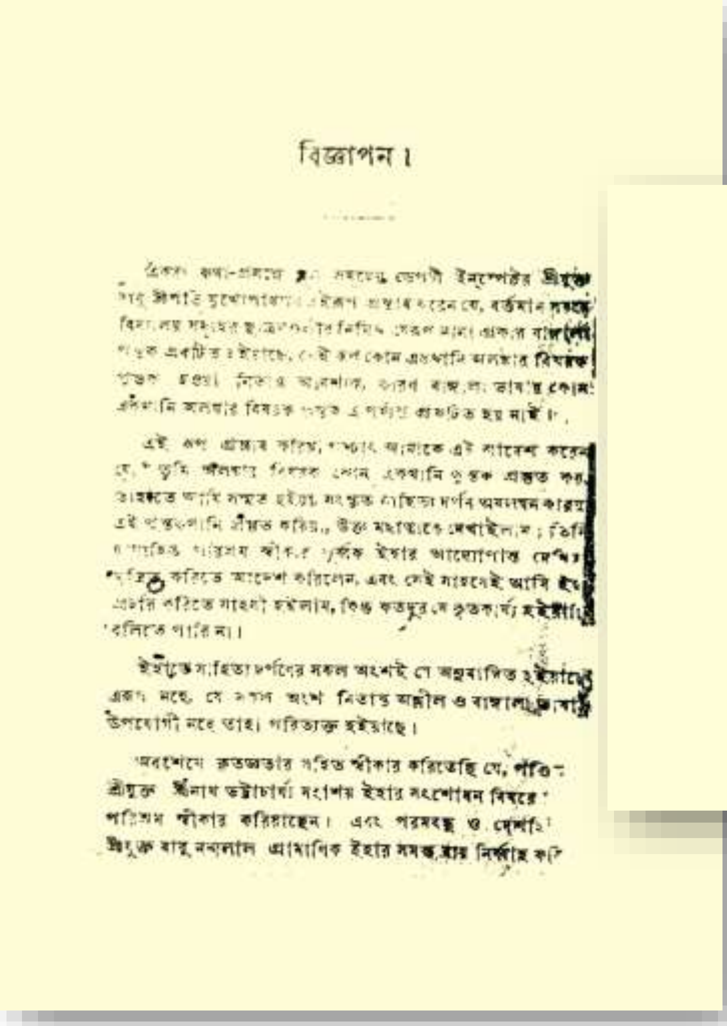

বিজ্ঞাপন।

একদা কথা-প্রসঙ্গে [illegible] সময়ের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের নিমিত্ত [illegible] বাঙ্গালা পুস্তক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ বাঙ্গালা ভাষায় কোন একখানি অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকটিত হয় নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া, পশ্চাৎ আমাকে এই আদেশ করেন যে, "তুমি [illegible] একখানি পুস্তক প্রস্তুত কর।" তাহাতে আমি সম্মত হইয়া, সংস্কৃত সাহিত্য দর্পণ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করিয়া, উক্ত মহাশয়কে দেখাইলাম; তিনি [illegible] স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া মুদ্রিত করিতে আদেশ করিলেন, এবং সেই সাহসেই আমি ইহা প্রকটিত করিতে সাহসী হইলাম, কিন্তু কতদূর যে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

ইহাতে সাহিত্য দর্পণের সকল অংশই যে অনুবাদিত হইয়াছে এমত নহে, যে সকল অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও বাঙ্গালা ভাষার উপযোগী নহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার সংশোধন বিষয়ে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এবং পরমবন্ধু ও দেশহি[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল প্রামাণিক ইহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করি-

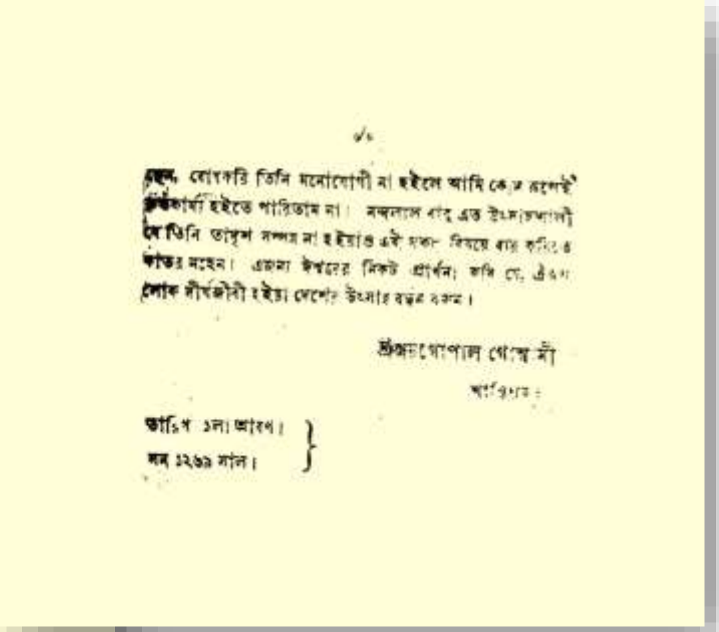

৵০

য়াছেন, যেহেতু তিনি মনোযোগী না হইলে আমি কেবল যত্নেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। নন্দলাল বাবু এত উৎসাহশালী যে তিনি তাদৃশ সম্পন্ন না হইয়াও এই সকল বিষয়ে ব্যয় করিতে কাতর নহেন। একণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, এরূপ লোক দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী

শান্তিপুর।

তারিখ ১লা শ্রাবণ।
সন ১২৬৯ সাল।

চিত্র: ৬

জয়গোপাল গোস্বামী রচিত *সাহিত্যমুক্তাবলী*-র 'বিজ্ঞাপন' (মুখবন্ধ)

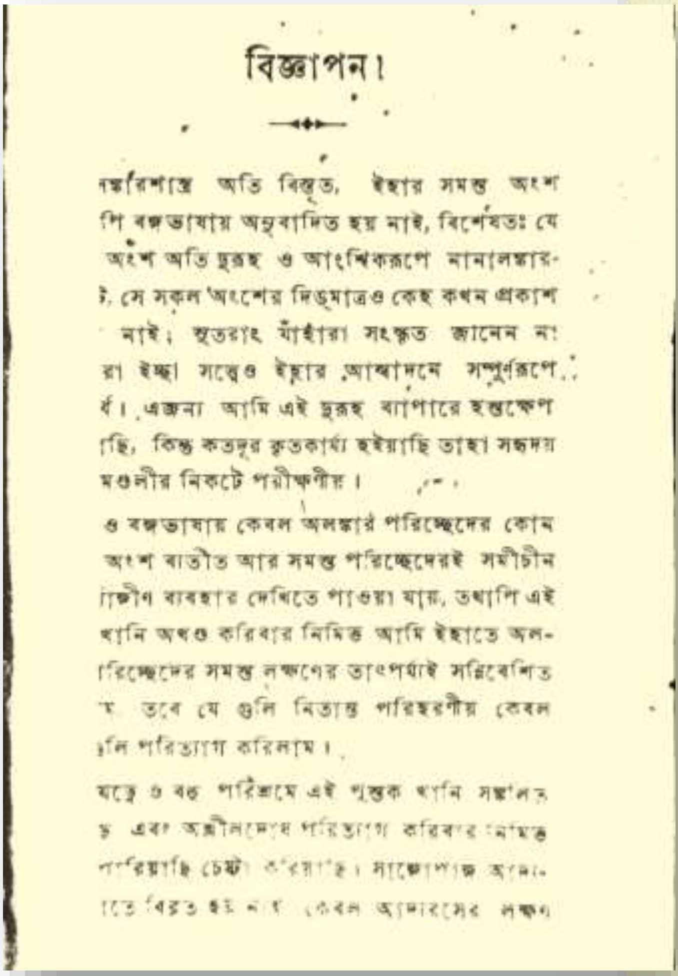

বিজ্ঞাপন।

নঙ্কারিশাস্ত্র অতি বিস্তৃত, ইহার সমস্ত অংশ
পি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই, বিশেষতঃ যে
অংশ অতি দুরূহ ও আংশিকরূপে নানালঙ্কার-
ই, সে সকল অংশের দিঙ্‌মাত্রও কেহ কখন প্রকাশ
নাই; সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না
রা ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে
ৰ্থ। এজন্য আমি এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ
ছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয়
মণ্ডলীর নিকটে পরীক্ষণীয়।

ও বঙ্গভাষায় কেবল অলঙ্কার পরিচ্ছেদের কোন
অংশ ব্যতীত আর সমস্ত পরিচ্ছেদেরই সমীচীন
াঙ্গীণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এই
খানি অখণ্ড করিবার নিমিত্ত আমি ইহাতে অল-
পরিচ্ছেদের সমস্ত লক্ষণের তাৎপর্য্যই সন্নিবেশিত
য়, তবে যে গুলি নিতান্ত পরিহরণীয় কেবল
গুলি পরিত্যাগ করিলাম।

যত্নে ও বহু পরিশ্রমে এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত
হ এবং অশ্লীলদোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত
পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছি। সাঙ্গোপাঙ্গ আদ্য-
তে [illegible] কেবল আদিরসের লক্ষণ

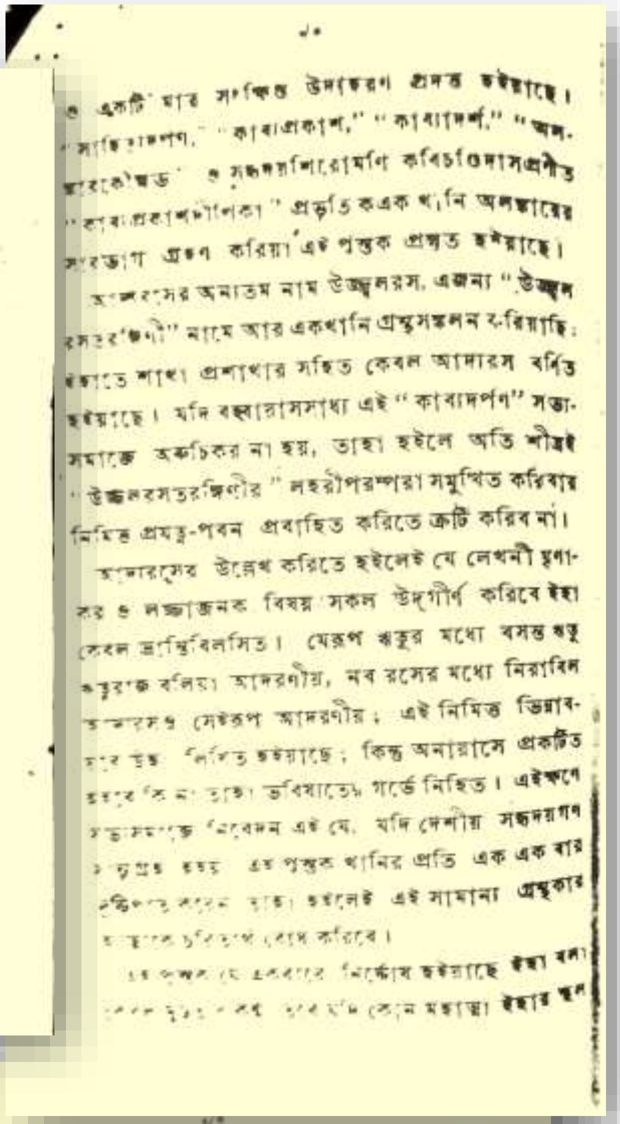

৸৹

ও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।
"সাহিত্যদর্পণ," "কাব্যপ্রকাশ," "কাব্যাদর্শ," "অল-
ঙ্কারকৌস্তুভ" ও সহৃদয়শিরোমণি কবিচৈতন্যদাসপ্রণীত
"কাব্যপ্রকাশদীপিকা" প্রভৃতি কএক খানি অলঙ্কারের
সারভাগ গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে।
আদিরসের অন্যতম নাম উজ্জ্বলরস, এজন্য "উজ্জ্বল
রসতরঙ্গিণী" নামে আর একখানি গ্রন্থসঙ্কলন করিয়াছি;
ইহাতে শাখা প্রশাখার সহিত কেবল আদিরস বর্ণিত
হইয়াছে। যদি বহ্বায়াসসাধ্য এই "কাব্যদর্পণ" সভ্য-
সমাজে অরুচিকর না হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই
"উজ্জ্বলরসতরঙ্গিণীর" লহরীপরম্পরা সমুত্থিত করিবার
নিমিত্ত প্রযত্ন-পবন প্রবাহিত করিতে ত্রুটি করিব না।
আদিরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণা-
কর ও লজ্জাজনক বিষয় সকল উদ্গীর্ণ করিবে ইহা
কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু
ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, নব রসের মধ্যে নিরাবিল
আদিরসও সেইরূপ আদরণীয়; এই নিমিত্ত ভিন্নাব-
[illegible] হইয়াছে; কিন্তু অনায়াসে প্রকটিত
হইবে কি না তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। এইক্ষণে
[illegible] নিবেদন এই যে, যদি দেশীয় সহৃদয়গণ
[illegible] এই পুস্তক খানির প্রতি এক এক বার
[illegible] তাহা হইলেই এই সামান্য গ্রন্থকার
[illegible] বোধ করিবে।
[illegible] নির্দ্দোষ হইয়াছে ইহা বলা
[illegible] কোন মহাত্মা ইহার স্থল

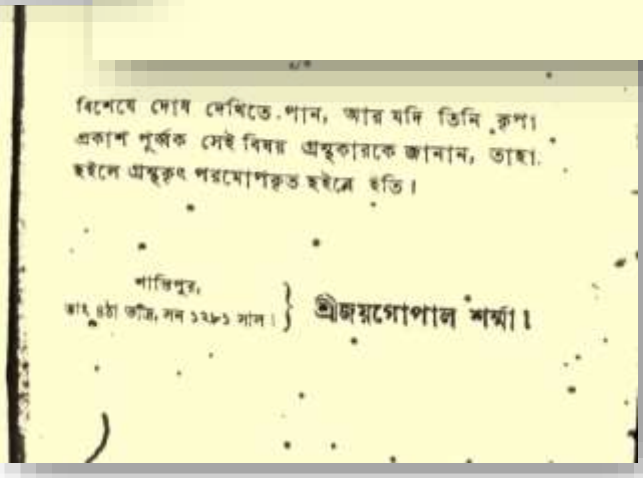

বিশেষে দোষ দেখিতে পান, আর যদি তিনি কৃপা
প্রকাশ পূর্ব্বক সেই বিষয় গ্রন্থকারকে জানান, তাহা
হইলে গ্রন্থকৃৎ পরমোপকৃত হইবে ইতি।

শান্তিপুর,
কার্ত্তিক ৫ই তারিখ, সন ১২৮১ সাল। } শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মা।

চিত্র: ৭

জয়গোপাল গোস্বামীর *কাব্য-দর্পণ* গ্রন্থের

'বিজ্ঞাপন' (মুখবন্ধ)

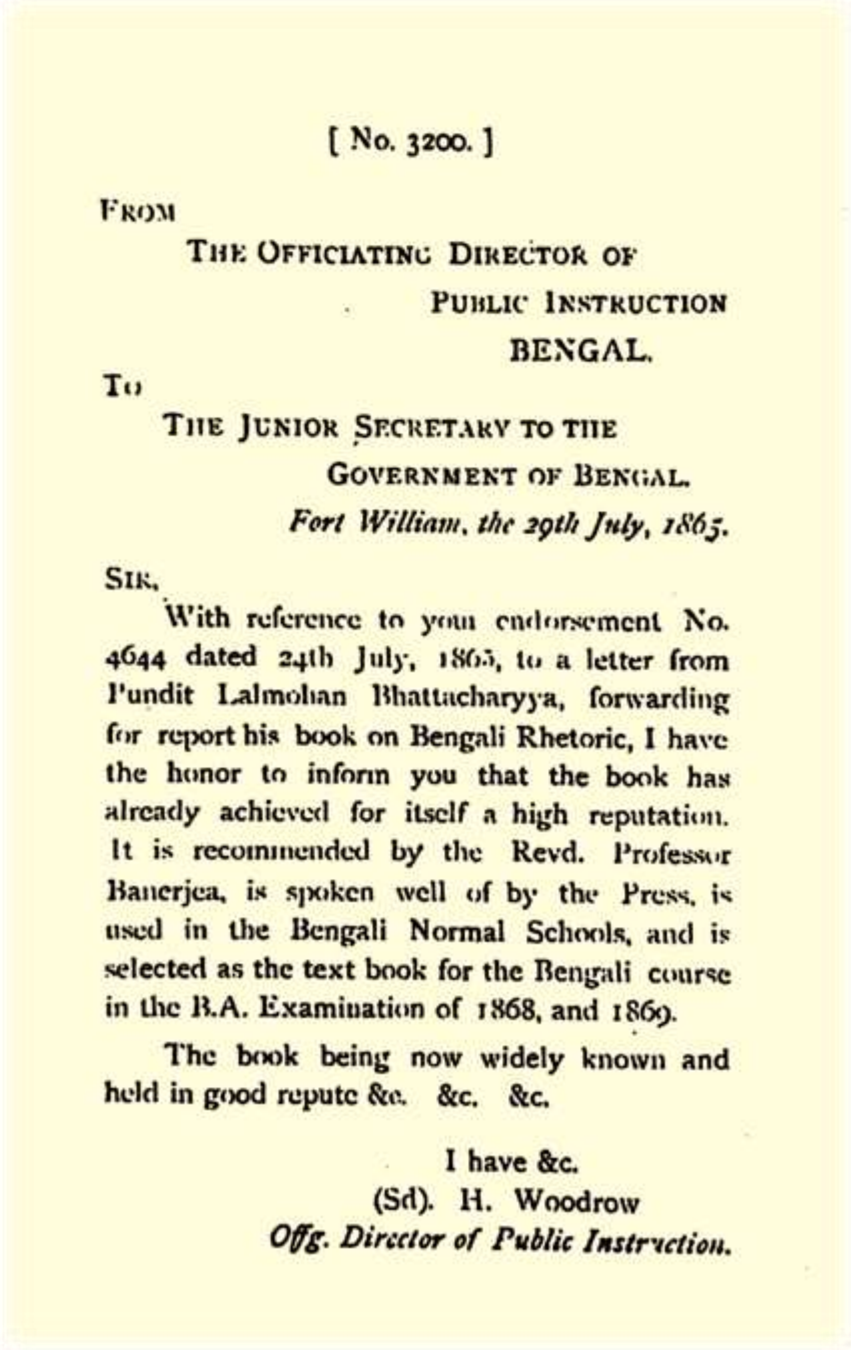

[No. 3200.]

FROM

THE OFFICIATING DIRECTOR OF
PUBLIC INSTRUCTION
BENGAL.

TO

THE JUNIOR SECRETARY TO THE
GOVERNMENT OF BENGAL.

Fort William, the 29th July, 1865.

SIR,

With reference to your endorsement No. 4644 dated 24th July, 1865, to a letter from Pundit Lalmohan Bhattacharyya, forwarding for report his book on Bengali Rhetoric, I have the honor to inform you that the book has already achieved for itself a high reputation. It is recommended by the Revd. Professor Banerjea, is spoken well of by the Press, is used in the Bengali Normal Schools, and is selected as the text book for the Bengali course in the B.A. Examination of 1868, and 1869.

The book being now widely known and held in good repute &c. &c. &c.

I have &c.
(Sd). H. Woodrow
Offg. Director of Public Instruction.

চিত্র: ৮

Government of Bengal-এর জুনিয়র সেক্রেটারিকে লেখা অফিশিয়েটিং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের চিঠি। এখান থেকে জানা যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয় নর্মাল* স্কুলের এবং বিএ পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়েছিল।

ADVERTISEMENT.

The ancient Hindus have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, Logic and Rhetoric. Europe has derived most of her knowledge of the *trivium* from the Greeks through the Romans, and it is not uninteresting to compare the *trivium* of another nation, which follows out its own track under different auspices. The Hindu Grammar and Logic have been studied in England and Germany, and their merits duly appreciated. Professor Lassen has said that without a deep study of *Panini*, no one can pretend to a thorough knowledge of Sanskrit; and Dr. Ballantyne has shewn that not even Sir William Hamilton himself had analysed the Syllogism more profoundly than *Gotama*. Similarly the Hindu Rhetoric has much that is interesting and new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in Western Literature.

The following little work is an attempt to give in Bengali a succinct account of the Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was written nearly 1200 years ago and

[2]

the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the *ritis* therein discussed, and surely if the *Gauri Riti* (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. COWELL,
Principal, Sanskrit College.

CALCUTTA.
November 12th, 1862.

চিত্র: ৯

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ E.B Cowell রচিত *কাব্যনির্ণয়* গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' (মুখবন্ধ)

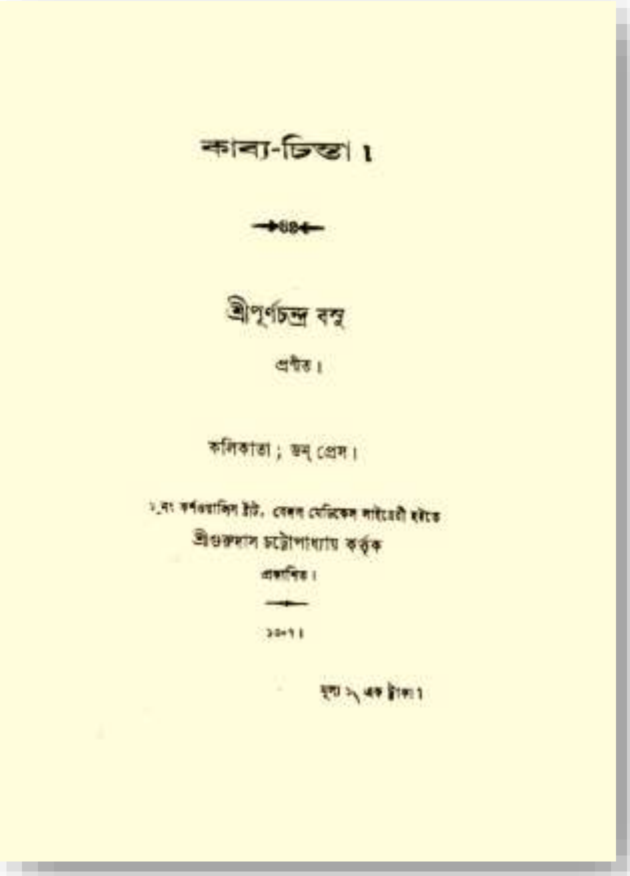

কাব্য-চিন্তা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রণীত।

কলিকাতা; জন্‌ প্রেস।

১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

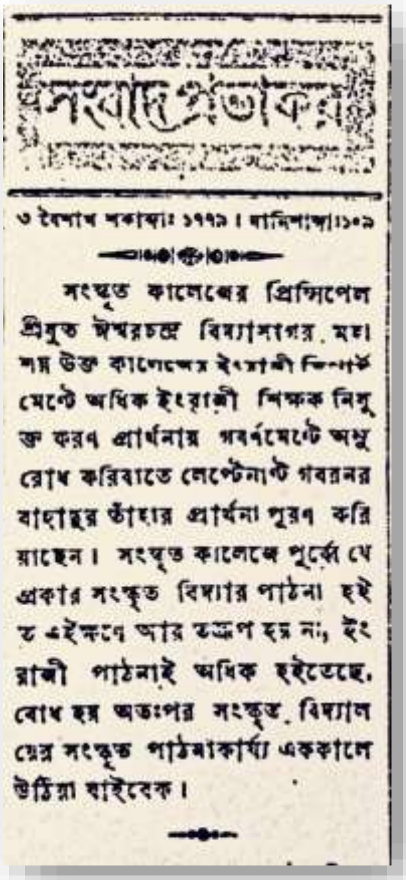

সংবাদ প্রভাকর

৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বাঙ্গালাব্দাঃ [illegible]

সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কালেজের ইংরাজী ডিপার্টমেন্টে অধিক ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত করণ প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিবাতে লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজে পূর্ব্বে যে প্রকার সংস্কৃত বিদ্যার পাঠনা হইত এইক্ষণে আর তদ্রূপ হয় না, ইংরাজী পাঠনাই অধিক হইতেছে, বোধ হয় অতঃপর সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠনাকার্য্য একেকালে উঠিয়া যাইবেক।

চিত্র: ১০

উনিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ: পূর্ণচন্দ্র বসুর *কাব্য-চিন্তা*-র আখ্যাপত্র

চিত্র: ১১

সংবাদ প্রভাকর-এর প্রতিবেদনে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত পঠনপাঠন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাপ্রকাশ